একুশের স্মারকগ্রন্থ '৮৭

ভারবি

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

একুশের স্মারকগ্রন্থ '৮৭

সম্পাদনা পরিষদ

শামসুজ্জামান খান
সেলিনা হোসেন
সুকুমার বিশ্বাস
নূরুল ইসলাম
জাহিদর রহমান

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৮৭

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : দীপঙ্কর ধর।
রাজেন্দ্র অফসেট। ১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন। কলকাতা-৯।

প্রসঙ্গ-কথা

একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণে আয়োজিত বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানমালা এখন দেশবাসীর কাছে একটি বহু প্রতীক্ষিত উৎসবের চারিত্র্য অর্জন করেছে। ১৯৫২ সালের এই দিনে গভীর বেদনার ভেতর থেকে জন্ম নিয়েছিলো এক দুর্জয় শক্তি এবং অটুট সংহতি। আজকের শহীদ দিবস তাই স্বজন-বিয়োগের শোকে আপ্লুত নয়, বরং আত্মপ্রত্যয়ের অহঙ্কারে উজ্জীবিত।

'একুশের স্মারকগ্রন্থ সাতাশি' সমগ্র ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী মহান শহীদদের স্মৃতির প্রতি বাংলা একাডেমী নিবেদিত অনুষ্ঠানমালার বিবরণসমৃদ্ধ একটি সঙ্কলন। উপরন্তু ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বৎসরে একাডেমীর যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এই গ্রন্থে তারও বিস্তারিত পরিচয় আছে। প্রতিষ্ঠা-দিবস, বার্ষিক সাধারণ সভা, বাংলা একাডেমী বক্তৃতামালা প্রভৃতি অনুষ্ঠান এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এবারের স্মারকগ্রন্থের অতিরিক্ত আকর্ষণ 'একুশের স্মৃতিচারণ'। এই পর্যায়ে ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত জনাব আবদুল মতিন, জনাব কাজী গোলাম মাহবুব, ডক্টর সুফিয়া আহমেদ ও অধ্যাপক সৈয়দ কমরুদ্দীন হুসেইনের লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া একাডেমীর প্রাক্তন ও বর্তমান সভাপতি এবং প্রাক্তন পরিচালক ও মহাপরিচালকদের সাক্ষাৎকারও এই সঙ্কলনের গুরুত্ব বাড়িয়েছে বলে মনে করি।

এই গ্রন্থের প্রণয়ন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সূচীপত্র

একুশের স্মৃতিচারণ

আবদুল মতিন
কাজী গোলাম মাহবুব
সুফিয়া আহমেদ
সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেইন (শহুদ)

আবদুল মতিন

আমার বাবা ছিলেন একজন সাধারণ কৃষক পরিবারের সন্তান। গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর বহু চেষ্টা-তদবির করে তিনি দার্জিলিং ক্যান্টন-মেন্টে কোতোয়ালের চাকরি পান। আমার স্কুলজীবনের পুরো সময়টাই দার্জিলিং ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় কেটেছে। ক্যান্টনমেন্টের একটি কোয়ার্টারে আমরা পরিবারের সকল সদস্যই একত্রে বাস করতাম। আমরা এগারো ভাই চার বোনের মধ্যে আমিই সকলের বড়। ১৯৩২-এ দার্জিলিং সরকারী স্কুলের ইনফেন্ট ক্লাশে আমাকে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। আমার স্কুল জীবনের সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত আমাদের পরিবার দারিদ্র্যের মধ্যে দিন যাপন করে। বাবা মাসে ৩০/৩৫ টাকা বেতন পান। এই সামান্য আয় দিয়েই তিনি কষ্ট-ক্লেশের ভেতর দিয়ে সংসার চালান। বাবা দার্জিলিং-এ ছোটখাটো একটি মনোহারীর দোকান খোলেন। তাতেও আমাদের আর্থিক দৈন্য ঘুচলো না। ১৯৩৯-এ বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ফলে দার্জিলিং ক্যান্টনমেন্টের গুরুত্ব বেড়ে যায়। এর কলেবর বৃদ্ধি পেতে থাকে। নতুন নতুন দালান-কোঠা নির্মাণ ও সিপাই-শান্ত্রীর খাদ্য-বস্ত্র সরবরাহ করার জন্য ক্যান্টন-মেন্টে ঠিকাদার ব্যবসায়ীর দরকার হয়। বাবা ক্যান্টনমেন্টে একটি ঠিকাদারী ব্যবসা পেয়ে যান। এর সুবাদে তিনি প্রচুর টাকা আয় করেন। আমাদের পরিবারে প্রাচুর্য আসে।

১৯৪৩-এ আমি দার্জিলিং স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করি। একদিন বাবা আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এখন কোন কলেজে পড়বে?" আমি উত্তরে বললাম, "পাহাড়ীদের দেশ দার্জিলিং-এ আছি। নিজের দেশ সম্পর্কে কিছুই আমার জানা হলো না। আমি আমার দেশ ও দেশবাসীকে জানতে চাই। আমি আমার মাতৃভূমি পূর্ববাংলার কোনো কলেজে ভর্তি হবো।" বাবা আমার কথায় রাজী হলেন। দার্জিলিং পার্বত্যভূমি। লোকসংখ্যা খুবই কম। ক্যান্টনমেন্ট লোকালয় থেকে দূরে একটি নির্জন স্থানে

অবস্থিত। পাহাড়ীরা আমাদের সাথে মেলামেশা করে না। সমতল ভূমির লোকও সচরাচর চোখে পড়ে না। এখানে জনজীবনের কোন স্বাদই আমি পাই নি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্ভোগ, স্কুল ও গৃহ—এই তিনের মধ্যে আমার জীবন সীমাবদ্ধ ছিলো। জনজীবনকে জানবার ও বোঝবার আশায় পূর্ব-বাংলায় চলে আসি। আমি রাজশাহী সরকারী কলেজে আই.এ. ক্লাশে ভর্তি হই।

রাজশাহীতে এসে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হতে থাকে। এখানে কত বিচিত্র মানুষের ভীড়। কত বিচিত্র কলকোলাহল। এত মানুষ আর কখনো দেখি নি। আমি জীবনে এই প্রথম স্বাধীনতা, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান শব্দ শুনলাম। নিউ হোস্টেলে থাকি। হোস্টেলের ছাত্ররা সব সময় এইসব বিষয়ে আলোচনা করে। আমি চুপচাপ শুনি আর বিষয়গুলো বুঝবার চেষ্টা করি। রাজশাহী কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করলাম। বি.এ. ক্লাশে ভর্তির প্রস্তুতি নেই। কোথায় ভর্তি হওয়া যায় এসম্পর্কে কিছুই স্থির করতে পারছি না। এক পর্যায়ে মনে হলো পাকিস্তান নিয়ে যখন মানুষের মধ্যে এত কথাবার্তা তখন পাকিস্তানের চিন্তা-ভাবনার যেটা কেন্দ্রবিন্দু সেই আলীগড়েই পড়া ভালো। একদিকে ডিগ্রী নেয়া হবে আরেক দিকে পাকিস্তান আন্দোলনের তাৎপর্যও জানা যাবে। গেলাম আলীগড়ে। উঠলাম সেখানকার মুসাফিরখানায়। ঘুরে ঘুরে দেখলাম আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানকার ছাত্রদের জাঁকজমকপূর্ণ চালচলন আমার ভালো লাগলো না। শহরের পরিবেশ নোংরা। অত্যধিক গরম, মাছি আর মশায় ভর্তি। আলীগড় আমার পছন্দ হলো না। আমি কলকাতায় চলে এলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হবো, থাকবো বেকার হোস্টেলে। সমস্যা দেখা দিলো বেকার হোস্টেলে সিট পাওয়া নিয়ে। হোস্টেলে সিট খালি নেই। ইসলামিয়া কলেজে আর আমার ভর্তি হওয়া হলো না, ঢাকায় চলে এলাম। এর আগে আর কখনো আমি ঢাকা দেখি নি। ঢাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহর, পরিবেশ সুন্দর, সবুজ বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ঢাকা আমার পছন্দ হলো।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. ক্লাশে ভর্তি হই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী অভিজ্ঞ ও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী; তাঁরা ক্লাশে পড়ান ভালো; নিয়মিত ক্লাশ করলে ছাত্রদের আর বই পড়তে হয় না।

১৯৪৬ সন। নির্বাচনী হাওয়ায় দেশ মুখরিত। নির্বাচনের প্রধান বিষয় পাকিস্তান। মুসলিম লীগ তথা পাকিস্তানের জন্য ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গায় প্রচারে যেতে লাগলো। পাকিস্তানের আদর্শ ও দেশের রাজনীতির গতি-ধারা বুঝার উদ্দেশ্যে আমিও প্রচারক্যাম্পে নাম লিখালাম। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। যাঁরা প্রার্থী তাঁদের বাড়ীতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের থাকা ও খাওয়ার স্থান। কি তাদের সমাদর ও আদর আপ্যায়ন। নেতারা ও ছাত্ররা পাকিস্তান কি এবং কেন সেসব বিষয়ে যেসব কথাবার্তা বলতেন তা শুনে আমার হাসি পায়। আমি মানিকগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জে দলের সঙ্গে গিয়েছিলাম। এ'দুটো জায়গাই আমার জীবনে এই প্রথম দেখা। নির্বাচনী প্রচারে যাওয়াও জীবনে এই প্রথম। জনসভায় যেসব বক্তৃতা দেয়া হলো তার কোন সার্থকতা আমি খুঁজে পেলাম না। জনসভায় জনসমাগম বেশী হয় এবং মুসলিম লীগ প্রার্থীর পক্ষে জনসমর্থন বেশ বোঝা যায়। প্রার্থীরা উল্লসিত, নিজেদের জয় সম্পর্কে নিশ্চিত এবং ছাত্রদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এ দু'টো জায়গা ছাড়া আমি ছাত্রদের সাথে টঙ্গীতে যাই। টঙ্গী তখন অজ-গ্রাম। হাবিবুর রহমান (আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ছাত্র) আমাদের দলের নেতা। তিনি শ'চারেক লোকেব এক সমাবেশে (অধিকাংশই কৃষক) নির্বাচনী প্রার্থীকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর পুরো একঘণ্টা ইংরেজীতে বক্তৃতা দিয়ে সভার কাজ শেষ করেন। বক্তৃতাটা ইংরেজীতে দিতে দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। পাকিস্তান, মুসলিম লীগ ও কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ শব্দ যখন উচচারিত হচ্ছিল তখন ছাত্রদের হাততালি পড়ে। দেখাদেখি অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকেরা যারা ইংরেজী কিছুই বোঝে না তারাও উৎসাহে হাততালি দেয়।

১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো। এর মাস চারেক পর একদিন শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের ফজলুল হক হলে আসেন। তিনি এক ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা দেন। আমিও শ্রোতা হিসেবে ঐ ছাত্র সভায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমরা পাকিস্তান পেয়েছি। একে উন্নত করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এজন্যে দরকার একটি শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন। চলুন আমরা শাহ আজিজুর রহমানের কাছে যাই এবং 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ'কে নতুন

করে শক্তিশালী করার জন্য তাঁকে বলি।" শেখ মুজিবুর রহমানসহ আমরা বেশ কয়েকজন ছাত্র শাহ আজিজুর রহমানের কাছে গেলাম। শাহ আজিজুর রহমান তখন 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান শাহ আজিজুর রহমানকে 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র কাউন্সিল সভা ডাকার জন্য অনুরোধ করেন। শাহ আজিজুর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাব অনুযায়ী কাউন্সিল সভা ডাকতে রাজী হলেন না। শাহ আজিজুর রহমান সেসময়ে ছিলেন নাজিমুদ্দীন সরকারের সমর্থক। কাউন্সিল সভা আহ্বান করা হলে 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে' তাঁর নেতৃত্ব বহাল থাকবে না, তা তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, "আপনারা এগিয়ে আসুন, আমরা একটি নতুন ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলি।" আমি তাঁর প্রস্তাবে রাজী হলাম। মোগলটুলীর ওয়ার্কার্স ক্যাম্প সমর্থিত নেতৃস্থানীয় ছাত্ররা শেখ মুজিবুর রহমানের আবেদনে সাড়া দিলেন। অলি আহাদ, নঈমুদ্দীন আহমদ, আবদুর রহমান চৌধুরী, মোহাম্মদ তোয়াহা, আজিজ আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমিসহ আরো কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ছাত্র ফজলুল হক হল মিলনায়তনে এক কর্মীসভায় বসি। এই সভায় আমরা 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' গঠন করি। অলি আহাদ ও মোহাম্মদ তোয়াহা সংগঠনের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দেয়ার জন্য সভায় দাবি জানান। এই দাবির বিরোধিতা করে শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, "এসময় এটা বাদ দেয়া ঠিক হবে না। সরকার ভুল ব্যাখ্যা দিবে। পরে সময় হলে তা বাদ দেয়া যাবে।" আমি শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানালাম। মুসলিম শব্দ রাখা হলো। অলি আহাদ তা মেনে নিলেন। মোহাম্মদ তোয়াহা তা মানলেন না। তিনি এই সংগঠনের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখলেন না। আমরা নঈমুদ্দীন আহমদকে এই নতুন ছাত্র সংগঠনের আহবায়ক নির্বাচন করি। ১৯৪৮-এর ৪ঠা জানুয়ারী 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।

সরকারের কাজ-কর্ম থেকে আমরা বুঝতে পারলাম বাংলা ভাষার প্রতি তাদের কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। সরকার ইংরেজীর পাশাপাশি উর্দু ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পদক্ষেপ নেয়। মনিঅর্ডার ফর্ম, পোস্টকার্ড, খাম ও

কাগজের টাকার নোট থেকে সরকার বাংলা ভাষাকে বাদ দেয়। গণ-পরিষদের ভাষা রূপে উর্দু ইংরেজীর পাশাপাশি সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু গণপরিষদে পরিষদের ভাষা হিসেবে উর্দু ও ইংরেজীর পাশা-পাশি বাংলা ভাষার স্বীকৃতি অগ্রাহ্য হয়। বাংলা ভাষার প্রতি সরকারের এ-সব অবজ্ঞার কারণে পূর্ববঙ্গের ছাত্ররা সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবিকে বাস্তবায়িত করার জন্য ঢাকার ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী, সংস্কৃতিসেবী ও বুদ্ধিজীবীরা ফজলুল হক হলে এক সভায় মিলিত হয়ে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। ১১ই মার্চ (১৯৪৮) সংগ্রাম পরিষদ সারা পূর্ববঙ্গে ধর্মঘট আহ্বান করে। ছাত্রলীগ নেতারা হরতালে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য আমাকে পাবনা যাবার নির্দেশ দেন। আমি পাবনা যাই। ১১ই মার্চ (১৯৪৮) পাবনায় সফল হরতাল পালিত হয়। এডওয়ার্ড কলেজে এক বিরাট ছাত্রসভায় বক্তৃতা দেই। শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করি। মিছিলে পুলিশ বাধা দেয়। তাতে অনেকে আহত ও অনেকে গ্রেফতার হন। বিকেলে জনসভা করার কর্মসূচী ছিলো। পুলিশ জনসভা করতে দেয় নি। ১১ই মার্চের কর্মসূচী শেষ করে পরের দিন আমি পাবনা থেকে আমার গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জের শৈলজানায় যাই। কয়েক দিন বাড়িতে থাকার পর ঢাকায় ফিরে আসি। ঢাকায় এসে শুনলাম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এতে মন খুব খারাপ হয়ে গেলো। রাগে-দুঃখে আমি আন্দোলনের নেতাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলি। মনে হলো, এটি নেতাদের একটি ভুল সিদ্ধান্ত সুবিধাবাদী নেতারা গোটা আন্দোলনটিকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

১৯শে মার্চ (১৯৪৮) জিন্নাহ ঢাকায় আসেন। জানতে পারলাম ২১ তারিখে তিনি রেসকোর্স ময়দানের এক জনসভায় ভাষণ দেবেন। তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্য আমি আগ্রহান্বিত হই। আমার ধারণা ছিলো জিন্নাহ একজন বিচক্ষণ নেতা। উদ্ভূত ভাষা-সমস্যা সম্পর্কে তিনি জনসভায় নিশ্চয়ই সুচিন্তিত বক্তব্য রাখবেন। তাঁর বক্তৃতায় বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার দিকনির্দেশনা অবশ্যই থাকবে। বড় আশা নিয়ে ২১ তারিখে রেস-কোর্স ময়দানে যাই। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তিনি জনসভায় বক্তব্য রাখলেন।

তাতে আমার প্রত্যাশা পূরণ হলো না। তিনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ওকালতি করেন। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলাকে তিনি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন না। জিন্নাহর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও আস্থা ধূলিসাৎ হয়ে গেলো।

২২শে মার্চ ১৯৪৮ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন সভা আহ্বান করা হয়েছে। জিন্নাহ সভার প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন। আমি গত বছর (১৯৪৭) বি.এ. পাশ করেছি। সনদ গ্রহণের জন্য কার্জন হলে সমাবর্তন সভায় যাই। যথারীতি সমাবর্তন সভা শুরু হলো। জিন্নাহ প্রধান অতিথির ভাষণের এক পর্যায়ে তাঁর রেসকোর্স ময়দানের বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, "উর্দু, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" একথা বলার সাথে সাথে আমি দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বললাম—'নো,' 'নো'। সভায় সনদ গ্রহণের জন্য আগত অন্যান্য ব্যক্তিরা আমার মতো একই ধ্বনি তুললেন-'নো' 'নো'। জিন্নাহ বিমর্ষ হয়ে গেলেন। ভাষা সম্পর্কে তিনি আর বক্তব্য বাড়ালেন না।

বেতন বৃদ্ধির দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীরা ১৯৪৯-এর মার্চ মাসে ধর্মঘট শুরু করে। তাদের দাবী-দাওয়া ছিলো ন্যায্য। আমি এ আন্দোলনকে সমর্থন দিলাম। একদিন ধর্মঘটী কর্মচারীদের একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে সেক্রেটারিয়েটের গেটের কাছে যাই। পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে। এক মাস ডিটেনশন দিয়ে আমাকে সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হলো। সরকার ডিটেনশন আর বাড়ালো না। জেল থেকে মুক্তি পেলাম। একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠালেন। উপাচার্যের সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁর অফিস কক্ষে যাই। রুমে ঢুকেই তাঁর টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে পড়ি। উপাচার্য আমার দিকে তাকিয়ে রুক্ষস্বরে বললেন, "তুমি কার নির্দেশে এখানে চেয়ারে বসলে?" তিনি আমাকে চেয়ার থেকে উঠে যেতে আদেশ করলেন। উপাচার্যের এই অশালীন আচরণে আমি অপমানিত বোধ করি। তাঁর ওপর আমার রাগ হলো। আর রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক এটা নয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আর আমি তাঁর ছাত্র। তাঁর কাছ থেকে স্নেহ পাওয়াটাই আমি প্রত্যাশা করেছিলাম। এর বিপরীতে তাঁর কাছ থেকে

পেলাম তিরস্কার আর অবমাননাকর আচরণ। কত বড় আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা তাঁর মধ্যে সেদিন কাজ করেছিলো যার দরুন তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের সাথে অশোভন ব্যবহার করতে সঙ্কোচ বোধ করেন নি। আমি মনে মনে ভাবলাম তাঁর কথা অমান্য করলে হয়তো তিনি আমার ক্ষতি করতে পারেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবকিছু বিবেচনা করে আমি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালাম। উপাচার্য আবার আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছো। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হলে তোমাকে বণ্ড সই করতে হবে।" প্রতিবাক্যে তাঁকে আমি সবিনয়ে বল্লাম, "স্যার, আমি তো কোন অন্যায় করি নি। কেন আমাকে বণ্ড সই করতে হবে তার কোন কারণ আমি বুঝে উঠতে পারছি না।" তিনি রাগতকণ্ঠে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "কে বল্লে অন্যায় করনি? তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃঙ্খলা মানছো না। এজন্যে তোমাকে জেল খাটতে হয়েছে।" আমি জবাব দিলাম, "স্যার, আমি আদালতে দোষী সাব্যস্ত হই নি। পুলিশ সন্দেহ করে আমাকে গ্রেফতার করেছিলো, সন্দেহ মুক্ত হয়ে আবার ছেড়ে দিয়েছে।" আমার বক্তব্য তাঁর পছন্দ হলো না। তিনি আবার আমাকে বললেন, "বণ্ড সই না করলে তোমাকে শাস্তিভোগ করতে হবে।" আমি উত্তর দিলাম, "স্যার, শাস্তি পাবার মতো কোন অপরাধ আমি করিনি। বণ্ড সই করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" ক্রুদ্ধস্বরে উপাচার্য আমাকে তাঁর কক্ষ ত্যাগ করার আদেশ দিলেন। আমি সাথে সাথে তাঁর রুম ত্যাগ করে ফজলুল হক হলে চলে আসি।

কয়েক দিন পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চিঠি পেলাম। আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিন বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। ফজলুল হক হল ত্যাগের নির্দেশও দেয়া হলো। আমার জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়লো। বহিষ্কারের কথা বাড়িতে বাবাকে জানানো সম্ভব নয়। এখবর শুনলে তিনি মনে ব্যথা পাবেন। আমার ওপর তিনি খারাপ ধারণা নিবেন। বাবাকে আমার এই দুঃসংবাদের কথা জানালাম না। ফজলুল হক হল ছেড়ে দিলাম। আমি ইকবাল হলে আশ্রয় নিলাম। ইকবাল হল ছিলো তখন বাঁশের তৈরী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এখানে বিনা ভাড়ায় থাকতেন। টিউশনি করে নিজের খরচ চালাই। ডঃ কামাল হোসেন (বর্তমানে যিনি আওয়ামী লীগ নেতা) আমার ছাত্র ছিলেন।

একদিন ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মীরা আমাকে বললেন, "মুসলিম লীগ সরকার যেভাবে দেশ চালাচ্ছে তাতে সাধারণ মানুষের উন্নতির কোন আশা করা যায় না। আসুন আমরা একটি রাজনৈতিক দল গঠন করি।" তাঁদের কথার প্রতি আমি সম্মতি জানালাম। ঢাকার রোজ গার্ডেনে বশীর আহমদের বাসায় সরকারবিরোধী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে শামসুল হক, খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন, আলী আহমদ খান, খোন্দকার মোস্তাক আহমদ, শওকত আলী, শামসুদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান খান, আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, ইয়ার মোহাম্মদ খান এবং আমিসহ প্রায় তিন শত নেতা ও কর্মী উপস্থিত ছিলাম। এই সম্মেলনে "পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ" গঠিত হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতি, শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক এবং শেখ মুজিবুর রহমান যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। সভার উদ্যোক্তরা আমাকে এই নব গঠিত দলের কর্মকর্তার পদ দিতে চেয়েছিলেন। আমি বড় পদ গ্রহণ করতে রাজী হই নি। কোন সংঠনের উচচতর পদ গ্রহণের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা তখনো আমি অর্জন করতে পারি নি। তাই কর্মকর্তার পদ গ্রহণ করতে রাজী হলাম না। সাধারণ সদস্য হিসেবে পার্টির কাজ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করি। উদ্যোক্তরা আমাকে সাধারণ সদস্য হিসেবেই পার্টিতে রাখলেন। আওয়ামী লীগ গঠিত হয়েছিলো ১৯৪৯-এর ২৪ জুন। অচিরেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চুকে যায়। সে সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি। আমি ও শেখ মুজিবুর রহমান উভয়েই 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগে'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলাম। ছাত্রলীগের সব কিছুই শেখ মুজিবুর রহমান নিয়ন্ত্রণ করতেন, কর্মকর্তারা ছিলেন সংগঠনের নিমিত্ত মাত্র। এদিকটি আমার কাছে ভালো লাগে নি। শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রলীগের কোন বড় কর্মকর্তা নন, অথচ সব ব্যাপারে তাঁর একক কর্তৃত্ব করার মানসিকতা আমার কাছে গণতন্ত্রসম্মত বলে মনে হয় নি। আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে ছাত্রলীগ থেকে বাদ দেয়ার জন্য সংগঠনের কর্মকর্তাদের পরামর্শ দিলাম। তাঁরা আমার কথায় রাজীও হলেন। বাস্তবে ঘটলো তার বিপরীত। আমাকেই ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হলো। বহিষ্কারের সিদ্ধান্তটি একান্ত সঙ্গোপনে নেয়া হয়েছিলো। এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমাকে বহিষ্কারের

কিছুদিন পরেই ময়মনসিংহে ছাত্রলীগের কাউন্সিল সভা হয়। আমি এই সভায় যাই। ঘরোয়াভাবে আমি ছাত্রলীগের কয়েকজন জেলা কর্মকর্তার নিকট আমার প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটির অবিচারের কথা প্রকাশ করি। আমি তাঁদেরকে বলি "আমাকে কি অপরাধে বহিষ্কার করা হয়েছে, তা আমাকে জানানো হয় নি, বহিষ্কারের পূর্বে আমাকে কারণ জানানো নোটিশও দেয়া হয় নি। আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার অবশ্যই আমাকে দিতে হবে।" কাউন্সিল সভায় এ বক্তব্য তুলে ধরার জন্য আমি প্রস্তুতি নেই। বিকেল বেলা একজন অপরিচিত যুবক আমার কাছে এসে আমাকে রুক্ষকণ্ঠে বললেন, "আপনি খুব বাড়াবাড়ি করছেন, আপনি আজকের ট্রেনেই ঢাকা চলে যান, তা-না হলে আপনি ময়মনসিংহে আপনার সম্মান হারাবেন।" আমি সেদিন বিকেলেই ময়মনসিংহ থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ট্রেনে উঠি। আমি ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্ক চিরদিনের জন্য মিটিয়ে দিলাম।

১৯৫০-এর কথা আমি ফজলুল হক হলের পশ্চিম-দক্ষিণ পাশের ব্যারাকে একটি চা-এর দোকানে বসে আছি। আমার পাশের টুলে বসা সেক্রেটারীয়েটের দু'জন কর্মচারীর কথোপকথন আমার কানে ভেসে আসে। তাঁরা একজন আরেকজনকে বলছেন, "ছাত্রদের আন্দোলন থেমে গেলো, বাংলা আর রাষ্ট্রভাষা হচ্ছে না, উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হয়ে যাবে। আমরা উর্দু পড়তে-লিখতে পারি না। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে আমাদের কত-ই না অসুবিধা হবে। কি আর করি। আমরা চাকুরী করে খাই। আমরা কি করে আন্দোলন করি? আন্দোলনে গেলে সরকার আমাদের চাকরী খাবে। আন্দোলনে নামা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ছাত্ররা ছিলো আশা-ভরসা। তারাও ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।" এ কথাগুলো আমার পছন্দ হলো। কথাগুলো একেবারে বাস্তব সত্য, সমকালীন সমাজের জনমতের প্রতিধ্বনি। এই বর্ণনা আমার মনের মধ্যে গ্রথিত হয়ে গেলো। সরকারী কর্মচারিটির এই মূল্যবান বক্তব্য আমার ভবিষ্যৎ চলার পথে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে।

১৯৫১-তে ১১ ই মার্চ পালন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে আমতলায় এক ছাত্রসভা চলছে। সভার এক কোণে বসে ছাত্র-নেতাদের বক্তৃতা শুনছি। কোন বক্তার বক্তৃতাই আমার ভালো লাগছে না। এক

পর্যায়ে আমি দাঁড়িয়ে সভার সভাপতিকে উদ্দেশ্য করে বললাম, "আমি কিছু বলতে চাই।" সভাপতি আমাকে বলার অনুমতি দিলেন। সেক্রেটারী-য়েটের সেই কর্মচারীর বক্তব্যের আলোকে আমি সভায় বক্তৃতা দিলাম: "এভাবে সভা করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা যাবে না। আপনারা আজ যা কিছু করছেন আর বলছেন তা সবই আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এতে কোন কাজ হবে না। যদি বাংলা ভাষার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তবে রাস্তায় আন্দোলনে নামুন। আন্দোলন করতে হলে চাই সংগঠন। আপনারা সংগঠন গড়ে তুলুন।" আমার এই বক্তব্য শ্রোতাদের মধ্যে সাড়া জাগাতে সমর্থ হলো। তারা করতালি দিয়ে আমার বক্তৃতাকে স্বাগত জানায়। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর চাপে সভার উদ্যোক্তরা তাৎক্ষণিকভাবে "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি" গঠন করেন। সভামঞ্চ থেকে শ্রোতৃ-মণ্ডলীর কাছে কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হলে দেখা গেলো তাতে আমাকে একজন সাধারণ সদস্য হিসেবেও রাখা হয় নি। ফলে সভায় উত্তেজনার স্থষ্টি হয়। সভার শ্রোতারা আমাকে সংগ্রাম কমিটিতে নেয়ার জন্য দাবী তোলে। তাদেরকে শান্ত করার জন্য কমিটির সদস্য হিসেবে আমাকে নেয়া হয়। এতেও সভার শৃঙ্খলা ফিরে আসলো না। শ্রোতারা আমাকে কমিটির প্রধান কর্মকর্তারূপে পেতে চায়। তাদের দাবী অগ্রাহ্য করার মতো সাহস সেদিন ঐ সভার কর্মকর্তাদের ছিলো না। শ্রোতৃমণ্ডলীর চাপে সভার উদ্যোক্তারা আমাকে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির' আহ্বায়ক করেন।

আমি ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি—কোন দলেরই নই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদের কাছেও আমার ব্যাপক কোন প্রভাব নেই। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সকল সদস্যই আমার সাথে অসহযোগিতা করেন। মৌখিকভাবে আমি কয়েক বার সংগ্রাম কমিটির সভা আহ্বান করি। কোন সদস্যই কোন সভায় যোগদান করলেন না। এরপর সদস্যদের লিখিত নোটিশ দিয়ে সভা আহ্বান করি। তাতেও কোন কাজ হলো না। কেউ সাড়া দিলেন না। কোন সদস্যই সভায় উপস্থিত হলেন না। কমিটির কোন ফাণ্ড নেই। ফাণ্ড ছাড়া কোন সংগঠনের কাজ চালানো যায় না। এমনি পরিস্থিতিতে সংগ্রাম কমিটির অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন। আমি নিরাশ হলাম না। একদিন

সংগ্রাম কমিটির নামে আমি নিজে নিজেই একটি প্রস্তাব গ্রহণ করি। প্রস্তাবটি হলো : "বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবীতে ঢাকায় 'পতাকা দিবস' উদযাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।" প্রস্তাবটি নিয়ে আমি অবজারভার অফিসে যাই। প্রস্তাবটি এ পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক মাহবুব জামাল জাহিদীর হাতে দিয়ে আমি তাঁকে এটি ছাপাবার জন্য অনুরোধ জানাই। জাহিদী ভাই প্রস্তাবটি একবার পড়লেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিটিং ঠিক হয়েছে তো?' আমি উত্তর দিলাম--'জি-হাঁ'। সভা হয় নি, আহূত সভায় কমিটির কোন সদস্যই যোগ দেন নি। প্রস্তাবটি যাতে পত্রিকায় ছাপানো হয় সেজন্য সভা হয়েছে বলে চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিলাম। জাহিদী ভাই আমার অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। পরের দিন প্রস্তাবটি বক্স করে অবজারভারের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো হয়। পত্রিকায় সংবাদটি পাঠ করে আমি শাখারী বাজারে যাই। সেখানকার একটি দোকান থেকে কয়েকটি টিনের কৌটা কিনি। এরপর একটি প্রেসে যাই। প্রেসের অফিসে বসে এক টুকরা সাদা কাগজে একটি ব্যাজ-এর খসড়া তৈরী করলাম। কাগজে মোটা অক্ষরে লিখলাম,—"বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।" নিচে লিখলাম—"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি।" খসড়া ব্যাজটির ৫/৬শ' ছাপিয়ে দেয়ার জন্য প্রেস ম্যানেজারকে অনুরোধ জানাই। তিনি ঘন্টাখানেকের মধ্যে সেগুলো ছাপিয়ে দেন। ব্যাজগুলো ছাপার খরচ পড়েছিলো ৩০/৩৫ টাকার মতো। টিনের কৌটোগুলোর গায়ে বড় বড় অক্ষরে লিখলাম—"বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সবাই সাধ্যমতো সাহায্য করুন।"

১০/১৫ জন ছাত্রসমেত ব্যাজ ও কৌটোগুলো নিয়ে সেক্রেটারীয়েটের গেটে যাই। আমরা সেক্রেটারীয়েটের কর্মচারীদের ব্যাজ পরিয়ে দিয়ে আর্থিক সাহায্যের জন্য কৌটাগুলো তাঁদের সামনে তুলে ধরি। তাঁরা সকলেই কৌটার ভেতরে টাকা-পয়সা গুঁজে দিলেন। সেদিন সেক্রেটারীয়েটের কর্মচারীদের কাছ থেকে ন'শ' টাকার ওপরে সাহায্য পাই। সিকি, আধুলি, এক টাকা, এমন কি পাঁচ ও দশ টাকার নোটও কৌটার ভেতরে পড়েছিলো। নেতাদের সাহায্য ব্যতীত সাধারণ ছাত্রদের সাহায্য ও সহযোগিতায় ১৯৫০-এ এমনিভাবে আমি প্রথম 'পতাকা দিবস' পালন করি। এই দিবস

পালন করার ফলে আমি বহু কর্মী পেয়ে যাই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির ফাংও তৈরী হয়ে যায়। এবার আমি সম্পূর্ণ হতাশামুক্ত হয়ে ভাষা আন্দোলনকে সক্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করি।

পোস্টার করে পতাকা দিবসে অর্থ সংগ্রহের খবর ছাত্রদের জানিয়ে দিলাম। ১৯৫১-এ ঢাকা 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' বিরাটভাবে ১১ই মার্চ পালন করে। অবজারভার পত্রিকায় ১২ই মার্চ (১৯৫১)-এর সংখ্যায় এ সংবাদ গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হয়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গণপরিষদের সদস্যদের নিকট স্মারকলিপি পেশ করার সিদ্ধান্ত আমরা নেই। আমি নিজেই এটি লিখার কাজে হাত দিলাম। লিখে ফেলতে সমর্থও হলাম। ১৯৫১-র ১১ই এপ্রিল আমি স্মারকলিপিটি লিখেছিলাম। এতে আমরা বলেছিলাম—"বাংলা একটি সমৃদ্ধ ভাষা এবং পাকিস্তানের অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা। এই ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার মাধ্যমেই কেবল পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষা করা সম্ভব। এ দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই দেশের ছাত্র-সমাজ ও জনগণ কখনো আন্দোলন থেকে ক্ষান্ত হবে না। আন্দোলন জয়যুক্ত হবেই। স্মারকলিপিকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনারা দেখবেন বলে আমরা আশা করি।" গণপরিষদের সকল সদস্যের কাছে এবং পাকিস্তানের সব পত্রিকা অফিসে এই স্মারকলিপির কপি ডাকযোগে পাঠানো হয়। এই স্মারকলিপি বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। দেশের উভয় অংশের বহু পত্রিকায় এই স্মারকলিপির সংবাদ ছাপানো হয়। সীমান্ত প্রদেশের 'দৈনিক খাইবার মেল' সম্পাদকীয় লিখে আমাদের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানায়। 'পাকিস্তান টাইমস'-এ এই স্মারকলিপিকে সমর্থন করে অনেক চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়। এই সংক্রান্ত যাবতীয় খবর আমরা পোস্টারে লিখে দেয়ালে এঁটে তা ছাত্রদের জানিয়ে দেই। ছাত্রদের মধ্যে এতে বিরাট উৎসাহের সৃষ্টি হয়। অনেকে মনে করেন ১৯৪৮-এর মার্চের পরে ১৯৫২-র জানুয়ারীর পূর্ব পর্যন্ত ভাষার ব্যাপারে কোন তৎপরতা ছিলো না। তাদের এই ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। ১৯৫০-৫১-এ ভাষার ব্যাপারে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির' ব্যাপক তৎপরতা ছিলো।

৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৫১) "স্থানীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি স্থাপন করুন এবং বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করুন"—শিরোনামে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করি। এটি ছাত্রদের মধ্যে আমরা ব্যাপকভাবে প্রচার করি।

২৭শে জানুয়ারী ১৯৫২-তে নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পল্টন ময়দানে এক জনসভায় উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হবে বলে ঘোষণা দেন। এর প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ৩০শে জানুয়ারী (১৯৫২) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতীক ধর্মঘট আহ্বান করে। এই ধর্মঘট স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়। এদিন ১০/১৫ হাজার লোকের অভূতপূর্ব মিছিল হয়। জনসাধারণ রাস্তায় সমবেত হয়ে এই মিছিল দেখে এবং একে অভিনন্দন জানায়। মিছিল শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা-ভবন প্রাঙ্গণে এক বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানাই। এই কর্মসূচীও সাফল্যজনকভাবে পালিত হয়।

৩০শে জানুয়ারী (১৯৫২) সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ গঠিত হয়। এর অন্যতম প্রধান শরীক দল ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি। ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) রাতে আওয়ামী লীগ অফিসে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের সভায় যে সব দল ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে ছিলো তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান দল ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি। ২১শে ফেব্রুয়ারীর মাত্র ২০দিন আগে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদ গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলনকে নিয়ম-তান্ত্রিকতা রক্ষার দোহাই দিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের চরম বিরোধিতা করে। ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রসভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি, যুবলীগ এবং সাধারণ ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিয়ে এই আন্দোলনের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখে।

২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) পুলিশী নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড দেখে আমি নিজেকে দায়ী মনে করে (আমার ধারণা হয়েছিলো আমরা ১৪৪ ধারা

ভঙ্গ করার ফলেই এতগুলো মূল্যবান প্রাণের অবসান ঘটেছে) মেডিক্যাল কলেজের ইমারজেন্সী ওয়ার্ডের সামনের লাইনে বসে কাঁদতে থাকি। এমন সময় আবদুস সাত্তার (পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের যুগ্ম-সম্পাদক) এসে আমাকে বললেন, "এভাবে কান্নাকাটি করে বা নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থেকে কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে বরং আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী ঠিক করেন। ব্যাপক জনগণ এই হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করছে না। তারা হাসপাতালে এসে আহত ও নিহতদের প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছে। যদি আগামীকাল (২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২) জনগণকে শহীদদের জানাজা নামাজে যোগদান ও হরতাল পালনের আহ্বান জানানো যায় তা হলে তারা ব্যাপকভাবে সাড়া দিবে।" পরিস্থিতির এই মূল্যায়নকে আমি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত বলে মনে করে তাঁকে একটি প্রচারপত্রের খসড়া লিখে আনার অনুরোধ জানাই। তিনি সে খসড়া লিখে এনে আমাকে দিলেন। আমি সেটি নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে যাই। সেখানে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুব আহতদের সেবা শুশ্রূষায় ব্যস্ত ছিলেন। আমাকে দেখে তিনি আমার সাথে কথা বলার জন্য এগিয়ে আসেন। আমি তাঁকে সেই খসড়াটি পড়ে শুনিয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে তাতে তাঁর স্বাক্ষর দিতে বলি। আমার কথায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য আমাদেরকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। আমাদের সাথে আর কোন সম্পর্ক না রাখার কথা বলে তিনি খসড়ায় স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন। আমিও তাঁকে পাল্টা দু'কথা শুনিয়ে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির নামে এটি প্রচারিত হবে বলে জানালাম। ২২ তারিখের কর্মসূচী বিভিন্নভাবে জানানো হলেও বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক হিসেবে আমার স্বাক্ষরে সেই খসড়া অনুযায়ী ২১ তারিখ রাতে প্রচারপত্রের মাধ্যমে নামাজের জানাজা ও হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করি।

২১ তারিখে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে যদি আন্দোলনের সূচনা করা না হতো এবং ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ২২ তারিখে শহীদদের জানাজা নামাজ ও হরতালের কর্মসূচী যদি না দেয়া হতো তা হলে ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫২)

সন্ধ্যায় পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র-ভাষা করার জন্য নূরুল আমীন প্রস্তাব পাশ করতেন না। ২২ তারিখের আন্দোলনের জন্য ২১ তারিখের জীবনদান সার্থক হয়েছে। ২১ ও ২২ তারিখের কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আবদুল মতিন সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালীর শৈলজানা গ্রামে ১৯২৭-এ জন্মগ্রহণ করেন। দার্জিলিং সরকারী স্কুল থেকে ১৯৪৩-এ ম্যাট্রিক, রাজশাহী সরকারী কলেজ থেকে ১৯৪৫-এ আই. এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭-এ বি. এ. এবং ১৯৫১-এ এম. এ. (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) পাশ করেন। ১৯৪৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে তিন বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি'র আহ্বায়ক ছিলেন। বায়ান্নর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেয়ার দায়ে ৭ই মার্চ ১৯৫২-তে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ হন এবং ১০ই মার্চ জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর তিনি বামপন্থী রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং জাতীয় কৃষক সমিতির সভাপতি।

কাজী গোলাম মাহবুব

আমি ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে একই বছরে কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজে আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হই। ১৯৪৩-এর সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের অনাহার, ক্ষুধা ও মৃত্যু আমাকে মর্মাহত করে। এ দেশের দরিদ্র অধিকার-বঞ্চিত মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে কায়েদে আজমের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়ি। রশীদ আলী দিবস, সর্বভারতীয় পোস্টাল স্ট্রাইক ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সকল আন্দোলনে যোগদান করি। আবুল হাশিম ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলি। বাংলার রাজনীতিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোলকাতায় সক্রিয়ভাবে কাজ করেছি। ১৯৪৬-এ আমি কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হই। কলেজ ইউনিয়নের অভিষেক অনুষ্ঠানে সেবার আমরা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য পি. এ. ব্যানার্জীকে প্রধান অতিথি করেছিলাম। ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রদের সম্পর্কে তাঁর ভাল ধারণা ছিল না। আগে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে এ কলেজের ছাত্ররা উগ্র সাম্প্রদায়িক। যেদিন আমরা তাঁকে নিমন্ত্রণ পত্র দেয়ার জন্য তাঁর অফিসে যাই সেদিন থেকে মুসলমান ছাত্রদের সম্পর্কে তাঁর ভ্রান্ত ধারণা পাল্টে যায়। সেদিন আমাদের সাথে আলোচনা করে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। ব্যানার্জী মহাশয় আমাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন। সেদিনের অনুষ্ঠানে তিনি আমাদের আচার-ব্যবহারে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছিলেন। মুসলমান ছাত্ররা যে উদার ও অসাম্প্রদায়িক পরবর্তীকালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে তা তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করেছেন।

সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের নেতৃত্বে আস্থাশীল হয়ে নির্যাতিত, অশিক্ষিত ও দরিদ্র মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলাম। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো, আমি

কোলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ. (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) ও ল'তে ভর্তি হই। খাজা নাজিমুদ্দীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলাম, নাজিমুদ্দীন সরকার তার বিপরীত কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তিনি আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হন। পূর্ববঙ্গে তখন আন্দোলন গড়ে তোলার মতো কোন ছাত্র-সংগঠন ছিল না। শাহ আজিজের নেতৃত্বাধীন 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ' ছিল সরকার সমর্থক ছাত্র-সংঠন। এই সংগঠনের প্রতি আমাদের কোন সমর্থন ছিল না। ১৫০ নং মুগলটুলীর 'ওয়ার্কার্স ক্যাম্প' ছিল সে সময়ের প্রগতিশীল ছাত্র-যুবক ও রাজনৈতিক কর্মীদের মিলন-কেন্দ্র। বিভাগ-পূর্বকালেই ঢাকার মুসলিম লীগের প্রগতিশীল ছাত্র ও যুব কর্মীরা এই ক্যাম্প গঠন করেছিলেন। শামসুল হক, খোন্দকার মোশতাক আহমাদ, তাজুদ্দীন আহমদ, কামরুদ্দীন আহমদ প্রমুখ এর নেতৃত্বে ছিলেন। আমি ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের রাজনীতিতে যোগদান করি। ছাত্রদের প্রগতিশীল রাজনীতির প্রতি ব্যাপকভাবে সংগঠিত করার জন্য আমরা ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' গঠন করি। নঈমুদ্দীন এর আহবায়ক নির্বাচিত হন। আমি ছিলাম অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এই ছাত্র-সংগঠন ভাষা আন্দোলনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই বাংলা ভাষার উপর সরকারী আঘাত নেমে আসে। নোট, মনি অর্ডার ফর্ম থেকে বাংলা ভাষাকে বাদ দেয়া হয়। সেখানে ইংরেজীর পাশাপাশি উর্দু ভাষাকে স্থান দেয়া হয়। বাংলা ভাষার প্রতি সরকারের অবজ্ঞার পরিচয় নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছিল ২৩শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) গণপরিষদের অধিবেশনে। পরিষদের কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজীর সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের সরকারী ভাষা করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কংগ্রেস দলীয় সব সদস্যই এ প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। পরিষদের নেতা ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বাংলা ভাষার দাবীকে প্রত্যাখান করেন। পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন লিয়াকত আলী খানের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। সরকারের এই অন্যায় সিদ্ধান্ত আমাদেরকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। আমাদের আর বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলা ভাষাকে

দুর্বল করে দিয়ে আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক মানসকে ও আর্থিক উন্নতিকে বানচাল করে দিতে চায়। তাই সরকারী সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে নি। বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা আন্দোলনের পথ বেছে নেই।

সুষ্ঠু ও সংগঠিত আন্দোলন সৃষ্টির জন্য ২রা মার্চ (১৯৪৮) ফজলুল হক হলে ছাত্র, যুব, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের একটি সভা আহবান করা হয়। এর উদ্যোক্তা ছিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন শামসুল হক, কামরুদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক আবুল কাশেম, আজীজ আহমদ, নৈঈমুদ্দীন আহমদ, অজিত গুহ, আলী আহমদ এম. এল. এ., তফাজ্জল আলী, শামসুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, শামসুল আলম, শওকত আলী, আবদুল আউয়াল, শহীদুল্লা কায়সার, লিলি খান, অলি আহাদ, তাজুদ্দীন আহমদ, আনোয়ারা খাতুন, রণেশ দাশ গুপ্ত, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। আমি এ সভায় উপস্থিত ছিলাম। সভায় সভাপতিত্ব করেন কামরুদ্দীন আহমদ। ভাষা আন্দোলনকে বলিষ্ঠ সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্য ঐ সভায় "রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয়। শামসুল আলম (সহ-সভাপতি, ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদ) সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক নির্বাচিত হন। গণ আজাদী লীগ, তমদ্দুন মজলিস, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ, গণতান্ত্রিক যুব লীগ, সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ, ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদ, মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ ও ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ভাষার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১১ই মার্চ (১৯৪৮) 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' সারা পূর্ববঙ্গব্যাপী হরতাল আহবান করে। হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমরা ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করি। ৪ঠা মার্চ (১৯৪৮) ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করি। ১১ই মার্চ (১৯৪৮) আমরা সেক্রেটারীয়েট ঘেরাও করার কর্মসূচী ঘোষণা করি, উদ্দেশ্য ছিল সেক্রেটারীয়েট ঘেরাও কর্মসূচী সফল হলে আমাদের দাবী সরকার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে বাধ্য হবে। এই কর্মসূচীকে সফল করার জন্য আমরা হলে হলে কর্মীসভা করি। নাজিমুদ্দীন সরকার হরতালকে প্রতিহত করার জন্য ঢাকা শহরের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বড় বড় লাঠিধারী পুলিশ মোতায়েন করেছিল। ১১ই মার্চ সকালে সেক্রেটারীয়েটের

প্রথম গেট (আবদুল গণি রোড)-এ শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান ও অলি আহাদের নেতৃত্বে এবং দ্বিতীয় গেট (তোপখানা রোড)-এ শওকত আলী, আজিজ আহমদ, বায়তুল্লাহ, খালেক নেওয়াজ খান ও আমার নেতৃত্বে পিকেটিং শুরু হয়। সেক্রেটারীয়েটে ঢোকার সকল রাস্তা আমরা বন্ধ করে দেই। সাড়ে ন'টার দিকে আই. জি. জাকির হোসেন ও ডি. আই. জি. টেনডেণ্ট বেথাম স্ব স্ব গাড়িযোগে তোপখানা রোডে এসে উপস্থিত হন। আমরা তাঁদের গাড়ির গতিরোধ করার জন্য রাস্তায় শুয়ে পড়ি। জাকির হোসেন গাড়ি থেকে নেমে আসেন। তিনি পায়ে হেঁটে সেক্রেটারীয়েটের দ্বিতীয় গেটের দিকে অগ্রসর হন। আমরা তাঁকে বাধা দেই। তখন লাঠিধারী পুলিশ পিকেটিং-কারীদের উপর হামলা চালায়। শওকত আলী ও বায়তুল্লাহকে পুলিশ ভীষণ-ভাবে মারপিট করে। জাকির হোসেনকে শারীরিকভাবে বাধা দেওয়ার জন্য আমাকে ও শওকত আলীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এরপর গ্রেফতার হন আজিজ আহমদ। শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান ও অলি আহাদকে পুলিশ প্রথম গেটে গ্রেফতার করেছিল। গ্রেফতারকৃত আমাদের সকলকে পুলিশ একই ট্রাকে করে কোতয়ালী থানায় নিয়ে যায়। সেখান থেকে আমাদেরকে সেণ্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। পরের দিন ১২ই মার্চ (১৯৪৮) আমাদের মুক্তির দাবীতে ঢাকা শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়েছিল। তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার পটভূমিকায় নাজিমুদ্দীন সরকার ভাষা আন্দোলনকারী-দের সঙ্গে তিক্ততা বাড়াতে চাইল না। সরকার রাষ্ট্র-ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসে। এর পশ্চাতে দু'টি কারণ নিহিত ছিল। প্রথমতঃ চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, ডঃ আবদুল মুত্তালিব মালিক ও টি. আলীর নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গ আইন সভার ৬৫ জন সদস্য একজোট বেঁধে ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সোহরাওয়ার্দীপন্থী। তাঁরা ভাষা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে-ছিলেন। নাজিমুদ্দীন সরকারের নিকট বিষয়টি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল। দ্বিতীয়তঃ ১৯ শে মার্চ (১৯৪৮) কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পূর্ববঙ্গ সফরের কর্মসূচী চূড়ান্ত করা হয়েছিল। এ সময় প্রদেশের পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল থাকলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নাজিমুদ্দীন হেয় প্রতিপন্ন হবেন। পরিস্থিতি শান্ত রাখার জন্য নাজিমুদ্দীন, রাষ্ট্র-ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ১৫ই মার্চ আলোচনায় বসেন এবং উভয় পক্ষ একটি খসড়া চুক্তি প্রণয়ন করেন। এই খসড়ার মূল বিষয়বস্তু ছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য

এবং তাকে গণপরিষদের ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীর পরীক্ষা দিতে উর্দুর সম মর্যাদাদানের জন্য পূর্ববঙ্গ পরিষদে একটি প্রস্তাব পাশের পর তা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হবে এবং ভাষা আন্দোলনের সকল কারা-বন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে। অধ্যাপক আবুল কাশেম ও কামরুদ্দীন আহমদ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এসে খসড়া চুক্তিটি আমাদেরকে দেখান। শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, শওকত আলী ও আমি খসড়া চুক্তিপত্রটি পর্যালোচনা ও অনুমোদন করি। অতঃপর তা স্বাক্ষরিত হয়। সরকার পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন এবং রাষ্ট্র-ভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কামরুদ্দীন আহমদ এতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বন্দী মুক্তির একটি তালিকা জেলখানায় আমাদের হাতে আসে। তাতে আমার ও শওকত আলীর নাম ছিল না। সেক্রেটারীয়েটে পিকেটিং করার সময় আমি এবং শওকত আলী জাকির হোসেন (আই.জি)-কে শারীরিকভাবে বাধা দিয়েছিলাম। সেজন্য আমাদের দু'জনের বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানায় বিশেষ মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এজন্য আমাদের দু'জনের মুক্তির আদেশ হয় নি। অন্যান্য রাজবন্দীরা আমাদের দু'জনকে বাদ দিয়ে জেলখানা পরিত্যাগ করতে অসম্মত হন। জেলখানায় দারুণ উত্তেজনা ও হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। সরকার আমার ও শওকত আলীর নামে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। আমরা সবাই ১৫ই মার্চ (১৯৪৮) সন্ধ্যার সময় জেল থেকে মুক্তি পেলাম। জেলগেটে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-জনতা আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানায় এবং মাল্যদান করে।

১৯শে মার্চ (১৯৪৮) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ববঙ্গে সফরে আসেন। ঢাকা বিমান বন্দরে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। ২১শে মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় তিনি উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র-ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন। তাঁর এই ঘোষণা শুনার পর আমাদের মনে ব্যাপক ক্ষোভ ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল। ২৪শে মার্চ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি বক্তৃতাকালে আবার বলেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র-ভাষা'। উপস্থিত ছাত্ররা 'নো নো' বলে তাঁর বক্তৃতাকে প্রত্যাখ্যান করে। ঐ দিন বিকেলে তিনি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দকে এক সাক্ষাৎ দান করেন। সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শামসুল হক, কামরুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুর

রহমান চৌধুরী, অলি আহাদ, তাজুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রমুখ জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য জিন্নাহ-কে অনুরোধ করেন। এ দাবী জিন্নাহর মনঃপূত হয় নি। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, টি. আলী ও ডাঃ আবদুল মুত্তালিব মালিক ১৯৪৮-এর ভাষা আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁদের এই সমর্থন আন্তরিক ছিল না। বাহ্যতঃ তাঁরা আন্দোলনকে সমর্থন করলেও সরকারী পদ লাভের জন্য তাঁরা আবার গোপনে গোপনে নাজিমুদ্দীনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের ভাঙ্গন ঠেকাবার জন্য নাজিমুদ্দীন মোহাম্মদ আলীকে রাষ্ট্রদূত এবং টি. আলী ও ডাঃ মালিককে মন্ত্রিত্ব দিয়ে নিজের দলের পক্ষে নেন।

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের ধর্মঘট এদেশের ইতিহাসে আর একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীরা এই আন্দোলনকে শুধু সমর্থনই দেয় নি নেতৃত্বও দিয়েছিল। এই আন্দোলনে আমি ও অলি আহাদ গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ হই। শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। আরো বহু ছাত্রকে জেল, জরিমানা ইত্যাদি নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। ঐ বছর ২৬শে এপ্রিল টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে শামসুল হক মুসলিম লীগ প্রার্থী করোটিয়ার বিখ্যাত জমিদার খুররম খান পন্নীকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছিলেন। জেলে বসে শামসুল হকের এই ঐতিহাসিক বিজয় পত্রিকায় পাঠ করে এদেশের প্রগতিশীল রাজনীতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার মনে এক বিরাট আশার সঞ্চার হয়েছিল।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি, মোহাম্মদ আলী, টি. আলী ও ডাঃ মালিকের বিশ্বাসঘাতকতা এদেশে বিরোধী দল গঠনে এক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। মুসলিমলীগ তাদের খেয়ালখুশী মত এককভাবে দেশ শাসন করতে থাকে। মুসলিমলীগের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিরোধ করার জন্য আমরা ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মীরা একটি রাজনৈতিক দল গঠন করি। এই দলের নাম 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'। মওলানা ভাসানী সভাপতি, শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক, শেখ মুজিবুর রহমান ও খোন্দকার মোশতাক আহমাদকে যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচন করা হয়।

আমি ছিলাম এ দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বশীর আহমদের রোজ গার্ডেনের বাড়িতে ১৯৪৯ সালের ২৪শে জুন এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান পূর্ববঙ্গের গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে গৌর-বোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে। হাজার হাজার ছাত্র-জনতা এদলে যোগ দিয়েছিল। অচিরেই এটি একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়ে উঠেছিল।

১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে পূর্ব বাংলায় ভয়ানহ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আর্মানিটোলা ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মওলানা ভাসানী। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান তখন ঢাকায় অবস্থান কর-ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য জনসভা শেষে একটি বিরাট শোভাযাত্রা গভর্ণর হাউসের দিকে রওনা হয়। আমিও ঐ মিছিলে অংশ নিয়েছিলাম। মিছিলটি ফুলবাড়িয়া রেলগেটের কাছে গিয়ে পৌঁছলে পুলিশের আক্রমণের সম্মুখীন হয়। পুলিশ শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, খোন্দকার মোশতাক আহমাদ, ইয়ার মোহাম্মদ খান ও আমাকে নির্মমভাবে মারপিট করে। মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আমরা প্রাণপণে দৌঁড়িয়ে ১৫০ নং মুগলটুলীতে গিয়ে আশ্রয় নেই। রাতে আমাদের সকলের জ্বর হয়। ডাঃ আবদুল করিম আমাদেরকে চিকিৎসা করেন। ভোর রাতে পুলিশ সে বাড়িতে হানা দেয়। আমি, শেখ মুজিবুর রহমান ও শওকত আলী বাড়ির পেছনের দেয়াল টপকিয়ে মৌলভী বাজারের দিকে পালিয়ে যাই। পুলিশ আমাদেরকে গ্রেফতার করতে পারে নি। আমি দশ/পনের দিন আত্মগোপন করে থাকি। শেখ মুজিবুর রহমানকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল।

১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারীতে দেশে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য পূর্ব পাকিস্তান দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি নামে নির্দলীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সভাপতি, আলী আহমদ এম. এল. এ সাধারণ সম্পাদক এবং আমি যুগ্ম সম্পাদক ছিলাম। দাঙ্গা দমনে এ কমিটি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল। আমার নিজস্ব জেলা বরিশালে দাঙ্গা ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করেছিল। গৌরনদীর জনপ্রিয় নেতা মাজেদ কাজী ও আলতাফ মিয়া দাঙ্গা দমনে প্রশংসনীয় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আলতাফ মিয়া দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে গিয়ে দুষ্কৃতিকারীদের হাতে নিহত হন। মানবতা রক্ষার জন্য জীবন বিসর্জন করে গেছেন তিনি। আলতাফ মিয়ার মৃত্যু বরিশালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ দাঙ্গা প্রতিরোধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানের ঐকান্তিক কর্ম প্রচেষ্টার ফলে ঢাকা শহরে দাঙ্গা বিস্তার লাভ করতে পারে নি।

লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের প্রধান-মন্ত্রী হন। নূরুল আমীন এ সময় পূর্ববঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী। ১৯৫২ সালের ২৫শে জানুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দীন পূর্ববঙ্গ সফরে আসেন। ২৭শে জানুয়ারী ১৯৫২-পল্টন ময়দানে এক জনসভায় উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন। নাজিমুদ্দীনের এই উক্তি ছিল ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ রাষ্ট্র-ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে তাঁর সম্পাদিত চুক্তির পরিপন্থী। তাঁর এই হীন চক্রান্তকে প্রতিহত করার জন্য আমরা সংগ্রামের পথ বেছে নেই। ছাত্র, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করি। আমি ও খালেক নেওয়াজ খান ৩০শে জানুয়ারী সন্ধ্যে ছ'টায় ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে একটি সর্বদলীয় সভা আহ্বান করি। যথাসময়ে সভার কাজ শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম-লীগের সহ-সভাপতি আতাউর রহমান খান। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিমলীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, যুবলীগ, রিকশা শ্রমিক ইউনিয়ন, সিভিল লিবার্টীস কমিটি, তমদ্দুন মজলিস, ইসলামিক ব্রাদার্স হুড, বিভিন্ন হল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিবৃন্দ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের একজন নেতাও এ সভায় যোগদান করেছিলেন। আমাকে আহ্বায়ক করে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা কর্ম পরিষদ' গঠন করা হয়। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (সভাপতি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ), আবুল হাশিম(খেলাফতে রব্বানী পার্টি), শামসুল হক (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগ), অধ্যাপক আবুল কাশেম (তমদ্দুন মজলিস), আতাউর রহমান খান (সহ সভা-পতি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ), কামরুদ্দীন আহমদ (গণ আজাদী লীগ), খয়রাত হোসেন (সদস্য, পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ), মোহাম্মদ তোয়াহা, সহ-সভাপতি যুবলীগ), আনোয়ারা খাতুন (সদস্য, পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ),

অলি আহাদ (সাধারণ সম্পাদক, যুবলীগ), আব্দুল গফুর (সম্পাদক, সাপ্তাহিক সৈনিক), মীর্জা গোলাম হাফিজ (সিভিল লিবার্টি কমিটি), শামসুল হক চৌধুরী (সহ-সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ), খালেক নেওয়াজ খান (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ), আলমাস আলী (আওয়ামী মুসলিমলীগ, নারায়ণগঞ্জ), আব্দুল আউয়াল (আওয়ামী মুসলিমলীগ, নারায়ণ-গঞ্জ), সৈয়দ আবদুর রহিম (সভাপতি, ঢাকা রিকসা শ্রমিক ইউনিয়ন), মুজিবুল হক (সহসভাপতি, সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ), হেদায়েত হোসেন (সাধারণ সম্পাদক, সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ), শামসুল আলম (সহ-সভাপতি, ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদ), গোলাম মাওলা (সহ-সভাপতি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ), সৈয়দ নুরুল আলম (পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ), নূরুল হুদা (সহ-সভাপতি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাত্র সংসদ), শওকত আলী (ওয়ার্কাস ক্যাম্প), আবদুল মতিন (আহবায়ক ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ), আখতার উদ্দীন আহমদ (নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ), আহমদ আলী (সহ-সভাপতি, মিডফোর্ড মেডি-ক্যাল স্কুল ছাত্র সংসদ) ও মতিয়ার রহমান (সাধারণ সম্পাদক, মিডফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল ছাত্র সংসদ) কর্মপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ৯৪নং নবাবপুর রোডে পরিষদের অফিস খোলা হয়েছিল।

কর্মপরিষদের আহ্বানে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ১১ই ফেব্রুয়ারী প্রদেশব্যাপী জনসভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্র-ভাষা কর্মপরিষদ সমগ্র পূর্ববাংলা ব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল আহ্বান করে। ঐ দিন ছিল পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন। আইন পরিষদের সদস্যদের উপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আমরা ঐ দিন হরতালের ডাক দিয়েছিলাম, যাতে পরিষদ সদস্যরা বাংলা ভাষার পক্ষে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য শামসুল হক, শওকত আলী এবং আমি ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের ছাত্র, যুবক ও সাধারণ মানুষকে ব্যাপক-ভাবে সংগঠিত করি। নারায়ণগঞ্জের আলমাস, আবদুল আউয়াল এবং খান সাহেব ওসমান আলী আমাদের সঙ্গে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিলেন। আমরা ঢাকার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। ২১শে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচীর প্রতি তাঁদের সমর্থনও আদায় করতে সমর্থ

হয়েছিলাম। কর্ম পরিষদের ডাকে ১৩ ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী 'ফ্লাগ ডে' পালিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল কর্মীবাহিনীকে আন্দোলনমুখী করে তোলা। হাজার হাজার কর্মী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছিল। ছাত্র, যুবক ও জনতা বুকে ফ্লাগ লাগিয়ে ১৩ ও ১৪ তারিখে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীকে জানিয়ে দিয়েছিল যে রক্তের বিনিময়ে হলেও তারা বাংলা ভাষার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করে ছাড়বে।

আন্দোলনের ব্যাপক প্রস্তুতিতে সরকার দিশেহারা হয়ে পড়ে। ২০শে ফেব্রুয়ারী সরকার, ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। উদ্ভূত পরিস্থিতি আলোচনার জন্য ঐ দিন সন্ধ্যায় ৯৪, নবাবপুর রোডে আওয়ামীলীগ অফিসে আমি রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের জরুরী সভা আহ্বান করি। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও আতাউর রহমান খান ব্যতীত কর্মপরিষদের প্রায় সকল সদস্যই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা ভাসানী তখন মফঃস্বলে ছিলেন। আবুল হাশিম সভায় সভাপতিত্ব করেন। বক্তারা উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেন। অধিকাংশ বক্তাই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাঁদের যুক্তি ছিল,' ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে দেশে বিশৃঙ্খলা ও অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সরকার নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি বন্ধ করে দেয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। দেশে নিয়মতান্ত্রিক শাসন না থাকলে প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না। তাঁদের মতে "ভোটের মাধ্যমে স্বৈরাচারী মুসলিমলীগ সরকারকে পরাজিত করে এদেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।" আওয়ামীলীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ জোরালোভাবে এ যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। সভার বেশীর ভাগ সদস্যের মতামত তাঁর অনুকূলে ছিল না। সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৮-৩০ মিনিটে আমি, শামসুল হক এবং কর্মপরিষদের আরো কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে যাই। সেখানে আমতলায় একটি ছাত্র সভার আয়োজন করা হয়েছিল। যথাসময়ে সভার কাজ শুরু হল। সভায় বিপুল সংখ্যক ছাত্রের সমাবেশ ঘটেছিল। গাজীউল হক সভায় সভাপতিত্ব করেন। আবদুল মতিন

১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। শামসুল হক তাঁর বক্তৃতায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। সভার সাধারণ ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে মতামত দিয়েছিল। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হল ৫ জনের দল করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে। তদনুযায়ী ৫ জন ৫ জন করে ছাত্র। আমতলা থেকে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ (বর্তমান জগন্নাথ হলের অডিটোরিয়াম)-এর দিকে যাত্রা শুরু করে। এমনিভাবে চার পাঁচ দল রাস্তায় বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। বিশ্ববিদ্যালয় অভ্যন্তরে পুলিশ ঢুকে পড়ে এবং লাঠিচার্জ করে। ছাত্র-জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আমরা মেডিক্যাল কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে গিয়ে আশ্রয় নেই। মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের সামনে বিপুল সংখ্যক লোকের সমাবেশ ঘটতে থাকে। পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে উপস্থিত ছাত্র-জনতার মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। জনতা পুলিশের উপর ব্যাপকভাবে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশ রাস্তায় ফায়ারিং পজিশন নেয়। তাতে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা পুলিশের প্রতি আরো মারমুখী হয়ে উঠে। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কোরাইশী পুলিশকে গুলি চালাবার নির্দেশ দেয়। সিটি এস. পি মাসুদ মাহমুদের নেতৃত্বে অপরাহ্নে পুলিশ মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলের দিকে গুলি চালায়। হোস্টেলের বারান্দায় দাঁড়ানো আবুল বরকত বুলেট-বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। তাঁর শরীর থেকে প্রবল রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল, আমরা তাঁকে ধরাধরি করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। সালাউদ্দীন নামক আরেকজন যুবক পুলিশের গুলিতে রাস্তায় মারা যায়। বুলেটের আঘাতে তাঁর মাথার খুলি উড়ে গিয়েছিল। হত্যাকাণ্ডের খবর মুহূর্তের মধ্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকার অফিস-আদালত, দোকান-পাট, হাট-বাজার, গাড়ি ঘোড়া সব কিছু বন্ধ হয়ে যায়। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। জনতা মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলের সামনে এসে সমবেত হয়। শহরের আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে। সবকিছু সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

বিকেলে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের অধিবেশন চলছিল। হত্যার প্রতিবাদে আইন সভার সদস্য মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ আইন সভার অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করার প্রস্তাব আনেন। তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়, মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন পুলিশের গুলি চালাবার স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। এর প্রতিবাদে

মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন এবং কংগ্রেস দলীয় সদস্যরা আইন সভার অধিবেশন বর্জন করেন। তাঁরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আহত ও নিহতদের দেখতে আসেন। রাতে রাষ্ট্র-ভাষা কর্মপরিষদের নেতৃবৃন্দ মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক সভায় মিলিত হন। এই সভায় আমি সহ অলি আহাদ, গোলাম মাওলা, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সরকার রাতে ঢাকা শহরে কারফিউ জারি ও সামরিক বাহিনী তলব করে। গভীর রাতে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ঘেরাও করে মর্গ থেকে নিহতদের লাশ ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং তা গায়েব করে ফেলে। সরকারী তথ্য বিবরণীতে পুলিশের গুলিতে নিহতদের সংখ্যা চার জন বলে স্বীকার করা হয়।

২২শে ফেব্রুয়ারী সকাল আটটায় মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের সামনে শহীদদের গায়েবী জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার লোক এতে অংশ নিয়েছিল। জানাজা নামাজ শেষে আমরা একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের করি। কার্জন হল ও হাইকোর্টের সামনে দিয়ে মিছিলটি আবদুল গণি রোডে গিয়ে পৌছে। এ সময় পুলিশ মিছিলের উপর লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে, মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। জনতা আবার সংগঠিত হয়। আমরা পুনরায় মিছিল বের করি। মিছিলটি নাজিমুদ্দীন রোড, চক বাজার, মুগলটুলী, ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী, সদরঘাট ও ভিক্টোরিয়া পার্ক হয়ে জগন্নাথ কলেজের পূর্বগেটে এসে উপস্থিত হয়। এখানে পুলিশ আবার মিছিলকারীদের উপর হামলা চালায়। সেদিন দীর্ঘ পাঁচ মাইল মিছিল নিয়ে অতিক্রম কালে রাস্তার ও রাস্তার পার্শ্বের বাড়ির সর্বস্তরের মানুষ হাত নেড়ে ও ফুল ছিটিয়ে আমাদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। এই দিন (২২শে ফেব্রুয়ারী) হাইকোর্টের পিয়ন শফিকুর রহমান ও রিকসা চালক আবদুস সালাম পুলিশের গুলিতে নিহত হন। মর্ণিং নিউজ পত্রিকা রাষ্ট্রভাষা বাংলার বিরুদ্ধে ছিল, বিক্ষুব্ধ জনতা এই পত্রিকার অফিস জালিয়ে দেয়।

২১ তারিখে যে স্থানে বরকত শহীদ হয়েছিলেন ২২শে ফেব্রুয়ারী আমরা সেখানে একটি শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করি। রাতে পুলিশ এটি ভেঙ্গে ফেলে। এই দিন ছাত্র-হত্যার প্রতিবাদে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন ও আনোয়ারা খাতুন মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন। আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনও ছাত্র-হত্যার প্রতিবাদে আইন সভার সদস্য পদে ইস্তফা দিয়ে একটি অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

মেডিক্যাল কলেজের ২০ নং ব্যারাকে আন্দোলন পরিচালনার জন্য আমরা একটি কন্ট্রোল রুম খুলেছিলাম। ২১ তারিখে গুলিবর্ষণের পর থেকে আমরা ওখানে বসেই আন্দোলনের সমস্ত কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল, সলিমুল্লাহ হল, ফজলুল হক হল, ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ হোস্টেলেও কণ্ট্রোল রুম খোলা হয়েছিল। এসব কণ্ট্রোল রুম থেকে আন্দোলনের কর্মসূচী মাইকে প্রচার করা হত। ২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়েছিল।

২৩শে ফেব্রুয়ারীও রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের ডাকে সাফল্যজনকভাবে হরতাল পালিত হয়েছিল। এদিন শহীদ মিনারটি আমরা পুনর্নির্মাণ করি। বিকেলে আবুল কালাম শামসুদ্দীন এটি উদ্বোধন করেছিলেন। রাতে পুলিশ আবার মিনারটি ভেঙ্গে ফেলে। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করার জন্য ব্যাপক পুলিশী তৎপরতা শুরু হয়। এই তারিখে রাতে আবুল হাশিম, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অজিত কুমার গুহকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল ও অন্যান্য ছাত্রাবাসের কণ্ট্রোল রুম থেকে পুলিশ মাইক কেড়ে নিয়ে যায়।

২৫শে ফেব্রুয়ারী অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পুলিশ ছাত্রদেরকে হল ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সলিমুল্লাহ হলের চারদিক কর্ডন করে তল্লাশী চালায়। হলের হাউস টিউটর অধ্যাপক মফিজুদ্দীন সহ ৪১ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। সামরিক বাহিনী, ই.পি. আর, পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এতকিছুর পরও ২৫শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে সাফল্যজনক-ভাবে হরতাল পালিত হয়, নারায়ণগঞ্জের ভাষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের

উপর নৃশংস অত্যাচার চলে, মর্গান স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মমতাজ বেগমকে পুলিশ গ্রেফতার ও নির্যাতন করে। খান সাহেব ওসমান আলীর বাড়ি পুলিশ তছনছ করে, তাঁকে এবং তাঁর দু'পুত্র শামসুজ্জোহা ও মোস্তফা সারোয়ারকে গ্রেফতার করে। শফি হোসেন ও গোবিন্দনাথ ব্যানার্জী ও গ্রেফতার হন।

পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর ব্যাপক ত্রাস সৃষ্টির ফলে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে গা ঢাকা দিতে হয়েছিল। স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত এক বিশেষ গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে আমাকে সহ খালেক নেওয়াজ খান, শামসুল হক, অলি আহাদ, আবদুল মতিন, সৈয়দ নূরুল আলম, আজিজ আহমদ, আবদুল আউয়াল ও মোহাম্মদ তোয়াহাকে ত্রিশ দিনের মধ্যে স্ব স্ব জেলা প্রশাসকের নিকট হাজির হওয়ার নির্দেশ জারি করে। সরকারের ব্যাপক দমন নীতির ফলে আন্দোলনে ভাটা পড়ে। ৫ই মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্র-ভাষা কর্ম পরিষদ কতৃক আহূত হরতাল ও অন্যান্য কর্মসূচী (জনসভা, শোভাযাত্রা ইত্যাদি), সে রকম কোন সফলতা লাভ করে নি। এই অবস্থায় আমি ৭ই মার্চ (১৯৫২) সন্ধ্যে ৭ টায়, ৮২ নং শান্তিনগরের একটি বাসায় রাষ্ট্র-ভাষা কর্ম-পরিষদের সভা আহ্বান করি। এই সভায় লিয়াজোর দায়িত্বে ছিলেন যুবলীগ কর্মী আনিসুজ্জামান ও হাসান পারভেজ। সভা নির্ধারিত তারিখে নির্দিষ্ট স্থানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভায় আমি সহ অলি আহাদ, মীর্জা গোলাম হাফিজ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন, নজিবুল হক, হেদায়েত হোসেন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। আমাদের সভার কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে, এমন সময় পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে। গ্রেফতার এড়াবার জন্য অলি আহাদ চাকরের পোশাক পরে, মীর্জা গোলাম হাফিজ খাটের নিচে গিয়ে আত্ম গোপন করেন। নজিবুল হক বাসার বাবুর্চির কাজ করতে থাকেন। আমি একটি পুরানো স্টোর ঘরের বাঁশের মাঁচার উপর ওঠে আত্মগোপন করি। পুলিশ সকলকে গ্রেফতার করে, পুলিশের শ্যেণদৃষ্টি আমাকে আবিষ্কার করতে পারে নি, সংবাদদাতার তালিকায় আমার নাম ছিল, হাসান পারভেজ ও আনিসুজ্জামানকে পুলিশ গ্রেফতার করে নি, এর কারণ কি জানি না, সেদিন আমাদের সভাকে Trap করা হয়েছিল। মোহাম্মদ তোয়াহার দীর্ঘ বক্তৃতা এবং একই কথার বারবার পুনরাবৃত্তির জন্য সভা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, তাঁর অপ্রয়োজনীয় অতি দীর্ঘ বক্তৃতাই সেদিনের এ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী।

রাত তিনটের সময় আমি মাঁচা থেকে নেমে ওয়ারীতে আমার এক আত্মীয়ের বাসায় এসে আত্মগোপন করে কিছুদিন কাটাই। সেখান থেকে মোশাররফ হোসেনের সহায়তায় তাঁদের ফরিদপুর জেলার আমিরপুরের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেই। এখানেও আত্মগোপন অবস্থায় ছিলাম। পুলিশ আমাকে খোঁজাখুজি করতে থাকে। দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকাটা আমার পক্ষে ভীষণ অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি, মওলানা ভাসানী ও শামসুল হক জেলা প্রশাসকের কাছে আত্মসমর্পণ করি। দীর্ঘ এক বছর কাল ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ছিলাম। এই সময় ৫ নম্বর ওয়ার্ডে আমার সাথে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আবুল হাশিম, শামসুল হক, আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, খান সাহেব ওসমান আলী, খোন্দকার মোশতাক, আহমাদ অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত গুহ, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, খালেক নেওয়াজ খান, আজিজ আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, শওকত আলী, আলী আহাদ হাশিমুদ্দীন আহমদ, আব্দুল মতিন, ফজলুল করিম, মীর্জা গোলাম হাফিজ, মজিবুল হক ও হেদায়েত হোসেন চৌধুরী। কিছুদিন পরেই মীর্জা গোলাম হাফিজ, মজিবুল হক ও হেদায়েত হোসেন চৌধুরী মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসেন।

ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মিডফোর্ড স্কুল, জগন্নাথ কলেজ ও ঢাকা কলেজের ছাত্ররা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। রেলশ্রমিকরা ভাষা আন্দোলনে অকুণ্ঠ সমর্থন, সহযোগিতা ও প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিল। ভাষা আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের অবদানকে সকলের শীর্ষে স্থান দিতে হয়। সেকালে জনগণের কাছে আওয়ামী লীগ ও ছাত্র মহলে ছাত্রলীগ ছিল সর্বাপেক্ষা গণভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। ২১, ২২, ২৩ ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাংলার যে গণবিস্ফোরণ ঘটেছিল, তার মূলে ছিল আওয়ামীলীগ নেতাদের প্রায় দু'বৎসরের সংগ্রাম ও জনসংযোগের ফসল। তবে প্রগতিশীল বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন নেতা, কর্মীদেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল, বিশেষ করে ছাত্রদের। মওলানা ভাসানী, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, খোন্দকার মোশতাক আহমদ প্রমুখ নেতা ও আমি সহ মুসলিমলীগ সরকারের স্বৈরাচারী শাসন ও দমনীতির বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণকে

সংগঠিত ও আন্দোলনমুখী করে তুলেছিলেন। আওয়ামী লীগের সে সময়ের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক প্রথমে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার বিপক্ষে থাকলেও যখন আমতলার ছাত্র সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেই সিদ্ধান্তকে তিনি অকপটে মেনে নিয়েছিলেন এবং আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আন্দোলনকে সফল করার জন্য শামসুল হক সে সময় যে ত্যাগ, শ্রম ও মেধার পরিচয় দিয়েছেন ইতিহাসে একদিন তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা হবে। তাঁর একজন সহকর্মী হিসেবে আমিও সেদিন এই আন্দোলনকে তাঁর সাথে থেকে সংগঠিত করেছিলাম। যুবলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও কমিউনিস্ট পার্টির ভাষা আন্দোলনে কমবেশী অবদান আছে। যুবলীগের আবেদন সে সময় কেবল ঢাকার কিছু শিক্ষিত যুবকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ও যুবলীগ সেকালে কোন গণভিত্তিক সংগঠন ছিল না। সর্বোপরি সেদিন এদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ব্যাপকভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন— নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই।

এ আন্দোলনের ঐতিহাসিক সফলতাকে আজ কোন দল, মত বা গোষ্ঠীর সফলতা বলে চিহ্নিত করা উচিত নয়। ঐ আন্দোলন ছিল আমাদের সমগ্র জাতির সংগ্রামী ভূমিকার ফসল। এ আন্দোলন সংগঠিত করার পিছনে যাঁরা অবদান রেখেছেন স্বল্প পরিসরে তাঁদের সবার নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। সমগ্র জাতির সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের একজন সৈনিক হিসেবে আমি আজ তাঁদের সবার অসামান্য অবদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

কাজী গোলাম মাহবুব ১৯২৭-এর ২৩ ডিসেম্বর বরিশাল জেলার গৌরনদীর কসবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী আবদুল মজিদ (মাজেদ কাজী) ছিলেন বরিশাল জেলার একজন খ্যাতনামা কৃষক নেতা। কাজী গোলাম মাহবুব স্থানীয় টরকী হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৪২), কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৪৫) ও বি.এ. (১৯৪৭) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এল (১৯৫১) পাশ করেন। তিনি ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি (১৯৪৬-৪৭), ছাত্রলীগ (১৯৪৮) ও আওয়ামী লীগ (১৯৪৯)-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বৃহৎ বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য

(১৯৪৯-১৯৬৮) ছিলেন। ১৯৮০-তে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে যোগদান করেন এবং প্রায় পাঁচ বছর (১৯৮০-১৯৮৬) এ দলের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৩-তে বরিশাল জেলা আদালতে ওকালতি পেশায় নিযুক্ত হন। এখানে প্রায় পাঁচ বছর আইন ব্যবসায় করার পর ১৯৫৮-তে ঢাকা বারে যোগদান করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একজন আইনজীবী। আটচল্লিশ ও বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে তিনি অন্যতম প্রধান নেতা। আটচল্লিশের মার্চের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়ায় গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ হন। বাহান্নর ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় গঠিত "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের" আহ্বায়ক ছিলেন। এ আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করার দরুন প্রায় এক বছর কারানির্যাতন ভোগ করেন।

সুফিয়া আহমেদ

ভাষা অন্দোলনে আমি অংশ গ্রহণ করি, বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভের যোগ্যতা সম্পর্কে আমার বাবার যুক্তি ও মন্তব্যাদি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে। ১৯৪৮-এ বাবা বরিশালের জেলা জজ ছিলেন। এসময় আমি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আই.এ. ক্লাশে পড়ি। এই সময়ে দেশে ব্যাপকভাবে ভাষা বিতর্ক শুরু হয়। বাংলা ভাষা কি কি কারণে রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত এবং বাংলা রাষ্ট্র-ভাষা না হলে এদেশের মানুষের কি কি অসুবিধা হতে পারে সে সম্পর্কে বাবা তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের চিঠিপত্র লিখে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। কংগ্রেস দলীয় গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিষদের অধিবেশনে গণপরিষদের ভাষারূপে ইংরেজী ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে স্থান দেয়ার প্রস্তাব করেন। তাঁর এই প্রস্তাব লিয়াকত আলী খান, খাজা নাজিমুদ্দীন প্রমুখের বিরোধিতার মুখে বাতিল হয়ে যায়। পূর্ববাংলায় এর ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। মাতৃভাষা বাংলা গণপরিষদের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি না পাওয়ায় বাবা ব্যথিত হন। তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে চিঠিপত্র লিখে এবং আলোচনার মাধ্যমে তাঁর মানসিক যন্ত্রণা লাঘব করেন। এ-সব চিঠিতে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অগাধ মমত্ববোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হতো। বাবা তাঁর বন্ধুদের লিখেছিলেন, পাকিস্তান একটি ফেডারেল রাষ্ট্র—পূর্ববঙ্গ হচ্ছে দেশের বৃহৎ ফেডারেশন ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বাসস্থান। তাদের মাতৃভাষা বাংলা। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষাই দেশের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। বাবা আরো মনে করতেন, পাকিস্তান ফেডারেলের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে পূর্ববাংলার নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিপুষ্টি ও বিকাশসাধনের স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। বাবা সাধারণতঃ তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের খসড়া আমাকে দিয়ে তৈরি করাতেন। একাজের ভেতর দিয়ে অজান্তেই বাংলা ভাষার প্রতি আমার আগ্রহ ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। বাবার মতো আমিও বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবীর প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করি।

১৯৪৮-এর ২১শে মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এবং পরের দিন ২২ তারিখে কার্জন হলে সমাবর্তন সভায় মুহম্মদ আলী জিন্নাহর বক্তৃতার রাষ্ট্র-ভাষা সম্পর্কিত অংশ পত্রিকায় পাঠ করে আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয়। পত্রিকায় রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য লেখা হয়েছিলো, "উর্দু, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" তাঁর এই বক্তব্য পাঠ করে আমি মর্মাহত হই। আমার মনে হলো, এ-উক্তির ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর নিজের বা গোষ্ঠী বিশেষের ইচ্ছাকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ওপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন। বাংলা ভাষার দাবীকে তিনি একেবারেই উপেক্ষা করেছেন। এটা জিন্নাহর অগণতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচায়ক। তিনি জোর করে একটি কৃত্রিম ভাষা, যে ভাষা পাকিস্তানের কোন প্রদেশের মানুষের মাতৃভাষা নয়, যে ভাষা দেশের কিছু সংখ্যক উচ্চবিত্ত ও অভিজাত মানুষের সংস্কৃতি চর্চার বাহন মাত্র, তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত উপেক্ষা করে রাষ্ট্রভাষা করতে চান। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের কাছে মনে হয়েছিলো তিনি যেন শক্তিবলে জনমতকে অগ্রাহ্য করে নিজের খেয়ালখুশী মতো উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে জাতিকে গ্রহণ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। দেশের সংখ্যা-গরিষ্ঠ জনগণ এরূপ পক্ষপাতমূলক ও স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারে নি। বক্তৃতার রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত অংশের শব্দ যোজনার ভঙ্গিটিই পূর্ববঙ্গবাসীকে প্রতিবাদমুখর হওয়ার পথ করে দেয়। সঙ্গতকারণেই কার্জন হলের সমাবর্তন সভায় উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী এ বক্তৃতার প্রতিবাদ জানায়। ঐ সভায় আমি উপস্থিত থাকলে আমার মানসিকতাও প্রতিবাদীদের মতো হতো।

১৯৪৮-এর মার্চের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সময়ে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে সরকার কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে নি। ফলে, রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে না বাংলা হবে এসম্পর্কে এদেশের মানুষকে নানান বিভ্রান্তি ও দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাতে হয়।

১৯৫২-র ২৭শে জানুয়ারী পল্টন ময়দানে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধান-মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আবার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রাখেন। তাঁর ভাষণে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়। এতদিন বাংলা রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি না পাওয়ার জন্য মানুষের মনে যে বিক্ষোভ জমাট

বেঁধেছিলো নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতার পর পরই তা প্রচণ্ড দাবানলের মতো জ্বলে ওঠে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রতিবাদমুখর হয়ে রাস্তায় নামে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'—এই শ্লোগানে চারিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। ছাত্রবিক্ষোভ আমাকেও আলোড়িত করে। এ সময় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষ অনার্সের ছাত্রী। বাবা ঢাকা হাই কোর্টের জজ।

আন্দোলনকে সাংগঠনিক রূপ দেয়ার জন্য 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' গঠিত হয়। কর্মপরিষদের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিলো। এদের মধ্যে অনেকেই আমাকে প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে অংশ নেয়ার আহ্বান জানান। বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করুক ১৯৪৮ সাল থেকেই আমি এ দাবীর সমর্থক। তাই আমি এই আহ্বানে সানন্দে এগিয়ে আসি। রাষ্ট্রভাষা কেন বাংলা চাই এসম্পর্কে আমার চিন্তা-ভাবনা আগে থেকেই পরিষ্কার ছিলো। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাওয়ার পক্ষে আমার অন্যতম প্রধান যুক্তি ছিলো: বৃটিশ রাজত্বের প্রথম শতকে ভারতীয় মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করায় তারা শিক্ষা-দীক্ষায়, চাকরি-বাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুদের তুলনায় প্রায় পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে আছে। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে অনুরূপভাবে পাকিস্তানের কাঠামোয় পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা অবাঙালী পাকিস্তানীদের তুলনায় বেশ কিছুটা পেছনে পড়ে যাবে। উর্দু পূর্ববঙ্গবাসীদের অপরিচিত ভাষা। শতকরা ৯৯ জন এ ভাষা পড়তে ও লিখতে পারে না, তা শিখতে এদেশের মানুষের বহুদিন সময় লাগবে। মধ্যবর্তী সময়ে সব-ক্ষেত্রে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হবে। এর সুযোগ গ্রহণ করবে উর্দুভাষী অবাঙালীরা। তারা অফিস-আদালতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং ব্যবসায় ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে জাঁকিয়ে বসবে। ফলে, বাঙালীরা সবক্ষেত্রে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে। উর্দু একক রাষ্ট্রভাষা হলে তা হবে বাঙালীদের জন্য আত্মঘাতী পদক্ষেপ। কাজেই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যকে মেনে নিতে আমার মন সায় দেয় নি। নিজের মাতৃভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি আন্দোলনে অংশ নেয়াই শ্রেয় বলে মনে করি।

রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) প্রদেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল আহ্বান করে। দু'সপ্তাহেরও আগে থেকে চলল হরতাল পালনের প্রস্তুতি। শামসুন নাহার, শাফিয়া খাতুন, রওশনআরা বাচ্চু ও আমি ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদেরকে ২১শে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচীর পক্ষে সংগঠিত করার জন্য কাজে নামি। সর্বত্রই আমরা ব্যাপক সাড়া পাই। হরতালের কর্মসূচী যে সর্বাত্মকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হবে সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হয়ে উঠি। সরকার আন্দোলনের পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন আঁচ করতে পেরে ২০শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারী করে।

২১ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে আমতলায় এক বিশাল ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। আমি সভায় অংশগ্রহণ করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন কলেজ ও বিভিন্ন স্কুলের বহু ছাত্রী সভায় উপস্থিত ছিলো। ১৪৪ ধারা অমান্য করা হবে কি-না এ নিয়ে সভায় তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। সভা কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না তাদের পরবর্তী কর্মসূচী কি হবে। এক পর্যায়ে আমরা ছাত্রীরা সভা ত্যাগ করে কলাভবনে আমাদের কমন-রুমে গিয়ে বসি। বহু তর্কবিতর্কের পর সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ৫ জনের খণ্ড খণ্ড মিছিল বের করে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা হবে। আমাদেরকে কমনরুম থেকে খবর দিয়ে আনা হলো। আমরা মিছিলে যাবার প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। প্রথমে ছাত্রদের ২/৩টি দল রাস্তায় নামে। এরপরই ছাত্রীদের প্রথম দলটি রাস্তায় বের হয়। এই দলে আমি, শাফিয়া খাতুন, রওশনআরা বাচ্চু, শামসুন নাহার এবং ইডেন কলেজের একজন ছাত্রী (নাম জানা নেই)—এ পাঁচজন অংশ নেই। আমাদের মিছিলে শামসুন নাহারের অংশগ্রহণ করাটাই অপ্রত্যাশিত ঘটনা। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাসের ছাত্রী। আমার সহপাঠিনী। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের প্রাক্তন স্পীকার আবদুল ওহাব তার পিতা। শামসুন নাহারের পোশাক-পরিচ্ছদ ও চালচলনের মধ্যে সবসময়ই একটি রক্ষণশীলভাব প্রকাশ পেতো। সে বোরখা পরতো। মিছিলেও সে বোরখা পরেই অংশ নেয়। মেধাবী ছাত্রী শামসুন নাহার অধিকাংশ সময়ই পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। এরূপ পর্দানশীন ও রক্ষণশীল মানসিকতার অধিকারিনী শামসুন নাহারও সেদিন বাঙালীর জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার কারণে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়।

ছাত্রদের মিছিল অনুসরণ করে আমরা ছাত্রীরা পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ (বর্তমানে জগন্নাথ হল মিলনায়তন)-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। রাস্তায় অসংখ্য পুলিশ। মাঝে মাঝে রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়া হয়েছে। কিছুটা এগুবার পরেই সিটি এস. পি. মাসুদ মাহমুদের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি আমার পূর্ব পরিচিত। আমাদের বাড়িতে তিনি প্রায়ই আসা-যাওয়া করেন। তিনি আমাকে মিছিলে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "প্রসেশনে আসাটা তোমার ভুল হয়েছে। সরকার আমাদেরকে বিক্ষোভকারীদের কঠোর হস্তে দমন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি বাসায় চলে যাও। তা-না হলে তোমারও বিপদ হতে পারে।" এস.পি-র কথায় আমি কর্ণপাত করলাম না। মনে মনে বললাম "তিনি সরকারী কর্মচারী, সরকারী নির্দেশ পালনের জন্য এখানে এসেছেন, আমি এসেছি আন্দোলনে—আমার মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে।" এস.পি-র কথা শেষ হওয়ার পর একটু সামনের দিকে এগুচ্ছি—এমন সময় পুলিশ মিছিলের ওপর প্রচণ্ডভাবে লাঠিচার্জ ও ব্যাপকভাবে টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। টিয়ারগ্যাসের কালো ধূঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। মিছিল-কারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। টিয়ারগ্যাসের ঝাঁঝে আমার চোখে ভীষণভাবে জ্বালাপোড়া শুরু হয়। চোখ লাল হয়ে অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। চোখ দিয়ে শুধু পানি ঝরতে থাকে। অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করি। কোন রকমে হাঁটতে হাঁটতে এস. এম. হলের প্রভোস্টের বাড়ীর সামনের মাঠে আশ্রয় নেই। সেখানে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে চোখ-মুখ ধুই। চোখের যন্ত্রণা আস্তে আস্তে কমে আসে। ঘণ্টাখানেক পর সুস্থ হয়ে উঠি। এস. এম. হল থেকে মেডিক্যাল কলেজের দিকে যাত্রা করি। রাস্তায় পা ফেলেই দেখি চারদিক শুধু মানুষ আর মানুষ। রাস্তায়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ছাদে মানুষ ভর্তি। যেন মানুষের ঢল নেমেছে। আমাদের ওপর পুলিশের নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। বিক্ষুব্ধ জনতা প্রবলভাবে পুলিশের দিকে ঢিল ছুঁড়ছে। ছাত্র-জনতা আর পুলিশের সংঘর্ষ তীব্র হয়ে ওঠে। পুলিশ মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের দিকে গুলী চালায়। গুলীতে বরকত শহীদ হন।

বিকেলে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের অধিবেশন বসে। কয়েকজন পরিষদ সদস্য ছাত্র-হত্যা ও পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে পরিষদে বক্তৃতা দেন।

পরিষদ সদস্যা আনোয়ারা খাতুন তাঁর বক্তৃতায় মহিলাদের ওপর পুলিশের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি আমার বাবার পরিচয়সহ আমার নাম উল্লেখ করে পুলিশের তৎপরতায় আমার নির্যাতন ভোগের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। এতে আমার আন্দোলনে অংশ গ্রহণের কথা ব্যাপক প্রচার লাভ করে। আমার ওপর পুলিশের নির্যাতনের কথা দুপুরেই আমাদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছেছিলো। আমার আত্মীয়-স্বজন এজন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সন্ধ্যার দিকে মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে আমি বাড়িতে যাই। মা ও বাবা আমাকে দেখে খুব উৎফুল্ল হলেন। আমি মিছিলে অংশ নেয়াতে বাবা সেদিন একটুও রাগ করেন নি। তিনি আমার এই মহান অংশগ্রহণ করায় খুশীই হয়েছিলেন।

পরের দিন আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই। আন্দোলনের নেতাদের সাথে দেখা হলো। তাঁরা আমাকে বললেন, "আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। আপনাদের মেয়েদেরকে শহরের মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে চাঁদা তুলতে হবে।" একাজেও রাজী হলাম। দল বেঁধে একেক দিন ঢাকায় একেক এলাকায় ঘরে ঘরে চাঁদা সংগ্রহের জন্য যাই। যে বাসায়ই যাই, সেই বাসারই গৃহকর্ত্রী আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে কম-বেশী টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন, কেউ-ই আমাদেরকে নিরাশ করেন নি। দিতে না পারার অক্ষমতা প্রকাশ করেন নি। ভাষা আন্দোলনের প্রতি মানুষের সেদিন কত ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছিলো চাঁদা সংগ্রহের ঘটনাটি থেকে তা সহজে বুঝা যায়। সেদিন শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক, মুটে-মজুর, আইনজীবী-বুদ্ধিজীবী সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতির দাবীতে একতাবদ্ধ হয়। দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'—এ দাবীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। এই জাতীয় ঐক্যই ভাষা আন্দোলনকে সফলতা দিয়েছে।

সরকার গোড়া থেকেই ভাষা আন্দোলনকারীদের কমিউনিস্ট, বিদেশী চর, দুষ্কৃতিকারী, পঞ্চম বাহিনী ইত্যাদি কু-বিশেষণে আখ্যায়িত করতো। এছাড়া সরকার ভাষা আন্দোলনকে ইসলাম ও পাকিস্তানের সংহতিবিরোধী কাজ বলে প্রচার করে। এ-সব অপপ্রচার জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারে নি। বরঞ্চ সরকার এতসব অবাঞ্ছিত কথা বলায় জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে আরো বেশী বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। জনগণ তার ভাষার দাবীকে রাজপথে নেমে

সবকারকে জানাতে পারবে না, সবকারের কাছ থেকে এধরনের স্বৈরাচারী আচরণ তারা প্রত্যাশা করতে পারে নি। ১৪৪ ধারা জারী করে মত প্রকাশের অধিকার সরকার কেড়ে নিতে উদ্যত হয়। এ-সব কারণে সেদিন মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা আইনের শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলে রাজপথে নেমে আসে এবং জয়-যুক্ত হয়।

বাহান্নতে ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছি নিজের বিবেকের তাড়নায়—মাতৃভাষার মর্যাদা ও বাঙালী জাতির স্বকীয়তা ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে। এই আন্দোলনে আমি যে সাড়া দিতে পেরেছিলাম এবং সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম সেজন্য আমি গর্বিত।

সুফিয়া আহমেদ ১৯৩২-এর ২০শে নভেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার বিষ্ণুপুর গ্রাম। বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম তাঁর পিতা এবং ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ তাঁর স্বামী। ছাত্রজীবনে তিনি পরিচিত ছিলেন সুফিয়া ইব্রাহিম নামে। ঢাকার সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স স্কুল, বরিশাল বালিকা বিদ্যালয় ও দার্জিলিং ডাউ হিল স্কুলে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৪৮-এ প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক, ১৯৫০-এ বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে সম্মিলিত মেধাতালিকায় অষ্টম স্থান অধিকার করে প্রথম বিভাগে আই.এ, ১৯৫৩-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. অনার্স (ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি), উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪-তে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০-এ আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬১-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ১৯৭৫-এ সহযোগী অধ্যাপক ও ১৯৮১-তে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও তুরস্কের আধুনিক ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির একজন দক্ষ গবেষক। ১৯৮১-র মার্চে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত চতুর্দশ ইতিহাস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্মী। এই আন্দোলনের পক্ষে ঢাকার ছাত্রীদের সংগঠিত করার ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। "Muslim Community in Bengal" তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ।

সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেইন (শহুদ)

বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় আমি ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. শেষ পর্বের ছাত্র। থাকতাম সলিমুল্লাহ হলে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অনেক ঘটনা ঘটেছে, অনেক সভা-সমিতি হয়েছে, বের হয়েছে অনেক মিছিল। এক ব্যক্তির পক্ষে এর সবগুলোতে উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কেউ যদি এ-অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার চেষ্টা করেন তাহলে তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে একালের গণমানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবেন—একথা অনায়াসেই বলা যায়। আমার পক্ষে ভাষা আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব নয়। এ আন্দোলনের সব ঘটনা, সব মিছিল ও মিটিং-এর সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম না। ভাষা আন্দোলনে আমি শুধু নিজে যেসব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম তা তুলে ধরার চেষ্টা করবো। সেই সঙ্গে দেশের তৎ-কালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেবো।

কোন আন্দোলনই হঠাৎ হয় না। এর পেছনে থাকে নানান ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, জনগণের মন ও মানসিকতা এবং সামাজিক চেতনা। ভাষা আন্দোলনের একটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আছে। আছে এ আন্দোলনের একটি ধারাবাহিকতা। ধীরে ধীরে এ আন্দোলন তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে এগিয়ে গেছে।

চল্লিশের দশকে এদেশের মানুষ 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' শ্লোগান দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। তারা আশা করে-ছিলো পাকিস্তান কায়েম হলে তাদের জীবনে সুখ-শান্তি আসবে এবং তাদের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা হবে। জনগণের অদম্য ইচ্ছার ফলে ১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো। জনগণ শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত কিছুই পেলো না। কিছুকাল পরেই পাকিস্তানের প্রতি এদেশের মানুষের মোহ ভেঙ্গে যায়। আমার বৃদ্ধ বাবাকে দেখেছি সাতচল্লিশের চৌদ্দই আগস্ট 'পাকিস্তান জিন্দবাদ' বলে কি বলিষ্ঠ কণ্ঠে শ্লোগান দিতে। মাত্র এক বছর পরেই পাকিস্তানের প্রতি তাঁর একটি নির্লিপ্ত মনোভাব

লক্ষ্য করেছি। অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মানুষ হবেও তিনি মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সরকারের কথা ও কাজের অসঙ্গতি তাঁর বুঝতে বেশী দিন সময় লাগে নি। এদেশের মানুষ এতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছিলো যে, পাকিস্তান সবার জন্য নয়। একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে পাকিস্তান অর্জিত হয়েছে। তারা একথাও বুঝতে পেরেছিলো যে, 'সাধের স্বপ্ন পাকিস্তান' তাদেরকে সামান্যতম রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আর্থিক সচ্ছলতা দিতে পারছে না। শুধু একদল শাসক-শোষকের বদলে আর এক দল শাসক-শোষক তাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসেছে মাত্র। এ দু'দল একই শ্রেণীর — শুধু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। তৎ-কালীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে দু'টি উপশ্রেণীতে বা দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হলো পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী—যাকে আমরা সাধারণতঃ পাঞ্জাবীগোষ্ঠী বলেই আখ্যায়িত করতাম। এ গোষ্ঠীতে পাঞ্জাবীদের প্রাধান্য ছিলো। দেশের ধনিক শ্রেণী, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক আমলারা তাদের প্রধান সহযোগী ছিলো। এই পাঞ্জাবীগোষ্ঠীই ছিলো পাকিস্তানের আসল শাসক। তাদের তাবেদারী করতো দ্বিতীয় গোষ্ঠীটি— যারা ছিলো পূর্ব পাকিস্তানের শাসক। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এ গোষ্ঠীর সামান্যতম স্বাধীনতা ছিলো কি-না সে সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ ছিলো। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের উচ্চশিক্ষালাভের জন্য বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারটির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠীই গ্রহণ করতো। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষার কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ও মেধাবী ছাত্র বৃত্তি নিয়ে বিদেশে পড়াশুনা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আমার নিজের ব্যাপারেই এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। সরকারের পক্ষ থেকে আমি কানাডায় উচ্চ শিক্ষা লাভের বৃত্তির চিঠি পেয়েছিলাম। সে চিঠিতে আমার প্রতি কানাডায় যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ ছিলো। শেষাবধি আর কোন নির্দেশ না পেয়ে যখন শিক্ষা দফতরে প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধান করতে গেলাম, তখন একজন কর্মকর্তা আমাকে শুধু এটুকু বলেছিলেন যে, রাজ-নৈতিক কার্যকলাপের জন্য কানাডা সরকার আপনাকে তাদের দেশে যেতে বারণ করেছেন। এমন একটি নির্লজ্জ মিথ্যাকথা শুনে আমাকে শিক্ষা দফতর থেকে ফিরে আসতে হয়। রাজনৈতিক ব্যাপার আর কিছুই নয়—

ভাষা আন্দোলনে সামান্য একজন কর্মী হিসেবে কাজ করাই ছিলো আমার অপরাধ। আমার বদলে একজন পশ্চিম পাকিস্তানীকে কানাডায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগদানের জন্যই আমার বৃত্তি বাতিল করে দেয়া হয়েছিলো।

পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানের একচ্ছত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করে। জনসাধারণকে শোষণ আর শাসন করাই ছিলো তাদের প্রধান লক্ষ্য। সামরিক বাহিনীর অস্ত্র আর শিল্পপতিদের অর্থে পুষ্ট পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠী নিজেদের শ্রেণী স্বার্থকে সংরক্ষিত করার আশায় যে নীলনকশা প্রণয়ন করেছিলো, তা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই তারা উদ্যোগী হয়েছিলো। এ দেশের (পূর্ব বাংলার) মানুষের মুখের ভাষাকে কেড়ে নেয়ার জন্যে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, এই জনপদের মানুষের মাতৃভাষাকে কেড়ে নিতে পারলেই বাঙালী জাতিকে মেরুদণ্ডহীন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা যাবে। পূর্ববঙ্গকে তাদের শোষণের ক্ষেত্র বা উপনিবেশে পরিণত করাই ছিলো তাদের মূল লক্ষ্য। শাসক শ্রেণীর এ হীন ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলায় নতুন নতুন সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনের জন্ম হয়। তমদ্দুন মজলিশ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ ইত্যাদি সংগঠন ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্বে গঠিত হয়েছিলো। সরকার বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে এসব দল বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের পটভূমি সৃষ্টি করেছিলো। ভাষা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টিরও সক্রিয় ভূমিকা ছিলো। তাদের পক্ষে এ আন্দোলনে খোলাখুলিভাবে কাজ করা সম্ভব হয়ে উঠে নি। সে সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিলো। কমিউনিস্ট কর্মীদের উপর ব্যাপক সরকারী নির্যাতন নেমে এসেছিলো। তাদের দেখলেই পুলিশ গ্রেফতার করতো। তাই, কমিউনিস্ট পার্টি খোলাখুলিভাবে কোন সভা ও মিছিল না করে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে ইস্তেহার প্রকাশ করে। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি ইস্তেহার প্রচারপত্রের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়। এসব ইস্তেহার থেকে বোঝা যায় যে, ভাষা আন্দোলনের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির একাত্মতা ছিলো। প্রসঙ্গক্রমে বাহান্নর ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা সম্পর্কে আমি এখানে দু'একটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি। এ আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতে পারেন নি। এ

সময়ে তিনি জেলে ছিলেন। তবে আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিলো। আন্দোলনের সমর্থনে তিনি জেলখানায় অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় তাঁর পক্ষে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করার আর কোন উপায় ছিলো না বলেই আমার মনে হয়।

বামপন্থী ছাত্র রাজনীতিতে আমি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলাম। অলি আহাদ, কে. জি. মোস্তফা, হাসান হাফিজুর রহমান, হাবীবুর রহমান শেলী, এম. আর. আখতার মুকুল, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, আলাউদ্দিন আল আজাদ, এ. জেড. ওবায়দুল্লাহ খান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আবদুল মতিন, ফয়েজ আহমদ, মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, এস. এ. বারী এটি প্রমুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র-রাজনীতির সাথী ছিলেন। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল ছাত্রগোষ্ঠী হিসেবেই আমরা পরিচিত ছিলাম। মুসলিম লীগ ও সরকার বিরোধী বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমরা অংশ গ্রহণ করেছিলাম। ফ্যাসীবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ও কার্য-কলাপের বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার ছিলাম। আমাদের আলোচনা সভা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবকিছুই আমরা কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশ অনুসারে সম্পন্ন করতাম। অনেক প্রগতিশীল লেখক, সাংবাদিক ও শিল্পীদের সাথে আমাদের যোগাযোগ ছিলো। ১৯৫১-তে সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদের নির্বাচনে আমাদের দলের প্রার্থী হাবীবুর রহমান শেলী ভি.পি, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী জি.এস. ও ওবায়দুল্লাহ খান এ. জি. এস পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫১-র ২৭শে মার্চ আমাদের ছাত্র দলটিই যুব লীগ গঠন করে।

পূর্ববাংলায় ভাষা আন্দোলন প্রথম শুরু হয় ১৯৪৮-এর মার্চ মাসে। করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে গণপরিষদের কংগ্রেস দলীয় পূর্ববঙ্গের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে ইংরেজী ও উর্দুর পাশাপাশি গণপরিষদের ভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের বিরোধিতার মুখে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। পূর্ব বাংলায় এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতির দাবীতে ঢাকায় গঠিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। ১১ই মার্চ সংগ্রাম পরিষদের আহবানে সারা পূর্ববাংলায় হরতাল পালিত হয়। আন্দোলনের তীব্রতা অনুভব করে

সরকার সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। এই চুক্তিতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পূর্ববঙ্গ আইন সভার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পেশের বিধান ছিলো। ২১শে মার্চ (১৯৪৮) রেস-কোর্স ময়দানে এক জনসভায় ও পরের দিন ২২ তারিখে কার্জন হলের সমাবর্তন সভায় জিন্নাহ সাহেব তাঁর বক্তৃতায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। উভয় স্থানেই তাঁর বক্তৃতার প্রতিবাদ হয়েছিলো। এরপর সরকার রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আর কোন বক্তব্য রাখে নি। ৪৯, ৫০ ও ৫১-তে ভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় তেমন কোন উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটে নি। আলোচনা সভা, বিবৃতি দান, ১১ই মার্চ ভাষা দিবস পালন ইত্যাদির মধ্যে ভাষা আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিলো। এসময়ে বিরোধী রাজনৈতিক দল, ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলোর কর্মতৎ-পরতা প্রধানতঃ মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধেই সংঘটিত হয়েছিলো। ভাষা আন্দোলনকে সক্রিয় করে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিলো একটি উত্তেজনাকর ঘটনা। প্রয়োজন ছিলো স্তূপীকৃত বারুদে আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার একটি উপকরণ। এ কাজটি করেছিলেন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন! বাহান্নর জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে ঢাকার পল্টন ময়দানে এক বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। এই বক্তৃতার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব বাংলায় আগুন জ্বলে উঠলো—শুরু হলো ছাত্র-ধর্মঘট, প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ মিছিল ও স্ট্রীট কর্ণার মিছিল।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতির দাবীতে ৩০শে জানুয়ারী (১৯৫২) ঢাকায় ছাত্র-ধর্মঘট, মিছিল ও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্র-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা থেকেই ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। এই দিনই 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ' গঠিত হয়। এর আহ্বায়ক হন কাজী গোলাম মাহবুব। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবার পূর্ণধর্মঘট পালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গাজীউল হক। সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য তাঁর নাম প্রস্তাব করেন এম. আর. আখতার মুকুল। প্রস্তাবটি সমর্থন করেছিলাম আমি। সভায় জনৈক বক্তা, তার বক্তৃতায় একুশ তারিখের হরতাল পালিত 'হবে কি-না' বলে একটু সংশয়

প্রকাশ করেছিলেন। সভায় সমবেত ছাত্র-ছাত্রীরা 'হবে কি-না' কথাটির জোর প্রতিবাদ জানিয়েছিলো। এ থেকে বোঝা যায় ছাত্রসমাজ একুশের আন্দোলনের প্রতি কত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলো। ৩০শে জানুয়ারী ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচী 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির' নেতৃত্বে পালিত হয়েছিলো।

২০শে ফেব্রুয়ারী আমরা মধুর কেন্টিনে এক ছাত্র-সভায়, পরের দিনের (২১ তারিখের) কর্মসূচী বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করার সময় শুনতে পাই যে, সরকার ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারী করেছে। এতে ছাত্রদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ছাত্র সংসদের নেতৃবৃন্দ আলোচনা সভায় বসেন। তাঁরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় নবাবপুর রোডে আওয়ামী লীগ অফিসে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমি সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলাম না। ভাষা আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে কর্ম পরিষদের সিদ্ধান্ত জানার জন্য আমি সেদিন আওয়ামী লীগ অফিসে গিয়েছিলাম। মধ্যরাতে সভার কাজ শেষ হলে কর্ম পরিষদের অন্যতম প্রধান সদস্য অলি আহাদ আমাদেরকে সভার সিদ্ধান্ত অবগত করান। তাঁর থেকে আমরা জানতে পারলাম, সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা হবে কি হবে না---এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিলো। অলি আহাদ (সম্পাদক, যুবলীগ), আবদুল মতিন (আহবায়ক, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি), মোহাম্মদ তোয়াহা (সভাপতি, যুবলীগ), গোলাম মাওলা (সহ-সভাপতি, মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রসংসদ), শামসুল আলম (সহ-সভাপতি, ফজলুল হক হল, ছাত্র-সংসদ), ইব্রাহিম তাহা (সভাপতি, ইসলামিক-ব্রাদারহুড) ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন। সভায় অন্যান্য নেতৃবর্গ ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার পক্ষে বক্তব্য পেশ করেছিলেন। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা হলে দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে এবং এর সুযোগ নিয়ে সরকার প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচন বন্ধ করে দিবে এ—যুক্তি দেখিয়ে তাঁরা সেদিন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার বিরোধিতা করেছিলেন। সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিলো। আমি ছিলাম অলি আহাদ ও আবদুল

মতিনের মতানুসারী—১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষের কর্মী। ভোটে হেরে গিয়েছিলাম বলে আমরা সেদিন নিরাশ হয়ে পড়ি নি। সংগ্রামের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রত্যয় নিয়ে আমরা সে-রাতে আওয়ামী লীগ অফিস থেকে হলে ফিরে আসি। গভীর রাতে আমরা ফজলুল হক হলের পুকুর ঘাটে এক আলোচনা সভায় বসি। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এটি একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই সভায় হাবীবুর রহমান শেলী, গাজীউল হক, মোহাম্মদ সুলতান, জিল্লুর রহমান, আবদুল মোমিন, এস.এ বারি এটি, এম. আর আখতার মুকুল, আনোয়ারুল হক খান, কে. জি. মোস্তফা এবং আমিসহ আরো কয়েকজন ছাত্রনেতা উপস্থিত ছিলাম। এই সভায় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ও ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারী বেলা আনুমানিক ১১টার সময় গাজীউল হককে সভাপতি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় আমরা পূর্ব নির্ধারিত ছাত্র-সভার কাজ শুরু করে দিলাম। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের পক্ষ থেকে কাজী গোলাম মাহবুব (সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহবায়ক)-কে এ সভার সভাপতি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো। গোলাম মাহবুব ছিলেন ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার দলের নেতা। তিনি সভায় সভাপতিত্ব করলে তাঁর মতের পক্ষে অর্থাৎ ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার অনুকূলে সভাকে পরিচালিত করতে পারেন, এ আশঙ্কায় এম. আর. আখতার মুকুলের প্রস্তাবে এবং আমার সমর্থনে গাজীউল হককে সভাপতি করে তাদের (ছাত্রলীগ নেতাদের) আগেই আমরা সভার কাজ আরম্ভ করে দেই। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে সভায় প্রথম বক্তৃতা দেন শামসুল হক (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ)। তিনি ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। উত্তেজিত ছাত্ররা কয়েকবার চীৎকার করে তাঁর বক্তৃতায় বাধা দেয়। হৈ-চৈ-এর মধ্যে শামসুল হকের কথা কয়েক বারই চাপা পড়ে গিয়েছিলো। এ সময়ে সভাস্থলে একটি সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদটি হলো— আমতলাগামী একটি ছাত্র মিছিলের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। এই উড়ো খবর শুনে সভার উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়, '১৪৪ ধারা মানি না,' 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি শ্লোগানে সভাস্থল মুখরিত হয়ে ওঠে। কাজী গোলাম মাহবুব ও খালেক নেওয়াজ খান (সাধারণ

সম্পাদক, পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ) সভায় ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। এ নিয়ে খালেক নেওয়াজ খানের সাথে আমার সভাস্থলের এক পাশে বেশ কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে আমি তার হাত ধরে তাকে মিটিংএর স্থান থেকে একটু দূরে নিয়ে যাই। এতে আমার স্কুল ও কলেজ জীবনের বন্ধু ও হোস্টেলের রুমমেট খালেক নেওয়াজ আমার উপর রেগে গিয়ে আমাকে বললো, "তুই আমাকে মারবি না-কি ?" আমি তার কথার উত্তর দিলাম, "দোস্ত, তোকে আমি মারবো না। নির্বাচনে তুই এ্যাসেমব্লীর মেম্বার ও দেশের মন্ত্রী হলে আমিই সবচেয়ে বেশী খুশী হবো। কিন্তু, এখন তুই ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার ব্যাপারে আর বাধা দিস না।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে আবদুল মতিন সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। গাজীউল হক তাঁর সভাপতির ভাষণে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে সভার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সভার শ্রোতৃমণ্ডলী এই ঘোষণাটি শুনার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষায় ছিলো। সভার সিদ্ধান্ত শুনা মাত্রই শ্রোতারা '১৪৪ ধারা মানি না—মানি না' ও 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে চারদিক কাঁপিয়ে তোলে। আবদুল মতিনের প্রস্তাব অনুসারে সভায় দশজন দশজন করে মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আন্দোলনের একটি কৌশল হিসাবে দশজনী মিছিলের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিলো। একসাথে সবাই মিছিল করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লে পুলিশ লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ বা গুলী করে এক ধাক্কাতেই মিছিলকারীদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিতো। দশজনী মিছিলের প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর সভার সকল বিতর্কের অবসান হলো। যাঁরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার বিপক্ষে ছিলেন তারাও বিক্ষুব্ধ ও সংগ্রামী ছাত্রদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে আন্দোলনে যোগ দেন। আমরা মিছিল বের করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মোয়াজ্জেম হোসেন প্রোক্টর মুজাফফর আহমদ চৌধুরী ও কয়েকজন শিক্ষকসহ সভাস্থলে এসে আমাদেরকে মিছিল বের না করার জন্য বোঝাতে থাকেন। তাঁদের উপদেশ আমাদের কাছে কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারলো না। শুরু হলো দশজনী মিছিল। যারা মিছিলে অংশ নিচ্ছে তাদের নাম ঠিকানা লিখে রাখার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিলো মোহাম্মদ সুলতানের উপর। কারো কোন দুর্ঘটনা ঘটলে যাতে নাম ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায় সেজন্যই এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিলো।

হাবিবুর রহমান শেলীর নেতৃত্বে প্রথম দশজনী মিছিলটি রাস্তায় বের হয়ে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ (বর্তমান জগন্নাথ হল অডিটরিয়াম) এর দিকে এগিয়ে যায়। এরপর ইব্রাহিম তাহা, আবদুস সামাদ আজাদ, আনোয়ারুল হক, ও আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খানের নেতৃত্বে এক একটি করে মিছিল রাস্তায় বেরোয়। সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা পড়ে যায় কে কার আগে মিছিলে যাবে। সাফিয়া খাতুন, সুফিয়া ইব্রাহিম, রওশন আরা বাচ্চু ও শামসুন নাহারের সমবায়ে মেয়েদের প্রথম মিছিলটি রাস্তায় নামে। এর খানিকক্ষণ পরেই আমতলায় খবর আসে----ছাত্রীদের মিছিলের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করেছে। পুলিশের লাঠির আঘাতে রওশন আরা বাচ্চু আহত হয়েছে। এ খবর ছড়িয়ে পড়ায় আমতলায় সমবেত ছাত্রদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শ্লোগানে শ্লোগানে আমতলা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদেরকে আর আমতলায় ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে উদ্যত হয়। এ সময় পুলিশ আমতলায় টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। চারদিক কালো ধুয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমতলায় কোথায়ও তিল ধারণের জায়গা ছিলো না। শত শত ছাত্র টিয়ার গ্যাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পুকুর থেকে রুমাল ভিজিয়ে চোখ-মুখ মুছতে থাকে। ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু হয়ে যায়। দুপুরের পরে আমতলা থেকে ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের মাঝখানের দেয়াল ভেঙ্গে মেডিক্যাল কলেজের প্রধান ফটকের সামনের রাস্তায় এসে সমবেত হয়। বিকেলে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন ছিলো। আমরা পরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হলাম। বেশীদূর যাওয়া সম্ভব হলো না। পুলিশ পরিষদ ভবন ঘেরাও করে রেখেছিলো। পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার সময় যতই এগিয়ে আসছিলো---আমাদের উত্তেজনা ও কর্মব্যস্ততা ততই বাড়ছিলো। পরিষদ ভবনের দিকে গমনরত একেক জন পরিষদ সদস্যকে রাস্তায় আটকিয়ে তাঁদের কাছ থেকে আমরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিশ্রুতি আদায় করতে থাকি। পুলিশ ক্রমাগত রাস্তায় ছাত্র-জনতার উপর লাঠিচার্জ আর টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করতে থাকে। অন্যদিকে ছাত্র-জনতা পুলিশের উপর ব্যাপকভাবে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের চারপাশের এলাকা একটি যুদ্ধক্ষেত্রের

রূপ ধারণ করে। জেলা প্রশাসক কোরেয়শী ও পুলিশ অফিসার মাসুদের চেহারা আজো আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কোরেয়শী দাঁড়িয়েছিলো মেডিক্যাল কলেজের মেইন গেটের উল্টোদিকে (বর্তমান জিমনেশিয়াম হলের পেছনের দিকে) আর মাসুদের এক পায়ে ছিলো একটি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, তার মাথায় ছিলো হেলমেট, সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলো রাস্তার উপর। পুলিশের গুলী চালাবার পূর্ব মুহূর্তের একটি ঘটনা আমার মনে পড়ছে। প্রোক্টর মুজাফফর আহমদ চৌধুরীর সাথে পুলিশ অফিসারদের খুব তর্ক-বিতর্ক হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অভিযোগ করা হয়—ছাত্রদের ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ফলে বেশ কিছু সংখ্যক পুলিশ আহত হয়েছে। উত্তরে মুজাফফর আহমদ বলেন—"পুলিশও কম করছে না, তারা লাঠিচার্জ আর টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে অনেক ছাত্রকে আহত করেছে।" স্যারের পিছনেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় দু'রাউণ্ড গুলীর শব্দ শোনা গেলো। জনৈক ব্যক্তি চীৎকার করে বলতে লাগলো, "শুয়ে পড়ুন, আপনারা শুয়ে পড়ুন, পুলিশ গুলী করছে।" গুলীর শব্দ শুনেই আমি মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলের দিকে দৌড় দিলাম। মাটিতে পোঁতা একটি খুঁটির সাথে হোঁচট খেয়ে আমি পড়ে যাই। আমার সামান্য কিছু দূরে হোস্টেলের ১২ নম্বর শেডের সামনে বরকত পুলিশের গুলীতে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। আমরা তাকে ধরাধরি করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে আরো কয়েকজন আহত ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয়েছে। সারা ঢাকা শহরে নেমে এলো বিষাদের ছায়া। জনতার ঢল নামলো রাস্তায়। সবারই গন্তব্যস্থল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ। আজ একজন শিক্ষকের কথা মনে পড়ছে। তিনি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আয়ার সাহেব। আমার পায়জামা আর সার্টে রক্তের দাগ দেখে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "They killed my boys।" এরপর হাসপাতালে আসেন কয়েকজন পরিষদ সদস্য। তর্কবাগীশ আহত নিহতদের দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েন। নেতৃবৃন্দের নির্দেশে আমি রাতে মেডিক্যাল কলেজ থেকে সলিমুল্লাহ হলে ফিরে আসি। পরের দিনের (২২শে ফেব্রুয়ারীর) কর্মসূচীকে সফল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সাথে সাথেই কাজে লেগে গেলাম। মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল, সলিমুল্লাহ হল ও ফজলুল হক হলে আন্দোলন পরিচালনার জন্য দফতর খোলা হয়। এসব দফতরের

মাইকগুলো মুখর হয়ে উঠলো ২২ তারিখের কর্মসূচী ঘোষণায়। সলিমুল্লাহ হল কন্ট্রোল রুমের আমি কর্মকর্তা ছিলাম। কর্মীদের সাথে সংযোগ স্থাপন, আন্দোলনের কর্মসূচী প্রণয়ন এবং বিভিন্ন হলের কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে কর্মসূচীর সমন্বয়সাধন করার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছিলো। দিন রাত কাজ করার দরুন অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ২৩ তারিখ রাতে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। বন্ধুরা আমাকে একটি এম্বুলেন্সে করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। আমি সুস্থ হয়ে উঠলে ঐ রাতেই তারা আবার আমাকে এম্বুলেন্সে করে সলিমুল্লাহ হলে নিয়ে আসে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ভীড় জমাতো সলিমুল্লাহ হলের মাঠে---আন্দোলনের কর্মসূচী জানার জন্যে। কোর্ট-কাচারী, অফিস-আদালত, দোকান-পাট, যানবাহন সব কিছু পরিচালিত হতে লাগলো কন্ট্রোল রুম থেকে ঘোষিত নির্দেশ অনুসারে। কণ্ট্রোল রুমগুলোই ছিলো ২২ থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঢাকা শহরের আসল নিয়ন্ত্রক। সরকার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলো সেসময়ে। ২৫শে ফেব্রুয়ারী সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে এবং ছাত্রদের হল ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়। ঐদিন পুলিশ ও সেনাবাহিনী সলিমুল্লাহ হল ঘেরাও করে। আমি হলের হাউস টিউটর মান্নান ভূঁইয়ার বাসায় আশ্রয় নেই। পুলিশ হাউসটিউটর মফিজউদ্দিন আহমদসহ বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত ছাত্ররা সলিমুল্লাহ হলের মাঠে পুলিশের সামনে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" বলে শ্লোগান দিয়েছিলো। এদৃশ্যটি আমার আজো মনে আছে। সলিমুল্লাহ হলে বসেই ময়মনসিংহে যে আন্দোলন চলছে, সে খবর পেয়েছিলাম। খবরটি পাঠিয়েছিলেন আমার যমজ ভাই সৈয়দ বদরুদ্দীন হোসেইন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিষ্ট্রার)। তিনি তাঁর এক ছাত্রের সাথে আমার কাছে একটি চিরকুট পাঠিয়েছিলেন। তাতে লিখেছিলেন, "আমরা ময়মনসিংহে আন্দোলন করছি। তোমাদের কর্মসূচী আমাদেরকে জানাও।" এ আন্দোলনে ময়মনসিংহে তিনি ও তাঁর সাথে হাশিমুদ্দীন, রফিকুদ্দীন ভূঁইয়া ও হাতেম আলী তালুকদার গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।

আমি সলিমুল্লাহ হল ত্যাগ করে সৈয়দ নূরুদ্দীনের ঢাকার বাসায় আশ্রয় নেই। সেসময় তিনি সংবাদের বার্তা সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াও আরো একটি ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো।

তিনি ছিলেন আমার বড়ভাই সৈয়দ নাজিমুদ্দীন হোসেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। স্কুল জীবনে আমরা একই ছাত্রাবাসে থাকতাম। মার্কসবাদী চিন্তাধারার অনেক বই আমি সৈয়দ নূরুদ্দীনের কাছ থেকে নিয়ে পড়তাম। আত্মীয়দের মধ্যে তিনিই একমাত্র ঢাকা শহরে সেদিন আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আমাকে আশ্রয়দাতা হিসেবে আর একজনের নাম আমি উল্লেখ না করে পারছি না। তিনি হলেন ঘোড়াশালের অতিপরিচিত জমিদার ফেলু মিয়া (আমার এক মামাতো বোনের স্বামী)। সেদিন আমার নিজের মামার বাড়ীতে আশ্রয় পাই নি। আমার মামারা ছিলেন নূরুল আমীনের ভক্ত ও মুসলিমলীগ পন্থী। আমার জন্য বাড়ী খানাতল্লাসী হবে এ অজুহাতে তাঁরা আমাকে সেদিন আশ্রয় দেন নি। কিন্তু ফেলু ভাই আজীবন কট্টর মুসলিম-লীগ পন্থী হয়েও সেদিন আমাকে তিনি বলেছিলেন, "তুমি আমার শোবার ঘরে আমার সাথেই থাকবে। যদি পুলিশ তোমাকে এরেস্ট করতে আসে তবে আমাকেসহই এরেস্ট করবে।" আমি এখনো তাঁর এই বক্তব্য শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তিনি আমাকে তাঁর একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীর সাথে দিয়ে বারহাট্টায় আমার ভাইয়ের কাছে আমাকে পাঠিয়ে দেন। এরপর আন্দোলনের সাথে সলিমুল্লাহ হলে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার আর কোন সংযোগ ছিলো না।

সবশেষে আন্দোলনের বিশেষ চরিত্র সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে চাই। একুশের আন্দোলন ছিলো সম্পূর্ণভাবে ছাত্রসমাজের। এর নেতৃত্ব দিয়েছিলো পূর্বপাকিস্তান যুবলীগ ও পূর্বপাকিস্তান ছাত্রলীগ। আমরা একটি বিষয়ে খুব সচেতন ছিলাম যে, কোন বিশেষ দলের নেতৃত্বে যেন আন্দোলন না চলে যায়। এখানে নেতৃত্ব ও দল বলতে আমি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের কথাই বলছি। অবশ্য বিরোধী দলের শ্রদ্ধেয় নেতৃবর্গ অনেক বিষয়েই পরামর্শ দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। আন্দোলনকে জোরদার করার জন্যে তাঁরাও এগিয়ে এসেছিলেন।

সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেইন নরসিংদী জেলার ঘোড়াশাল গ্রামে মাতুলালয়ে ১৯২৫-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস কিশোরগঞ্জ জেলার জঙ্গলবাড়ি গ্রাম। কিশোর-গঞ্জ হাই স্কুল থেকে ১৯৪১-এ ম্যাট্রিক, কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজ থেকে ১৯৪৮-এ

আই. এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭১-এ বি. এ. অনার্স (দর্শন) ও ১৯৫২-তে এম. এ. (দর্শন) পাশ করেন। ১৯৫৩—৫৪-তে সাতক্ষীরা কলেজে এবং ১৯৫৪—৬৭-তে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে দর্শনের অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৭-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। তিনি বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন ও বর্তমান সভাপতিদের সাক্ষাৎকার

সৈয়দ আলী আহসান
আবদুল হক ফরিদী
আবদুল্লাহ্ আল মুতী

বাংলা একাডেমীর সভাপতির পদটি অত্যন্ত গৌরবের এবং সম্মানজনক। দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক, শিল্পী, গবেষক, বিজ্ঞানীর মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিভাগ নাম প্রস্তাব করে এবং রাষ্ট্রপতি এই নাম অনুমোদন করেন।

১৯৬১-এর ৩ ডিসেম্বর এই পদে প্রথম মনোনীত হন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। এরপর আসেন মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্। তাঁর কার্যকাল ১৯৬২-৬৩। ১৯৬৪-৬৫ বৎসরকালে সভাপতি ছিলেন ডঃ মুহাম্মাদ কুদ-রাত-এ-খুদা। মাঝখানে বেশ কয়েক বৎসর এই পদে কেউ ছিলেন না। ৯.৮.১৯৬৯ তারিখে সৈয়দ মুর্তাজা আলী সভাপতি হন। ৮.৮.১৯৭১ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সভাপতি হন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ২২.১১.১৯৭২ তারিখে। তিনি ২০.১১.১৯৭৪ পর্যন্ত উপর্যুক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সৈয়দ মুর্তাজা আলী দ্বিতীয়বারের মতো সভাপতি হবার গৌরব অর্জন করেন ৮.৩.১৯৭৫ তারিখে। তাঁর কার্যকাল ৭.৩.১৯৭৭ পর্যন্ত। ১০.১০.১৯৭৭-এ সভাপতি হন সৈয়দ আলী আহসান। ৯.১০.১৯৭৯ পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ১৪.৭.১৯৮০ তারিখে আসেন আ.ফ.ম. আবদুল হক। তাঁর কার্যকাল ১৩.৭.১৯৮২ পর্যন্ত। ১৯.৯.১৯৮২ তারিখে সভাপতি হন আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ। ৩.৬.১৯৮৪ পর্যন্ত আমৃত্যু উপর্যুক্ত পদে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমান সভাপতি ড. আবদুল্লাহ্ আল মুতী। তাঁর কার্যকাল শুরু হয়েছে ১৩.১১.১৯৮৬ তারিখ থেকে।

বাংলা একাডেমীর দশজন সভাপতির মধ্যে আমরা সাক্ষাৎকার পেয়েছি তিন জনের। বাকি সবাই প্রয়াত হয়েছেন।

আমরা তিনজন সভাপতির কাছে দুটি প্রশ্ন রেখেছিলাম। প্রশ্নগুলো হলো :

ক. আপনি কি মনে করেন বাংলা একাডেমী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হয়েছে ?

খ. বাংলা একাডেমীর কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার কোনো প্রস্তাব আছে কি ?

সৈয়দ আলী আহ্সান

আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠানগত ঐতিহ্য নির্মাণে প্রচণ্ড বাধা হচ্ছে কর্মকর্তার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কার্যধারার বিবিধ সিদ্ধান্তে বৈপরীত্য স্থাপন অর্থাৎ একসময় যেসব সিদ্ধান্তে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় পরবর্তীকালে বিপরীত সিদ্ধান্তে পুরনো ধারা পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। এর ফলে এক সময়ের সত্য অন্য সময়ে আর সত্য থাকে না এবং একটি প্রতিষ্ঠান তার ঐতিহ্য নির্মাণে সক্ষম হয় না। ভারতের জয়সওয়াল ইনসটিটিউট অব রিসার্চ ব্রিটিশ আমল থেকে অদ্যাবধি একই প্রকৃতির কাজকর্মে নিয়োজিত বলে সেটি একটি ঐতিহ্য নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে। এবং তার কর্মধারায় নীতিগত কোনো পরিবর্তন আসে নি। যে কারণে আজ হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় বিস্ময়কর কর্মব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে কোনো প্রতিষ্ঠান সেভাবে নিজেদেরকে রূপায়িত করতে সক্ষম হয় নি। বাংলা একাডেমীর কর্মধারা আমরা যদি প্রথম থেকে পর্যালোচনা করি তাহলে লক্ষ্য করবো যে অনবরত ভাবপ্রকল্প এবং নীতির পরিবর্তন ঘটেছে। এবং কর্মপন্থারও পদ্ধতিগত পরিবর্তন ঘটেছে। হয়তো এর প্রয়োজন ছিল হয়তো বা ছিল না কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে নীতি ও নির্দেশনার অনবরত পরিবর্তনের ফলে একাডেমী একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্যের ধারা নির্মাণে সক্ষম হয় নি। ফরাসী একাডেমী সুদীর্ঘকাল ধরে একই ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক। ফরাসী একাডেমীর মূল লক্ষ্য ছিল ফরাসী ভাষার মৌলিক সত্তাকে সংরক্ষণ। আজো সেই আদর্শ তারা অনুসরণ করে চলেছে এবং সেই আদর্শের ভিত্তিতে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির থাকার ফলে ফরাসী একাডেমী বিশ্বের সকলের কাছে সম্মান লাভে সমর্থ হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আদর্শের নতুন নতুন ব্যাখ্যা আমরা পাচ্ছি এবং এই সমস্ত ব্যাখ্যা দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকেও প্রভাবান্বিত করে। রাজনৈতিক প্রভাববলয়ের বাইরে থেকে ভাষা ও সাহিত্যগত আদর্শে একনিষ্ঠতা বাংলা একাডেমীর একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশের প্রশাসনযন্ত্র পাকিস্তান আমল থেকেই একাডেমীর

কর্মকাণ্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করেছে। পাকিস্তান আমলে গবর্ণর আবদুল মোনেম খাঁ বাংলা একাডেমীকে তার নির্দেশনায় পরিচালিত করবার বহুবিধ প্রয়াস পেয়েছিলেন। তার সেই প্রয়াসের বিরোধিতা করায় আমাকে একাডেমী ছেড়ে চলে যেতে হয়। আমি এই ব্যক্তিগত উদাহরণটি একারণে দিলাম যে এতে সুস্পষ্ট হবে যে রাষ্ট্রীয় নির্দেশনার বলয়ের মধ্যে একাডেমীকে টেনে আনবার প্রচেষ্টা কি প্রবল ছিল।

জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাংলা একাডেমী সক্ষম হয়েছে কি হয় নি এ প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার কারণ একাডেমী যদি নিজস্ব কর্মধারার একটি আদর্শ নির্মাণে সক্ষম হয় এবং সে আদর্শ অনুশীলনে অটল থাকে তাহলেই জাতিসত্তার সঙ্গে সে ওতপ্রোত থাকতে পারবে। আমাদের প্রধান প্রয়োজন ছিল বাংলা ভাষায় সকল প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি প্রস্তুতকরণ। বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে এখনো বিরাট শূন্যতা বিরাজমান। এ শূন্যতা যতদিন পর্যন্ত আমরা দূর করতে না পারবো ততদিন পর্যন্ত কিন্তু জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না।

বাংলা একাডেমীর সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা, পৃথিবীতে এ-ধরনের প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা আছে তারই অনুরূপ হবে, যেমন গ্রন্থাগার ব্যবহারের অধিকার। গ্রন্থাগারে বসে পাঠকক্ষ ব্যবহারের অধিকার এবং বার্ষিক একটি মিলনী সভায় প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা এবং উপদেশ প্রদান।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে-সমস্ত অবধী-হিন্দী, ফারসী-আরবী এবং সংস্কৃত কাব্য দ্বারা প্রভাবিত সে-সমস্ত আকর গ্রন্থ বাংলাতে অনূদিত হওয়া প্রয়োজন। এ-দায়িত্ব বাংলা একাডেমীই গ্রহণ করতে পারে।

জাতির নিকট, ভাষা ও সাহিত্যকর্মে, একাডেমী বিশেষ ভরসাস্থল।

আবদুল হক ফরিদী

বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা গণ-দাবীর একটি প্রত্যক্ষ ফল বলা যেতে পারে। কাজেই এর কাছে জনগণের প্রত্যাশা অসীম ও অসংখ্য। প্রতি বছর বার্ষিক সভায় যে-সব দাবী ও প্রস্তাব আসে তাতে মনে হয় একাডেমী বোধ হয় কখনো জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ পূরণ করতে সক্ষম হবে না। এতে ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। বরং জাতির অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা ও দাবী একাডেমীর কর্মকর্তা ও পরিচালকদের সর্বদা সতর্ক, সচেতন ও সচেষ্ট রাখতে সাহায্য করবে।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা একাডেমী সীমাবদ্ধ আয় এবং বিভিন্ন বাধা বিপত্তির মধ্যেও সাধ্যমত ভাল কাজ করতে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। বিগত বছরগুলিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাডেমীর সাফল্যে যথেষ্ট গর্ববোধ করার অবকাশ রয়েছে। সম্পদ ও আয়বৃদ্ধির সাথে কর্মতৎপরতার ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাবে, ফলে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে একাডেমী অধিকতর সফল হবে।

সমস্ত প্রতিষ্ঠানই মানুষের দ্বারা পরিচালিত। মানুষ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। অনভিজ্ঞতা বা অন্য কারণে প্রথম দিকে একাডেমী পরিচালনায় কিছু কিছু ভুল-ভ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাতে একাডেমী হয়তো আর্থিক ক্ষতি ও সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে থাকবে। ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে চলতে পারলে বাংলা একাডেমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেশের ও দশের জন্য গৌরব অর্জন করতে পারবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

একাডেমীর কার্যক্রম সম্পর্কে আমার প্রস্তাব :

১। উন্নীত কী-বোর্ড সম্বলিত বাংলা টাইপ লিপি-যন্ত্র সত্বর নির্মাণের ব্যবস্থা করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রাকারের বহন-যোগ্য (পোর্টেবল) যন্ত্র নির্মাণ করে স্বল্প মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহারের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে। ভর্তুকির সাহায্যে মূল্য হ্রাস করা যায় কিনা পরীক্ষা করা যেতে পারে। ইলেক্ট্রিক বা ইলেক্ট্রনিক লিপি-যন্ত্র কয়েক বছর পরে হলেও বোধ হয় বিশেষ ক্ষতি হবে না।

২। বাংলা সাময়িকীসমূহের পূর্ণ সেট সংগ্রহ। বাংলাভাষী, বাংলাদেশ-বাসী দ্বারা লিখিত, সম্পাদিত ও পরিচালিত সমুদয় সাময়িকীর সম্পূর্ণ সেট

সম্ভবত বাংলাদেশের কোন সরকারী, বেসরকারী বা ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে রক্ষিত নেই। (আমার ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হলে আমি বিশেষ আনন্দিত হব)। জনপ্রিয় মাসিক সওগাত ও মাসিক মোহাম্মদী-র পূর্ণ সেটও কোথাও দেখা যায় না। জনাব নাসিরুদ্দীন সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁর কাছে সওগাত-এর সম্পূর্ণ সেট আছে কিনা। (আমি যদি ঠিকমত শুনে থাকি) তিনি বলে-ছিলেন যে নেই। হয়তো কলিকাতা থেকে ঢাকা স্থানান্তরের সময় সব সংখ্যা আনা সম্ভব হয় নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত সাময়িকীর একটা ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছে। তাতেও দেখা যায় যে অধিকাংশ বাংলা সাময়িকীর সেট অসম্পূর্ণ। লেখক ও গবেষকদের ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশে এরূপ সংগ্রহ অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। আমেরিকার লাইব্রেরী অব্ দি কংগ্রেস বা বিলাতের বৃটিশ মিউযিয়াম লাইব্রেরীর মত অন্তত একটি প্রতিষ্ঠান এখানে থাকা উচিত যেখানে সব বাংলা সাময়িকী পাওয়া যাবে, অন্তত পক্ষে কোথায় পাওয়া যাবে তার সঠিক সন্ধান পাওয়া যাবে। জাতি নিশ্চয় আশা করবে যে বাংলা একাডেমী এ দায়িত্ব গ্রহণ করুক।

কাজটি যেমনি কঠিন তেমনি সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। নিষ্ঠাবান কর্মিদের নিবেদিত সাধনা ছাড়া কিছুই হবে না। ময়মনসিংহ গীতিকা যেভাবে সংগ্রহীত হয়েছিল সে পদ্ধতিই সম্ভবত অবলম্বন করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প হিসাবে কাজ আরম্ভ করা যায়।

৩। পাঠকদের একাডেমী গ্রন্থাগারের বই বাড়িতে নিয়ে পড়বার জন্য ধার দেয়া। পাঠের অভ্যাস গঠন করা জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মত বাংলা একাডেমীরও অন্যতম কর্তব্য হওয়া উচিত। পূর্বে লাইব্রেরী কার্ডের মাধ্যমে বাংলা একাডেমীর সদস্যদের গ্রন্থ ধার দেয়া হত। তা পুনঃপ্রবর্তিত করা বাঞ্ছনীয়। দরকার মনে করলে নিরাপত্তা আমানত রাখা যেতে পারে। ধার-প্রদান শাখা পৃথক করা যায়, যাতে থাকতে পারে প্রধানত হাল্‌কা পাঠ্য যথা গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, রম্য রচনা, জীবনী, ইতিহাস, শিশু কিশোরপাঠ্য সাহিত্য, দৈনন্দিন সহজ-বোধ্য বিজ্ঞান ইত্যাদি। পাঠাভ্যাস গঠন করতে পারলে অপরাধ-প্রবণতা হ্রাসে সহায়ক হতে পারে। জনপ্রিয় গ্রন্থগুলির একাধিক কপি রাখা বাঞ্ছনীয়।

৪। ছাত্র ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য বাংলা একাডেমীর "বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান"-এর একটি অল্প দামের ক্ষুদ্র সংস্করণ করা বাঞ্ছনীয়।

আবদুল্লাহ আল-মুতী

বাংলা একাডেমীর কাছে জাতির যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা একাডেমী তা পূরণের পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে মাত্র— পূরণে সক্ষম হয়েছে বলা যায় না।

একাডেমীর কার্যক্রম আজ যে পর্যায়ে রয়েছে তা অত্যন্ত খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ বলে মনে করি; এই মাত্রার কার্যক্রম সমগ্র দেশের ওপর ব্যাপক ও স্থায়ী প্রভাব রাখার জন্য মোটেই অনুকূল নয়। এই কার্যক্রমকে আরো অনেক বেশি প্রসারিত ও গভীর করার সুযোগ ও প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন পরিচালক ও মহাপরিচালকদের সাক্ষাৎকার

সৈয়দ আলী আহসান	পরিচালক
কাজী দীন মুহম্মদ	,,
কবীর চৌধুরী	,,
মযহারুল ইসলাম	মহাপরিচালক
নীলিমা ইব্রাহীম	,,
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম	,,
আশরাফ সিদ্দিকী	,,
মনজুরে মওলা	,,

১৯৫৫ সালে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হলে বিশেষ কর্মকর্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন মোহম্মদ বরকতুল্লাহ। ২৮ ২ ১৯৫৭ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৭৪ সালেব ২ নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৫৬ সালের ১ ডিসেম্বর ড. মুহম্মদ এনামুল হক বাংলা একাডেমীর প্রথম পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৮২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আমরা আটজন প্রাক্তন পরিচালক ও মহাপরিচালকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। আমরা তাঁদের কাছে দু'টি প্রশ্ন রেখেছিলাম। প্রশ্নগুলি হলো :

ক. এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পদে দায়িত্ব পালনের সময় আপনি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন? এবং তার কতোটুকু বাস্তবায়িত হয়েছিলো ?

খ. বাংলা একাডেমীর বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার অভিমত জানাবেন কি? ভবিষ্যৎ কার্যক্রম কি ধরনের হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

সৈয়দ আলী আহসান

আমি ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলা একাডেমীর দায়িত্বভার গ্রহণ করি। এর পূর্বে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলাম। বাংলা একাডেমীতে যোগদান করার অব্যবহিত পূর্বে মরহুম ডক্টর এনামুল হক বাংলা একাডেমীর কার্যভার ত্যাগ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ডক্টর এনামুল হক বাংলা একাডেমীর গঠনতন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন এবং সরকারী অনুমোদনের পর বিভিন্ন বিভাগ স্থাপন করেছিলেন। এই বিভাগগুলি ছিল: সংকলন বিভাগ, গবেষণা বিভাগ, অনুবাদ বিভাগ, সংস্কৃতি বিভাগ, প্রকাশন বিভাগ এবং গ্রন্থাগার বিভাগ। মরহুম এনামুল হক-এর সাংগঠনিক দক্ষতা অসাধারণ ছিল এবং তিনি বিভাগগুলো পরিচালনার নিয়মতান্ত্রিক কতোগুলো পদ্ধতি চালু করেছিলেন। মূলতঃ সাংগঠনিক তৎপরতায় অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হওয়ায় বাংলা একাডেমী গবেষণা, প্রকাশনা, অনুবাদ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সে সময় প্রদর্শন করতে পারেন নি। কিন্তু একাডেমীর একটি নিয়মতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে ওঠার ফলে আমার পক্ষে বিভিন্ন কাজে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়েছিল। সংকলন বিভাগ একটি বাংলা অভিধান প্রণয়নের দায়িত্ব নিয়েছিল। ব্যবহারিক অভিধান নয়, আঞ্চলিক ভাষার অভিধান। আমি এসে অভিধানের শব্দ সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত করে সম্পাদনার কাজ ত্বরান্বিত করি। ভাষাতাত্ত্বিক অঞ্চল হিসেবে মহকুমাকে ক্ষুদ্রতম ইউনিট ধরে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের অর্থাৎ বাংলাদেশের লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এডেনবরা বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে স্কটল্যাণ্ডের লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে করার জন্য বিভিন্ন নিত্য ব্যবহার্য শব্দের তালিকা তৈরী করেছিল বাংলা একাডেমীও অনুরূপভাবে যেন একটি শব্দ-তালিকা প্রণয়ন করতে পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং প্রধান সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এর পূর্ণাঙ্গ কাজ শেষ করেন ১২-৮-৬১ তারিখে।

সৈয়দ আলী আহসান ১৫.১২.১৯৬০ থেকে ১৪ ২.১৯৬৭ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

এই বিভাগ পরবর্তীতে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের কাজে হাত দেয়। এবং লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষের উপর ভিত্তি করে বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষ প্রস্তুত করতে থাকে। ইসলামিক বিশ্বকোষের কাজ শেষ হয় ১৯৬৬ সালে। এ বিশ্বকোষও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন মরহুম শেখ শরফুদ্দিন এবং মরহুম আদমউদ্দিন। সম্প্রতি এ বিশ্বকোষটি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশে নাটকের অভাব লক্ষ্য করে এবং মঞ্চায়নের অসুবিধার কথা চিন্তা করে ১৯৬১ সালে ঢাকার বিভিন্ন নাট্যসংস্থা এবং নাট্যামোদী ব্যক্তির সহযোগিতায় বাংলা একাডেমী তিন মাসব্যাপী ড্রামা সিজন বা নাট্য উৎসব পালন করে। ৬ই ডিসেম্বর ১৯৬১ সালে এই উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। বাংলা একাডেমীর চেষ্টায় এবং অর্থানুকূল্যে মুনীর চৌধুরী, নুরুল মোমেন, ফররুখ আহমদ, আশকার ইবনে শাইখ এবং সিকান্দার আবু জাফর বিভিন্ন নাটক রচনা করেন এবং সেগুলো মঞ্চায়িত হয়। ১৯৬২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই নাট্য উৎসব চলেছিল। বলা যেতে পারে যে, বাংলা একাডেমীর সে সময়ের নাট্য উৎসবের প্রেরণা থেকেই পরবর্তীতে নাটকের একটি ক্ষেত্র বাংলাদেশে প্রশস্ত হয়েছে।

তরুণ চিত্রশিল্পীদের শিল্পকর্মে উৎসাহ দেবার জন্য বাংলা একাডেমী ২২শে ডিসেম্বর ১৯৬১ সালে বাংলাদেশের ১৩ জন আধুনিক শিল্পীর অংকিত চিত্রের এক প্রদর্শনী করে। সে সময় তরুণ শিল্পীদের পক্ষে ঢাকার কোথাও কোনো প্রকার প্রদর্শনীর আয়োজন করার মধ্যে বিশেষ অসুবিধা ছিল। বাংলা একাডেমী সর্বপ্রথম এ অসুবিধা দূর করে।

বিদেশীদের জন্য বাংলা সার্টিফিকেট কোর্স আমি প্রথম প্রবর্তন করি। প্রথম বর্ষের সার্টিফিকেট কোর্সে গণচীনের কয়েকজন বিদ্যার্থী অংশ নিয়েছিল।

সংস্কৃতি বিভাগে লোকসাহিত্য সংগ্রহের একটি পরিকল্পনা পূর্ব থেকেই ছিল। আমি সুষ্ঠুভাবে মৌলিক লোকসাহিত্য সংগ্রহের জন্য রাজশাহী, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল, সিলেট জেলায় ৬জন বেতনভোগী সংগ্রাহক নিযুক্ত করি। এদেরই চেষ্টায় প্রাথমিকভাবে বাংলা একাডেমীতে লোকসাহিত্যের বহু মূল্যবান উপকরণ সংগৃহীত হয়। এই সংগ্রহগুলো বৈজ্ঞানিকভাবে

বাছাই করে পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে 'লোকসাহিত্য' নামক একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং এখনও হচ্ছে।

অনুবাদ বিভাগে ব্যাপকভাবে ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস, সমাজনীতি ও দর্শন, সাহিত্য, সাহিত্য-সমালোচনা ও সাহিত্য-তত্ত্ব এবং বিবিধ বিজ্ঞানের গ্রন্থ অনুবাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং বিভিন্ন ব্যক্তিকে অনুবাদের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিছু বাংলা গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে এ ব্যবস্থাটি আরো ব্যাপকতর হয়েছে।

বাংলাদেশে শিশু-সাহিত্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ পরিকল্পনা ছিল না। বাংলা একাডেমী সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিশু-সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দিতে থাকে এবং উল্লেখযোগ্য শিশু-সাহিত্যিককে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থাও করা হয়।

১৯৬১ সালে কয়েকটি সাহিত্য সমাবেশ এবং সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সাহিত্য সমাবেশগুলি এবং সেমিনারগুলিতে তৎকালীন পাকিস্তানের উভয় অঞ্চল থেকে খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধগুলি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে একটি সেমিনার ছিল, "লেখক এবং তাঁর সামাজিক দায়িত্ব" বিষয়ে আর একটি সেমিনারের বিষয় ছিল "উর্দু এবং বাংলা ভাষা।"

বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীর পৌনঃপুনিকতা নির্ধারণের জন্য একটি সার্ভে বা জরিপ সে সময় অনুষ্ঠিত হয়। এই জরিপের কাজে অংশ নেন মুনীর চৌধুরী, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, আশকার ইবনে শাইখ, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী এবং অজিত গুহ। এঁদের মধ্যে আশকার ইবনে শাইখ ছাড়া সকলেই লোকান্তরিত। জরিপটা ছিল ১৭০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য-ভিত্তিক।

এ সময় বাংলা একাডেমী পরিভাষা প্রণয়নের কাজ শুরু করে। এ পরিভাষার কাজ অনেকদিন পর্যন্ত বাংলা একাডেমীতে চলেছিল। অবশ্য মরহুম ডক্টর এনামুল হক এর সূত্রপাত করে গিয়েছিলেন। বাংলা একাডেমীতে সে সময় আমি আলাওলের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং সেই সূত্রে আলাওলের বিভিন্ন গ্রন্থ বিভিন্ন গবেষককে দেয়া হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে একমাত্র আহমদ শরীফ ছাড়া আর কেউ তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন নি। আলাওলের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত দেখার আমার বিশেষ আগ্রহ

ছিল এবং সেই আগ্রহে আমি ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে এবং লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী থেকে হিন্দী এবং অবধী কাব্যের পাণ্ডুলিপির ফটোকপি সংগ্রহ করি।

বাংলা বানান এবং লিপি সংস্কার বিষয়ে মরহুম ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র নির্দেশনায় একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। কমিটির দায়িত্ব ছিল সংস্কারের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে একটি একাডেমিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা। এই প্রতিবেদনটি বৈজ্ঞানিক-ভিত্তিতে তৈরী হয়েছিল। মরহুম ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র আগ্রহে এবং চেষ্টায় বাংলা বর্ষের একটি সংস্কারও করা হয়। কয়েকজন হিন্দু পণ্ডিত এবং জ্যোতিষী এই সংস্কার কাজে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্কে সহযোগিতা করেছিলেন। এই সংস্কারটি কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তেমন কোনো সাড়া না পাওয়ায় এটা একপ্রকার একাডেমিক এক্সারসাইজ হয়ে থাকে।

আমি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীকে পরিচিত করানোর প্রয়াস পেয়েছিলাম। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্য বিভাগের সঙ্গে একাডেমীর যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। একাডেমী সংগৃহীত অনেক লোকগাথা, লোক কাহিনী ও লোক সঙ্গীত ইণ্ডিয়ানার আর্কাইভে সে-সময় স্থান পায়। লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট পণ্ডিত প্রফেসর স্টিথ টমসন এবং প্রফেসর ডরসন বাংলা একাডেমীর কার্যধারার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। প্যারিসে সোরবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা বিভাগের সঙ্গে মরহুম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র প্রচেষ্টায় একাডেমীর একটি যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

আমার কার্যকালে ইউনেস্কো বাংলা একাডেমীকে গবেষণা এবং পুস্তক-প্রকাশনা বিষয়ে একটি প্রামাণ্য সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করে এবং আন্তর্জাতিক কয়েকটি ফোরামে একাডেমীর যোগদানের ব্যবস্থা করে। ১৯৬৪ সালে তেহরানে 'শিশু-সাহিত্য' বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে একাডেমীর পক্ষে আমি যোগদান করি। ১৯৬৬ সালে টোকিওতে গবেষণামূলক গ্রন্থপ্রকাশ বিষয়ে ইউনেস্কোর একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে আমি ইউনেস্কোর উপদেষ্টা হিসেবে যোগদান করি।

১৯৬৫-এর দিকে পাকিস্তান সরকার কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে যেভাবে কেন্দ্রীয় উর্দু উন্নয়ন

বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এখানেও একইভাবে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার পাঠ্যপুস্তক রচনা। পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে উন্নয়ন বোর্ডগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার ফলে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে একাডেমী তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেল ভেবে আমি বাংলা একাডেমীকে পুরোপুরিভাবে গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। আমার সে আশা পূর্ণ হয় নি। কেননা উন্নয়ন বোর্ডের অস্তিত্ব বিলোপের পর বর্তমানে পাঠ্যপুস্তক রচনার সামগ্রিক দায়িত্ব বাংলা একাডেমীর উপর অর্পিত হয়েছে। সুতরাং বাংলা একাডেমী এখন শুধুমাত্র গবেষণাকর্মে নিযুক্ত থাকতে পারছে না। তাছাড়া দেশের নানাবিধ সাংস্কৃতিক উৎসব বাংলা একাডেমীকে করতে হয় বলে একাডেমীর কর্মধারার মধ্যে বিস্তার এবং ব্যাপকতা এসেছে। সুতরাং একাডেমী নিবিষ্ট সাধনায় ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে আত্মনিয়োগ করতে পারছে না। ভারতে হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের জন্য বহুবিধ প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন জয়সওয়াল ইনসটিটিউট অফ হিন্দী রিসার্চ এবং আগ্রা ইনসটিটিউট অফ হিন্দী লিঙ্গুই-স্টিকস। এছাড়া আরো অনেক আছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের একাগ্র সাধনার ফলে প্রাচীন এবং মধ্যযুগের হিন্দী সাহিত্যের সকল উল্লেখযোগ্য কবির রচনাবলী সম্পাদিত এবং প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে প্রাচীন এবং মধ্যযুগের হিন্দী সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণার সকল উপকরণ পাঠকের হাতে এসেছে। বাংলা একাডেমী প্রথম থেকে একান্তভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় নিয়োজিত থাকলে আজ আমাদের সামনে প্রাচীন, মধ্যযুগ এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সকল উপকরণ উপস্থিত থাকতো। কিন্তু বাংলা একাডেমী আমাদের দেশে একমাত্র প্রতিষ্ঠান হওয়ায় একে গবেষণাকর্মের পাশাপাশি বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন, বিভিন্ন মেলার অনুষ্ঠান এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ও প্রকাশের কাজও করতে হচ্ছে। আমার মনে হয় গবেষণার জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রশাসিত বাংলা একাডেমীর অধীনেই একটি গবেষণা কেন্দ্র থাকা উচিত। এটা না হলে গবেষণায় সফলকাম হওয়া সম্ভবপর হবে না। তাছাড়া বিভিন্ন ঋতুমেলা, বইমেলা এবং দিবস উদ্‌যাপন সাময়িক জনপ্রিয়তা আনতে পারে কিন্তু স্থায়ী এবং আদর্শগত কর্মের প্রতি ক্রমশ শিথিলতার সৃষ্টি করে।

কাজী দীন মুহম্মদ

আমি ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭ থেকে মার্চ ১৯৬৯ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করি। এই সময়ের মধ্যে যেসব বই প্রেসে ছিল সেগুলোর মুদ্রণ কাজ শেষ হয়। নতুন প্রায় শতেক বই মুদ্রিত হয় এবং প্রায় এক শ'র কাছাকাছি বই প্রেসে যায়। 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' ও 'ইসলামিক বিশ্বকোষে'র কাজ সমাপ্ত হয়। বৃহৎ বিশ্বকোষের কাজ চালু থাকে।

১৯৬৮ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার বিভিন্ন বিষয়ক লোকসাহিত্য সংগৃহীত এবং লোকসাহিত্যের কয়েকখানি গবেষণা সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রণীত হয়।

সঙ্কলন বিভাগ বিশ্বকোষ, এদেশের ভাষা জরিপ, নতুন বাংলা ব্যাকরণ, সাধারণ বিশ্বকোষ, বৃহৎ বাংলা ইসলামিক বিশ্বকোষ, বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ, শিশু বিজ্ঞান বিশ্বকোষ ইত্যাদির কাজে হাতে দেয়। 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' (তৃতীয় খণ্ড) ও 'ঐতিহাসিক অভিধান' এসময়ে প্রকাশিত হয়।

অনুবাদ বিভাগের অনূদিত দু'শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে আঠারোখানি আরবী থেকে, পনেরোখানি উর্দু থেকে, ন'খানি ফার্সী থেকে এবং বাকীগুলো ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়। কিছু বই বাংলা থেকে ইংরেজী এবং উর্দুতেও অনূদিত হয়। অনূদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'কোরআন শরীফ' (আমপারা), 'তারজীদুল বুখারী', 'ফাউজুল কবীর', 'সিয়ারে মুতাখা-কিরিন', 'তারিখে ফিরোজশাহী', 'সাওরাতুল হিন্দ', 'আইনে আকবরী', 'উম্মুল কুরআন' (মওলানা আবুল কালাম আজাদ), 'আরবী সাহিত্য-তত্ত্ব', 'আরবী কাব্য-তত্ত্ব', 'কালিলা ও দিমনা', রুশোর 'কনফেশন', অভিডের 'মেটামরফশিস', এরো জেযালের 'মুসলিম কনসেপ্ট অব ফ্রিডম', জর্জ সার্টনের 'হিস্ট্রী অব সাইন্স', আমীর আলীর 'হিস্ট্রি অব সারাসিন্স', হান্টারের 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্স', ফজলে রাব্বীর 'অরিজিন অব দি মুসলমান্স ইন বেঙ্গল',

কাজী দীন মুহম্মদ ১৪ ২ ১৯৬৭ থেকে ১৪ ৩ ১৯৬৯ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন।

'বাবুরনামা', 'জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী', 'প্লেটোর সংলাপ', 'সিম্পোজিয়াম', 'পাস্টারনাকের কবিতা', 'নজরুলের কাব্য সঞ্চয়ণ' (ইংরেজীতে), নজরুল কাব্যের উর্দু অনুবাদ, 'জামে কাওসার', 'মোমেনের জবানবন্দী'র উর্দু অনুবাদ, 'সূর্য দীঘল বাড়ির' উর্দু অনুবাদ, 'লালন গীতি'র ইংরেজী অনুবাদ উল্লেখ-যোগ্য। এই সময়ের মধ্যে প্রায় শ'খানিক অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং সমপরিমাণ প্রকাশের অপেক্ষায় থাকে। প্রায় শ'খানিকের অনুবাদের কাজ চলতে থাকে।

এসময় থেকে বাংলা একাডেমীর ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উজ্জীবনের উদ্দেশ্যে মহান ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের স্মরণে একুশে ফেব্রুয়ারী দিবস উপলক্ষে প্রতিবার নিয়মিত আলোচনা, সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জাতীয় চেতনা, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসে বিভিন্ন সময় আলোচনা সভা, কবি-জলসা, নাটক, বিচিত্রানুষ্ঠান ইত্যাদির নিয়মিত আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ও মৃত্যু দিবস উপলক্ষে এবং কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম দিবস উপলক্ষে কয়েক দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এছাড়া হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, পল্লীকবি রমেশ শীল, রওশন ইয়াজদানী প্রমুখ এবং অন্যান্য মনীষীর প্রয়াণ উপলক্ষে শোকসভা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র এমিরিটাস অধ্যাপক সম্মান লাভ উপলক্ষে সম্বর্ধনা সভার প্রয়োজন করা হয়।

একাডেমীতে একটি বাংলা ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়। এই শিক্ষা কোর্স দু'টি ভাগে বিভক্ত ছিল—একটি সার্টিফিকেট কোর্স, অপরটি ডিপ্লোমা কোর্স। তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক সামরিক অফিসার, সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী, ছাত্র, ব্যবসায়ী, এদেশে অবস্থিত বিভিন্ন বিদেশী কূটনৈতিক মিশন ও প্রতিষ্ঠানে কার্যরত চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, পর্তুগাল, মিশর ইত্যাদি দেশের অনেক লোক এখানে বাংলা ভাষায় কথা বলা, লেখা ও পড়ায় দক্ষতা অর্জন করেন। একাডেমীতে বাংলা সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা ছিল।

কিশোরদের একটি দেশাত্মবোধক কবিতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় শতাধিক প্রতিযোগী এতে অংশ গ্রহণ করে। পুরস্কার প্রাপ্ত কবিতাগুলোর একটি সংকলন বের করা হয়।

এসময় থেকে একাডেমীর প্রকাশিত গ্রন্থাদির বিপণনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। স্থানাভাবে বর্ধমান হাউসের সিঁড়ি সংলগ্ন জায়গায় প্রথম পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়। বাইরের পুস্তক বিক্রেতাদেরও যথাবিহিত কমিশনসহ বইয়ের পরিবেশনার সুযোগ দেয়া হয়।

ছাপাখানার অভাবে পুস্তক প্রকাশের নানা রকম অসুবিধা দূর করে বাংলা একাডেমীর নিজস্ব প্রকাশনায় আত্মনির্ভরশীল হওয়ার উদ্দেশ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বর্তমান বাংলা একাডেমীর প্রেস ও মূল দালান এই পরিকল্পনারই বাস্তবায়ন।

গবেষণা কাজের সুবিধার্থে পত্রিকা সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়। সাবেক বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমীর সহিত সংযোজিত হওয়ার পর আমার উন্নয়ন বোর্ডে থাকাকালীন সময়ে গৃহীত উন্নয়ন বোর্ডের কয়েকটি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। এসবের মধ্যে মীর মোশাররফ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ সাহিত্যিকের গ্রন্থাবলী, বিভিন্ন মনীষী ও কবি-সাহিত্যিকের জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ অন্যতম।

বর্তমানে বাংলা একাডেমী এর বিভিন্ন শাখায় বহু কর্মসূচী কার্যকর করেছে আর অনেকগুলো হাতে আছে। সংকলন, গবেষণা, লোকসাহিত্য, অনুবাদ ইত্যাদি শাখায় প্রচুর কাজ হচ্ছে। একাডেমীর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম আশাপ্রদ।

নজরুল একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, শিশু একাডেমী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলা একাডেমীর কার্যধারায় স্বাভাবিকভাবেই কিছু পরিবর্তন এসেছে। এসব প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমীর প্রকাশনার ভার অনেকটা লাঘব করতে সক্ষম হবে। 'ইসলামী বিশ্বকোষ', 'কুরআনের অভিধান' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রকাশনার ভার ইসলামিক ফাউণ্ডেশনকে ছেড়ে দেওয়ায় একাডেমীর দায়িত্ব কিছুটা হালকা হয়েছে। অপর পক্ষে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমীর সাথে সমন্বিত হওয়ায় একাডেমীর দায়িত্ব ও গুরুত্ব অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে। পাঠ্যপুস্তক বিভাগে গত দু'দশকেরও অধিক সময়ের মধ্যে অনেক

কাজ হয়েছে। এই বিভাগেব কার্যক্রমের অগ্রগতি আরো ত্বরান্বিত হলে দেশের উপকার হবে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনে যে সব বাধা বিপত্তি রয়েছে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীব পাঠ্যপুস্তকের অভাব তাব অন্যতম। বি.এ, বি এসসি, বি. কম., এম. এ., এম. এসসি., এম. কম., আইন, চিকিৎসা, প্রকৌশল ও কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন অনুষদেব গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। এ সব বিভাগের জন্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনেব ব্যবস্থা যত ত্বরান্বিত করা যায় ততই মঙ্গল। সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাধর্মী কাজের পরিসরও বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়।

বাংলা একাডেমী আমাদের দেশ, জাতি, সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আদর্শ ও ভাষাব সঠিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, এই বিশ্বাস আমাদের আছে। আল্লাহ্ আমাদেব সহায় হউন।

কবীর চৌধুরী

বাংলা একাডেমীতে আমার কার্যকাল ১৯৬৯ এর ২৫শে মার্চ থেকে ১৯৭২ এর ২রা জুন। সময়টা ছিলো একটু অসাধারণ। স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বকালের উন্মাতাল গণআন্দোলনের দিনগুলি, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস, এবং স্বাধীনতা-উত্তর নব-অনুপ্রেরণায় উদ্বেল মাস ছয়েক ছিলো এর অন্তর্ভুক্ত। এই সময় নানা ধরনের, কখনো একডেমীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, কখনো পরোক্ষভাবে, পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিলো। তার কয়েকটি নীচে উল্লেখ করছি।

১. জাতীয় প্রতিষ্ঠান রূপে একাডেমীকে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের উপযুক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে এর সুবিধাদি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। নিজস্ব প্রেস চালু করা, একটি সুষ্ঠু গ্রন্থবিক্রয় কেন্দ্র ও কাফেটেরিয়া নির্মাণ সহ আরো কিছু পরিকল্পনা একটি মাস্টার প্ল্যান-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর প্রাথমিক বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আমার সময়েই শুরু হয়। বর্তমানে তার কিছুটা পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে, কিছুটা এখনো বাকী আছে।

২. ওই সময়েই প্রথমবারের মতো ২১শে ফেব্রুয়ারী বড়ো আকারে উদযাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯৭১-এর ২১শে ফেব্রুয়ারীতে প্রথম বারের মতো বাংলা একাডেমী সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যদিও প্রকৃতপক্ষে চারদিনের অনুষ্ঠান হয়। ওই বছরেই একাডেমী, পরিকল্পনা অনুযায়ী. প্রথমবারের মতো "একুশের সঙ্কলন" গ্রন্থ প্রকাশ করে।

৩. অ-বাংলাভাষী পাঠকের কাছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয় তুলে ধরার প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে এই সময় একটি ইংরেজী সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। মৎ-সম্পাদিত 'বাংলা একাডেমী জার্নাল' নামে এই ইংরেজী পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে।

কবীর চৌধুরী ২৫.৩.১৯৬৯ থেকে ২.৬.১৯৭২ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

৪. এবার যে বিষয়টির উল্লেখ করছি তাকে ঠিক পরিকল্পনা বলা যাবে না, তবে ১৯৭১-এর ২১শে ডিসেম্বর, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার এক সপ্তাহের মধ্যে, একাডেমীর উদ্যোগে একাডেমী প্রাঙ্গণে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের স্মরণে অনুষ্ঠিত সভায় যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো তার কয়েকটি বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করি –

(ক) বাংলাদেশের গণহত্যার পরিকল্পনার পেছনে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার যেসব জেনারেল ও তাদের অনুচররা রয়েছে তারা যুদ্ধাপরাধী, তাদের বিচারের জন্য জাতীয় ট্রাইবুনাল গঠন করতে হবে।

(খ) যেসব সরকারি কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী ও অন্যেরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে তাদের বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী দণ্ড দিতে হবে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে একটি স্মারকলিপি প্রণীত হয়। তাতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমরা একটি বই খুলি এবং বইটি বাংলা একাডেমীর বারান্দায় স্থাপন করি। তিন-চার দিনের মধ্যে কয়েক লক্ষ লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাতে স্বাক্ষর প্রদান করেন। আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে আমি বিশ্বের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ উদার মানবতাবাদী ব্যক্তির কাছে তারবার্তা প্রেরণ করেছিলাম। ভারতের জয়প্রকাশ নারায়ণ ও ফ্রান্সের আঁদ্রে মলরো সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম করে তাঁদের সমর্থন জানিয়েছিলেন। এর পরের ঘটনা আপনারা সবাই জানেন। যুদ্ধাপরাধীদের কোন বিচারই হয় নি।

৫. স্বাধীন বাংলাদেশে দেশের সকল কাজে, বিশেষ করে আপিস-আদালতে এবং উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে, এবং কোন কোন বিষয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বাংলা ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা সেসময় কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করি।

যেমন : (ক) আপিস-আদালতে সচরাচর ব্যবহৃত হয় সেরকম কয়েকটি ফর্ম, আবেদনপত্র ও স্মারকলিপির বাংলা রূপ তৈরী করে দেয়া।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ে সর্ববিষয়ে বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক গ্রন্থাদি রচনার কাজ শুরু করা।

(গ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতগণ বিদেশের রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে তাঁদের যে পরিচয়পত্র পেশ করবেন আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য তার বাংলা মডেল তৈরী করে দেয়া।

(ঘ) বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কবিতা-উপন্যাস-গল্প গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের প্রকাশ ও বিদেশে তার প্রচারের ব্যবস্থা করা।

এসব পরিকল্পনার কিছুটা বাস্তবায়িত হয়েছে, অনেকটাই এখনো হয় নি।

বাংলা একাডেমীর বর্তমান কার্যক্রম ভালোই চলছে। গ্রন্থ প্রকাশনা, নানা দিবস উদযাপন, আলোচনা চক্র, বক্তৃতামালা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একাডেমী মোটামুটি কর্মতৎপর রয়েছে।

ভবিষ্যত কার্যক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি, প্রয়োজনীয় অর্থ ও সাংগঠনিক ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান ক'রে, অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে:

১. একাডেমীর উদ্যোগে তিন বছরে একবার একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা।

২. ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যত্র যেখানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং তুলনামূলক সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে তার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তোলা; গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার আদান-প্রদান করা; পণ্ডিত-গবেষক-বক্তা বিনিময়ের আয়োজন করা।

৩. বাংলা একাডেমী আয়োজিত বক্তৃতামালা এবং আলোচনা সভা ইত্যাদি মাঝে মাঝে ঢাকার বাইরে অন্য কোন জেলা শহরে অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়া।

৪. বাংলাদেশের সৃজনশীল সাহিত্যের ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের ব্যাপকতর উদ্যোগ গ্রহণ করা, সে-সবের দ্রুত প্রকাশ এবং বিদেশে তার সফল প্রচারের ব্যবস্থা করা।

৫. বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ে মৌলিক গবেষণাকর্মে একাডেমী কিভাবে আরো কার্যকর সহায়তা দান করতে পারে তা আন্তরিকভাবে বিবেচনা করা।

মযহারুল ইসলাম

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু আমার ওপর একটি গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন—তাঁর ইচ্ছে তৎকালীন বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলা একাডেমী এ দু'টোকে একত্র করে গড়ে তুলতে হবে সমন্বিত একটি একাডেমী যার নাম হবে 'বাংলা একাডেমী' এবং যার মর্যাদা ধীরে ধীরে উন্নীত হবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ে গবেষণায়, সংস্কৃতির লালন ও সাধনায়, জ্ঞানচর্চায়, প্রকাশনায়, বাঙ্গালীর ঐতিহ্য রক্ষায় ও রূপায়ণে এবং আরো বহুবিধ শিক্ষাগত-সংস্কৃতিগত কর্মকাণ্ডে যে-প্রতিষ্ঠানটি হবে বাংলাদেশের মধ্যমণি। সংগ্রামী-শরণার্থী জীবন থেকে ফিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে আমার নিজের ভুবনে ফিরে যাব এই আনন্দে যখন আমি উদ্বেল, তখনই বঙ্গবন্ধুর আহ্বান— তাঁর দীর্ঘদিনের মহৎ একটি স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার দায়িত্ব আমাকেই গ্রহণ করতে হবে। তাঁর সাথে আমার আত্মিক বন্ধনের সূত্রটি সুদৃঢ় ছিল বলেই তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলুম না। প্রাথমিক কাজ হলো সমন্বিত একাডেমীর গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা যা জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হবে— এই কাজটি ত্বরান্বিত করতে সাহায্যে করলেন তৎকালীন আইনমন্ত্রী ডক্টর কামাল হোসেন। তবে মূল কাঠামোটিকে দাঁড় করাতে হয়েছিল আমাকেই- সরকার কর্তৃক গঠিত একটি কমিটি ছিল, যাঁদের মধ্যে দু'একজন এমন সমন্বয়ের পক্ষপাতি ছিলেন না। সাংবিধানিক এই প্রতিকূলতা দূর হবার পর শুরু হলো প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা। দু'টো প্রতিষ্ঠান ছিল অসম—একটি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন, অপরটি পূর্ববাংলার সরকারের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত। বেতন কাঠামো এক নয় যাঁরা কেন্দ্রের সুবিধাভোগী, সুবিধা থেকে স্বাভাবিকভাবেই বঞ্চিত হতে নারাজ। অন্যপক্ষে স্বায়ত্তশাসিত বলে অপরটিতে স্বাধীন বক্তব্যের প্রবণতা ছিল প্রবল— আন্দোলনের স্পৃহা পদে পদেই জাগ্রত। তাঁরাই বা কম কিসে? অতএব, আমাকে সহিষ্ণুতা বজায় রেখে ধীর পদক্ষেপে এগোতে হয়েছিল

মযহারুল ইসলাম ২.৬.১৯৭২ থেকে ১২.৮ ১৯৭৪ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

—কাউকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করে নয়, সমঝোতার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করতে আমি সমর্থ হয়েছিলাম। আওয়ামীলীগ সরকারের অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধুর শত্রু ছিল, যারা তখন হোমরা-চোমরা মন্ত্রী, তাদের সামলানো এবং বাইরের স্বাধীনতার বিরুদ্ধ-পক্ষীয়দের উস্কানীর মোকাবেলা করা, দু'টোই কঠিন কাজ। আমার ব্যর্থতায় তাদের উল্লাস—সেইসব ষড়যন্ত্রের জাল আমাকে ছিন্ন করতে হয়েছিল।

অতঃপর আমি নিজেকে কঠোরভাবে নিয়োজিত করেছিলাম গঠনমূলক কাজে। নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আমি অগ্রসর হতে সচেষ্ট ছিলাম। ফলে একাডেমীতে বিভাগের সংখ্যা বাড়লো, জনসংখ্যা সেই অনুপাতেই বৃদ্ধি পেল, আবর্তক ব্যয় উঠে গেল দ্বিগুণ ছাড়িয়ে, উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ এলো পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী। একাডেমী কেবল কলেবরেই বৃদ্ধি পেল না, একটি জীবন্ত ও কর্মচঞ্চল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো।

বাংলাভাষাকে যাতে উচচশিক্ষার বাহন হিসেবে ব্যবহার করা যায় সেজন্য বিভিন্ন বিষয়ে পরিভাষা কমিটি গঠিত হলো। স্বল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষাগত প্রায় সকল বিষয়ের পরিভাষাকোষ প্রণীত হলো, সেগুলো পরবর্তী-কালে প্রকাশিত হয়েছে।

স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের পরিকল্পনাটিও প্রথমে একাডেমীতেই গৃহীত হয়ছিলো—এজন্য যে তথ্যগুলো সংগহীত হয়েছিল তার গুরুত্বকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ফোকলোরের উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পঠন-পাঠনের আয়োজনটি ছিল ব্যাপক—এজন্য একটি পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বাংলাভাষা অফিস-আদালতে অবাধে ব্যবহৃত হোক এজন্য শহীদ মুনীর চৌধুরী উদ্ভাবিত বাংলা টাইপ মেশিনটিকে জনপ্রিয় করবার উদ্দেশ্য জি. ডি আর-এর অপটিমা কোম্পানীকে আমি আগ্রহী করে তুলি—এই কোম্পা-নীর আমন্ত্রণে ও খরচে কারখানায় গিয়ে মেশিনটিকে আরো সুন্দর ব্যবহার-যোগ্য ও মজবুত করবার চেষ্টা আমি করেছি। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু মুনীর চৌধুরীর পবিত্র স্মৃতি রক্ষার্থে 'মুনীর অপটিমা' নামটিও সেখানে বসেই আমি প্রদান করি। সে সাথে বাংলায় একটি গণনাযন্ত্র নির্মাণের পদ্ধতিও আমি অপটিমা কোম্পানীকে দিয়েছিলাম—তাঁরা সেটি নির্মাণ করেছিলেন।

মুনীর অপটিমাকে জনপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যেই আমি বাংলায় টাইপ ও স্টেনোগ্রাফী প্রশিক্ষণে ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করেছিলাম।

বাংলা একাডেমীর প্রেসটি ছিল অবহেলিত— এখানে বিরাজমান ছিল জীর্ণতা। এই প্রেসটিকে আমি আধুনিক যন্ত্রে সমৃদ্ধ করি। একাডেমীর অর্থে নয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্বজার্মানীর সহায়তায়।

প্রকাশনার ওপরে আমি ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, প্রকাশনার আয় থেকে যেন ধীরে ধীরে বাংলা একাডেমী আর্থিক দিক থেকে বহুলাংশে আত্মনির্ভর হতে পারে। সে উদ্দেশ্য স্বল্প সময়েই কিছুটা সফল হয়েছিল। প্রকাশনার আয়ের প্রবৃদ্ধিই তা প্রমাণ করে।

'উত্তরাধিকার' ও 'ধানশালিকের দেশ' পত্রিকা দু'টো আমিই প্রবর্তন করি—একটি সৃজনশীল সাহিত্যে, অপরটি শিশু-কিশোর সাহিত্যে। গবেষণার ভুবন কেবল প্রসারিত করা নয়, তার সকল জীর্ণতা মুছে সেখানে প্রাণসঞ্চার করা, দেশের প্রখ্যাত গবেষকদের একাডেমীর সঙ্গে একটি মমতাময় সম্পর্কে আবদ্ধ করা এবং উন্নতমানের গবেষণায় প্রণোদিত করা ছিল আমার একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। আমার সময়ে ও পরবর্তীকালে অনেক গ্রন্থে-প্রবন্ধে তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে।

বাংলা একাডেমীর সাংস্কৃতিক কর্মধারায় যে একটি নতুন জোয়ার এসেছিল, ১৯৭৪ সালের ১৪ই থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন তার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং একটি শাখায় সভাপতিত্ব করেন কাজী নজরুল ইসলাম—বিশেষ অতিথি ছিলেন কবি জসিমউদদীন। সোভিয়েত ইউনিয়ন, হাঙ্গেরী, জি-ডি-আর, মঙ্গোলিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশের কবি-সাহিত্যিক সহ দেশের বরেণ্য সাহিত্যসেবী—এই সম্মেলনে যোগদান করে সম্মেলনটিকে সফল করে তুলেন। একুশে ফেব্রুয়ারী এক নতুন ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে।

একাডেমীর নতুন ভবন নির্মাণ ও পুরাতন ভবনের সংস্কারসাধনের কাজটিও আমাকেই হাতে নিতে হয়। নতুন ভবনের সিংহভাগ অসমাপ্ত কাজ আমাকে সম্পন্ন করতে হয়। চারদিকের দেয়াল ভেংগে পড়ে—সেটিও নির্মাণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। গোডাউন ভবনটির নির্মাণ আমার সময়েই প্রায় সমাপ্ত হয়।

মনে রাখতে হবে, আমাকে যখন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় তখন সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশ সমস্যার সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আর্থিক বুনিয়াদ প্রায় ভূলুণ্ঠিত। খাদ্যাভাব ও নানাবিধ অভাবের চাপে ন্যুব্জ-পৃষ্ঠ দেশে বেকারত্বের হাহাকার বিরাজমান। সেই অবস্থার মধ্যেও আমি একাডেমীর গঠনমূলক কাজে দায়িত্ব যতটুকু পালন করেছি, যে-পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছি, তাকে বোধ করি ছোট করে দেখা যায় না। তথাপি আমার যত সাধ ছিল তার বহুলাংশই পূরণ হয় নি—আমার যা কিছু ব্যর্থতা তার জন্যে আমি নিজে এবং আমার সীমাবদ্ধতাই দায়ী। বুক ফুলিয়ে আত্মপ্রশংসার অথবা আত্মতৃপ্তির কোনো অবকাশ নেই, বরঞ্চ সবিনয়ে, আমার ব্যর্থতাই যাঁদের চোখে কেবল ধরা পড়বে, বস্তুনিষ্ঠ বিচারে যেখানে প্রয়োজন, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত হব।

নীলিমা ইব্রাহিম

(ক) আনুমানিক বৎসর কাল আমি বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক পদের দায়িত্বে ছিলাম। তখন বাংলা একাডেমীর একটি ক্রান্তি লগ্ন। সুতরাং আমার দায়িত্ব, কর্তব্য এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য আমি একটি ইভ্যালুয়েশন কমিটি গঠন করি। মরহুম আবদুল গণি হাজারী ছিলেন এই কমিটির চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সদস্য ও বাংলা একাডেমীর পক্ষের প্রতিনিধি সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। মরহুম আবদুল গণি হাজারী তখন হৃদরোগে আক্রান্ত, তবুও বাংলা একাডেমীর কাজ তিনি সর্বশক্তি দিয়ে পালন করেন এবং সুষ্ঠু রিপোর্ট প্রদান করেন। ঐ রিপোর্টে অতীতের ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি যেমন তুলে ধরা হয় তেমনি ভবিষ্যত কর্মপন্থাও নির্দেশিত হয়েছিল। বাংলা একাডেমীর দপ্তরে ঐ রিপোর্ট আজও থাকতে পারে।

ঐ সময়ে ধানমণ্ডির একটি পৃথক বাড়িতে বাংলা একাডেমীর একটি দপ্তর ছিল। বাংলা একাডেমীর কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধান সেখানে সম্ভবপর না হওয়ায় আমি ঐ অফিসকে একাডেমীর মূল ভবনে স্থানান্তরিত করি।

প্রশাসনিক শৈথিল্য দূর করবার জন্য একাডেমীতে এস্টাব্লিসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট চালু করেছিলাম।

একাডেমীর বাংলা টাইপ ও শর্টহ্যাণ্ড ক্লাস এবং বিদেশীদের জন্য বাংলা শিক্ষা ক্লাসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং আমার ধারণা সর্বাধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ঐ সময়ে শিক্ষা গ্রহণ করে।

বাংলাদেশের খ্যাতনামা কয়েকজন সাহিত্যককে সংবর্ধনা দান করা হয়। তবে অর্থনৈতিক অনটনের জন্য বৃহৎ কোনও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি।

(খ) বাংলা একাডেমীর সকল ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল নই। তবুও বাংলা একাডেমীর মান ও গৌরব বর্ধনে যথেষ্ট সক্রিয় বলেই

নীলিমা ইব্রাহিম ১২.৮.১৯৭৪ থেকে ৬.১২.১৯৭৫ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

আমার ধারণা। এক্ষেত্রে গতানুগতিক অনুষ্ঠানের আড়ম্বরের চেয়ে প্রকাশনার প্রসারতা ও উন্নয়ন অধিকতর কাম্য।

বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য একাডেমীর অধিকতর সক্রিয় হওয়া আবশ্যক। অফিস আদালতে শিক্ষাঙ্গণে এ ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগ সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু জরিপের দায়িত্ব গ্রহণ একাডেমীর কর্তব্য বলে মনে করি। এর মাধ্যমে বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশের একটি সামগ্রিক চিত্র আমরা পেতে পারি।

রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে ভুল উচ্চারণ, বিকৃত শব্দ ব্যবহার ইত্যাদিব ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী একটি 'সেল' গঠন করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ওয়াকিবহাল করতে পারে। কারণ বানান, শব্দ গঠন ও বিকৃত উচ্চারণ আজ ভাষার ক্ষেত্রে এক চরম নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছে।

আমাকে এ সংক্ষিপ্ত মতামত প্রকাশের সুযোগ দান করবার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

আপনার ও আপনার প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

আমি স্বল্পকালের (জুন ১৯৭৫—মে ১৯৭৬) জন্যে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের দায়িত্বে ছিলাম। স্বভাবতই ব্যাপকাকারে পরিকল্পনা গ্রহণ-বাস্তবায়নের অবকাশ তেমন পাওয়া যায় নি।

এতদসত্ত্বেও যে কাজগুলি করা গিয়েছিল, সংক্ষেপে সেগুলির উল্লেখ করা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত বলে নিই, এ কয়েকটি বিষয়কে আমি প্রাথমিক গুরুত্বের ভিত্তিতে চিহ্নিত করেছিলাম: ১. সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন, ২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা, ৩. লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহ, ৪. প্রকাশনা ও বিক্রয় বিষয়ে উন্নয়ন।

১. সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন প্রকল্পের অংশ হিসেবে প্রথমত বাংলা সাঁটলিপি লিখন ও মুদ্রালিখন প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেয়া হয়েছিল। বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে গৃহীত ব্যবস্থায় সেই সময়ে প্রচুর সংখ্যক শিক্ষার্থী উক্ত প্রশিক্ষণ আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তার দরুণ অন্তত আপিস-আদালতে বাংলায় কাজ চালু করার ক্ষেত্রে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাটি ফলপ্রসূ হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত পরিভাষা কোষগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনা। তখন সকল মহল থেকেই দাবী আসছিল বাংলা পরিভাষার জন্যে। কাজটি অবশ্য পূর্বেই গ্রহণ করা হয়েছিল, তবে জানাই যে, উল্লিখিত কালে কতিপয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিভাষা কোষগ্রন্থ প্রস্তুত ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়। যেমন—'প্রশাসনিক পরিভাষা কোষ', 'বাণিজ্য পরিভাষা কোষ,' 'আন্তর্জাতিক আইন পরিভাষা কোষ,' ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচচশিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে সমাজবিজ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়েও পরিভাষা কোষগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছিল।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ৬.৬.১৯৭৫ থেকে ৫.৫.১৯৭৬ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

২. বাংলা ভাষা-সাহিত্যের গবেষণাকর্ম অব্যাহত রাখা এবং উৎসাহিত করবার লক্ষ্যে বিশেষ করে তরুণ গবেষকদেরকে একাডেমীর গবেষণা-প্রকল্পসমূহের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল।

ঐ সময়ে বর্ধমান হাউসের দোতলায় 'শহীদুল্লাহ গবেষণা কক্ষে'র উদ্বোধন করা হয়। একাডেমী কর্তৃক সংগৃহীত প্রচুর সংখ্যক দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা, পুস্তক, দলিল ইত্যাদি গবেষণা উপকরণের সংগ্রহশালা রূপে 'শহীদুল্লাহ গবেষণা কক্ষ' সংগঠিত করা হয়েছিল।

৩. দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা একাডেমী দেশের লোকসাহিত্য ও লোক-সংস্কৃতিব উপকরণ সংগ্রহ করে আসছে। সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল। আলোচ্যকালে উপকরণ সংগ্রহের পাশাপাশি সংগৃহীত ছাড়া, গান, গীতিকা, গাথা, কাহিনী, উপকথা ইত্যাদি নিয়ে গবেষণার প্রচুর কাজ করা হয় এবং বেশ কয়েকটি সম্পাদিত সংকলন প্রকাশ করা হয়।

৪. পুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রয় বিষয়ে এ স্বল্প সময়ে কয়েকটি উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হয়েছিল, যেমন—

১. বাংলা একাডেমীর প্রকাশিত বই-পুস্তক বিক্রয় বৃদ্ধির পদক্ষেপ হিসেবে শিক্ষা বিভাগের সহায়তায় দেশের সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে (পি.টি.আই-এ) একাডেমীর ১ সেট করে বই বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এতে শুধু বই বিক্রিই হয়নি সেই সঙ্গে বইয়ের প্রচারও ব্যাপক বৃদ্ধি পায়।

২. প্রকাশনা কর্মে দক্ষ কর্মী তৈরীর লক্ষ্যে ইউনেসকোর পক্ষে জাপানের এশিয়ান কালচারাল সেন্টার ও বাংলা একাডেমীর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় প্রায় ৩ সপ্তাহ ব্যাপী 'পুস্তক প্রকাশনা প্রশিক্ষণ কোর্স' নামে এক উন্নতমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এতে জাপান, সিঙ্গাপুর, ভারত ও ইরান থেকে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ দান করেন। একাডেমীর কয়েকজন কর্মকর্তাসহ দেশের অন্যান্য সরকারী বেসরকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা কর্মীরাও এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

বাংলা একাডেমীর বর্তমান কার্যক্রম উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা হিসেবে উত্তম বলে বিবেচনা করি। প্রতিষ্ঠানের কর্মিরা বাংলা ভাষা সাহিত্যের গবেষণাকর্ম, বাংলার লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির নূতন নূতন ভাণ্ডার আবিষ্কার, বাংলা ভাষায় উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, অভিধান সংকলন, এসব কাজে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আমি তাঁদের সাফল্য কামনা করি।

একটি কথা কেবল স্মরণ করতে চাই—রবীন্দ্রনাথ যেমনটি বলেছিলেন, আমরা আরম্ভ করিতে জানি, সমাপ্ত করিতে জানি না—একাডেমী কর্তৃপক্ষ সেই দিকে খেয়াল রাখলে ভাল হয়।

আরেকটি জিজ্ঞাসা—যেন মনে হয়, তুলনামূলকভাবে আনুষ্ঠানিক আয়োজনসমূহের ক্ষেত্রেই আকর্ষণটা বেশি; এ আকর্ষণ হ্রাস করে কী পরিকল্পিত কাজগুলো অধিকতর দ্রুততায় সমাপ্ত করা যায় না?

আশরাফ সিদ্দিকী

আমি জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক পদে যোগদান করি ৪ঠা জুন, ১৯৭৬ এবং দায়িত্বভার অর্পণ করি ৩০শে জুন ১৯৮২। যোগদান করি বলা যায় না—যোগদান করতে বাধ্য হই। সেজন্য বাংলা একাডেমীর এই পদে যোগদান করার পরেও প্রায় বৎসর কাল সাবেক অফিস জেলা গেজেটিয়ারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়।

বাংলা একাডেমীতে আমি পূর্বেও ছিলাম (১৯৫৯-'৬০) এবং বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে পরিচালক পদে ছিলাম ১৯৬৮-১৯৭২ পর্যন্ত। কাজেই সমন্বিত একাডেমীর সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম না এমন নয়। যোগ-দানের পর দেখলাম সমস্যা অন্তহীন এমনকি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মহা-মূল্যবান সম্পত্তিও বেদখল। প্রধানতঃ অর্থের সমস্যা, বেতন দেওয়ার সমস্যা, স্থান সংকুলানের সমস্যা—সরকার ঘোষিত "সারপ্লাস" সমস্যা।

একাডেমীব তৎকালীন নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দের সঙ্গে দিনের পর দিন আলোচনা এবং সরকারের সঙ্গেও বারবার বৈঠকের পর আমরা সিদ্ধান্তে আসি একাডেমীর অধ্যাদেশ ও বিধিমালা অনুযায়ী নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যবৃন্দ দ্বারা গণতান্ত্রিকভাবে একাডেমীর পরিচালনা সম্ভব হলে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এর সমস্যার সমাধান সম্ভব হ'তেও পারে। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও একাডেমীর নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং এর সকল কর্মধারা সম্মানীয় নির্বাহী পরিষদের সহৃদয় সহযোগিতা এবং পরামর্শক্রমেই হ'তে থাকে। নির্বাচনের পর প্রতি বছরই যথাসম্ভব বার্ষিক সভাও অনুষ্ঠিত হয় মনে পড়ছে এবং নির্বাচনও যথারীতি সুচারুভাবেই সম্পন্ন হয়।

এই ভূমিকার প্রয়োজন ছিল এই জন্য যে—আমার যোগদানের পর একাডেমীর কর্মধারা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় এবং এর ব্যর্থতা বা সার্থকতা সম্পূর্ণভাবেই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। ১৯৭৬-৮২

আশরাফ সিদ্দিকী ৪.৬.৭৬ থেকে ৩০.৬.৮২ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

পর্যন্ত সমুদয় পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের রিপোর্ট আমার হাতের কাছে নেই—বার্ষিক রিপোর্টে এসব বিবরণ মুদ্রিতভাবেই আছে এবং একাডেমীর পত্র পত্রিকায়ও সমুদয় বিবরণ থাকা বিচিত্র নয়। স্বভাবতঃই আমার স্মৃতির উপর নির্ভর করা ছাড়া এক্ষেত্রে উপায় নেই।

১. বাসস্থান সমস্যা—একাডেমীর প্রেস দালানের চতুর্থতলা যথাসম্ভব সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মচারীদের বসার সমস্যার সমাধান করা হয়। বেদখলকৃত স্থান (বাহুবলেই) অধিকার করা হয়।

২. নির্মীয়মান গুদাম ঘর সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

৩. পুরাতন একাডেমী ভবন মেরামতের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

৪. পুকুর ভরাটের কাজ সত্বর করে একাডেমীতে আরও স্থান সংকুলানের চিন্তা ভাবনা ও কাজও করা হয়।

৫. প্রেসকে যথাসম্ভব স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে তা আলাদাভাবে পরিচালনার (ফ্যাকটরি আইন) ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এর অফসেট বিভাগ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা যথাসম্ভব দূর করে তা বাণিজ্যিকভিত্তিতে পরিচালনার ব্যবস্থাও নেওয়া হয়।

৬. একাডেমীর আয় বাড়াবার লক্ষ্যে একুশে, নববর্ষ ও অন্যান্য বিশেষ দিনগুলোতে বই মেলা বা গ্রন্থ বিক্রয়ের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে জোরদার করা হয়।

৭. বাংলা একাডেমীর গ্রন্থমেলাকে বিভিন্ন আঞ্চলিক সম্মেলনে প্রসারিত করা হয় এবং এক্ষেত্রে প্রকাশনা-বিক্রয় বিভাগের প্রচেষ্টা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এইসব গ্রন্থমেলায় এবং বিভিন্ন জেলার প্রশাসকদের কাছে একাডেমীর কর্মকর্তারা ও মহাপরিচালক নিজেও বারবার গিয়েছেন এবং তাতে সুফলও ফলতে থাকে। 'দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ'—এমন একটা মনোভাব একাডেমীতে এসেছিল বলে মনে করার কারণ ছিল।

নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটি এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত উপকমিটি গ্রন্থ প্রকাশনার বিষয়ে যেসব উপদেশ রাখেন সেভাবেই প্রকাশনার কাজ অগ্রসর হয়। তাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ মতেই—

১. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় টেকস্ট বই।
২. রেফারেন্স বই
৩. গবেষণা গ্রন্থ
৪. শিশুসাহিত্য
৫. অনুবাদ
৬. লোক সংস্কৃতি যাদুঘর প্রতিষ্ঠা

ইত্যাদি কর্মধারা গ্রহণ করা হয়। সরকারের প্ল্যানিং বিভাগের বারবার অর্থসঙ্কোচন নীতি, প্রকাশনার ব্যয়ভার বৃদ্ধি, অফিস পরিচালনার বিভিন্ন খরচ বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা অসুবিধার মধ্যে নির্বাহী পরিষদকে কাজ করতে হয়েছে। লক্ষ্য মাত্রায় পেঁছিতে না পারলেও গ্রন্থ প্রকাশ (চারটি পত্রিকা সহ) সন্তোষজনক ছিল বলে বিশ্বাস করি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, একাডেমীর হাতে পূর্বগৃহীত কয়েক শত পাণ্ডুলিপিও উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তায়। পুরাতন গৃহীত পাণ্ডুলিপিও (৯/১০ বৎসর বা তার পূর্বের) ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত একাডেমীর পদোন্নতি বন্ধ থাকায় কর্মচারীদের মধ্যে স্বভাবতঃই অসন্তোষ বিরাজ করতে থাকে। নির্বাহী পরিষদ অনেকটা নিজেদের দায়িত্বে এ সময় প্রায় একশত কর্মচারীর পদোন্নতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 'সারপ্লাসের' বিষয়টিও সদস্যবৃন্দ অত্যন্ত সাহসিকতা ও সুচিন্তার দ্বারা বিভিন্ন বিভাগে সুবিন্যাসের মধ্য দিয়ে সুরাহা করেন। এসব কর্মধারার স্বার্থে অহেতুক খরচ কমানোর পরও নিতান্ত যা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল—নির্বাহী পরিষদ ও বার্ষিক সাধারণ সভার সার্বিক অনুমোদন সত্ত্বেও সে অর্থ পাওয়া একাডেমীর পক্ষে কখনই সম্ভব হয় নি। এজন্য প্রকাশনার স্বার্থে নির্বাহী পরিষদ বাইরের প্রকাশনা সংস্থার সহযোগিতায় গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা নেয়। এভাবে বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

বস্তুত পক্ষে—বলা যেতে পারে, একাডেমীর যা অর্থ সামর্থ্য ছিল তার ভিত্তিতে সে পরিপূর্ণভাবে সার্থকতারই দাবীদার। মনে রাখতে হ'বে এ সার্থকতার দাবীদার নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য এবং নিবেদিতপ্রাণ কর্মচারীবৃন্দও।

গ্রন্থাদি বিক্রয়ের সুবিধার্থে নির্বাহী পরিষদ চট্টগ্রামে একটি বিক্রয় কেন্দ্র খোলে। এ বিক্রয় কেন্দ্র অন্যান্য বিভাগীয় সদরে খোলার জন্যও বার্ষিক

সাধারণ সভার অনুমোদন ছিল। এজন্য নামমাত্র ভাড়ায় খুলনা, যশোহর, সিলেট ও বরিশালে পরিত্যক্ত বাড়ির চেষ্টা নেয়া হয় এবং কোন কোন স্থলে পাওয়াও যায়, কিন্তু তার পূর্বেই আমার কার্যকাল শেষ হয়।

বাংলা একাডেমীর বর্তমান কার্যক্রম সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নই। এই প্রতিষ্ঠানে সব মিলিয়ে প্রায় এক যুগের মত কাল অবস্থান করলেও আমি প্রতিষ্ঠান ছাড়ার পর কোন উপদেষ্টা কমিটিতেই আমার স্থান হয় নি। জীবনের যে দীর্ঘকাল এর সুখ-দুঃখের অংশীদার ছিলাম—সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আরও নিবিষ্টভাবে জড়িত থাকতে পারলে এ সম্বন্ধে মতামত দেওয়া সুখকর হ'ত। হয়তো এই বেদনা প্রাক্তন কর্মকর্তাদের বেলায়ও প্রযোজ্য হ'তে পারে। এও এক নিয়তি।

বাংলা একাডেমীর কার্যক্রম সম্বন্ধে আমার মোটামুটি বক্তব্য :

১. শহীদের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে একাডেমী অধ্যাদেশের ধারামতে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হোক এবং নিয়মিতভাবে সাধারণ নির্বাচন ও বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হোক।

২. গণতান্ত্রিক ধারায় নির্বাহী পরিষদ একাডেমীর কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং অযথা সরকারী হস্তক্ষেপ প্রোথিত হ'বে না।

৩. একাডেমী কি সিদ্ধান্ত নেবে তার দাবীদার হবে নির্বাহী পরিষদ—একমাত্র নির্বাহী পরিষদ।

৪. আশা করছি—তেমন পরিষদ সর্বস্তরে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে উপযুক্ত গ্রন্থাদি, উচ্চমানের গবেষণা পুস্তক, অনুবাদকর্ম—ইত্যাদি পরিচালনার সহায়তা করবেন।

৫. ভগ্নি-স্থানীয় যে সব প্রতিষ্ঠান তাদের নির্ধারিত কর্মধারা চালিয়ে যাচ্ছে—তাঁদের সঙ্গে বারবার আলোচনার মাধ্যমে একই কর্মধারার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা সমীচীন মনে করি। শিশু একাডেমী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বা শিল্পকলা একাডেমীর কাজ সুচিন্তা এবং প্রজ্ঞার সঙ্গে তারাই করতে থাকুক---একাডেমী সর্বস্তরে ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন, গবেষণা, মুদ্রাক্ষরিক যন্ত্রের উন্নয়ন, বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষকদের বক্তৃতামালা—ইত্যাদির ব্যবস্থা নিতে পারে। অর্থাৎ একাডেমীর কাজ হোক একাডেমিক।

৬. কোলাহল বা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আনন্দ মেলা কমিয়ে একে জাতীয় চিন্তা-চেতনার ভাবগম্ভীর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চিন্তা-ভাবনা নেয়া যেতে পারে নাকি ?

৭. বর্তমান বিশ্বে জাতীয়তাবাদের স্বার্থেই তার প্রাচীন সাহিত্য, লোক সংস্কৃতি ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য দেয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে বিদেশী সংস্থার অর্থ সহযোগিতায় এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা ও অধিক প্রকাশনার উপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

৮. একটি মহান জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে মহান ভাষা-আন্দোলনের ফলশ্রুতি যে মহান প্রতিধ্বনি, তার কর্মচারীদের দায়িত্ব বোধ, শালীনতা এবং মহানুভবতা যাতে সকল দলাদলির উর্ধ্বে থাকে তা কর প্রদানকারী এদেশের সকল দুঃখী জনতারই কাম্য এবং আমারও কাম্য।

-

জনাব মনজুরে মওলা ৩১.১২.১৯৮২ থেকে ১১.৩.১৯৮৬ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সাক্ষাৎকার বিলম্বে পাওয়ায় তা প্রকাশ করা সম্ভব হলো না।

বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩

৩ ডিসেম্বর ১৯৮৬

স্বাগত ভাষণ

প্রতিষ্ঠা দিবস ভাষণ

সভাপতির ভাষণ

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

পরম সম্মানিত সভাপতি, প্রতিষ্ঠা-দিবস ভাষণের শ্রদ্ধেয় বক্তা, বাংলা একাডেমীর সম্মানিত ফেলো, জীবন সদস্য ও সদস্যবৃন্দ, কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ, প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, উপস্থিত সুধীমণ্ডলী,

বত্রিশতম প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে আয়েজিত বাংলা একাডেমীর এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। যে-অকুতোভয় সৈনিকদের অবিস্মরণীয় আত্মদানে এই অনন্য প্রতিষ্ঠানের উত্থান, সেই অমর শহীদদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে একাডেমীর পক্ষ থেকে ও আমার নিজের পক্ষ থেকে জ্ঞাপন করি গভীর শ্রদ্ধা।

সুধীবৃন্দ

এ কথা আজ সর্বজনবিদিত-যে আত্মসম্ভ্রমবোধ ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৫২ সালে যে-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্বোধন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের রক্তাক্ত উন্মেষে তার পরম পরিণতি। বাংলা একাডেমী এবং বাংলাদেশ কারো করুণার দান নয়। উভয়তই চূড়ান্ত আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে সাফল্য, সে কারণে বাংলা একাডেমীর সঙ্গে এদেশের আপামর জনসাধারণের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা তার জন্মলগ্ন থেকেই অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে জাতি তার মানসজীবনে গৌরবের দৃঢ়তর ভিত্তি খুঁজে পাবে—এই ছিলো প্রথম পর্যায়ে বাংলা একাডেমীর প্রধান লক্ষ্য। খুব স্বাভাবিক-যে ১৯৫৫ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার এই প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো রচনার দায়িত্ব এমন একজন কর্মকর্তাকে অর্পণ করেন যাঁর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও বাংলা সাহিত্যে অবদান ছিলো প্রশ্নাতীত। অব্যবহিত পরবর্তী-কালে এদেশের আরেক কৃতী সন্তান একাডেমীর প্রথম পরিচালক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। খ্যাতনামা সাহিত্যিক জনাব মোহম্মদ বরকতুল্লাহ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক—দুজনেই

আজ লোকান্তরিত। তাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ কোনোদিন শোধ হবার নয়।

সুধীবৃন্দ

আজ বাংলা একাডেমীর বয়স একত্রিশ বছর পূর্ণ হলো। এই সুদীর্ঘ সময়ের পটভূমিতে একাডেমীর সিদ্ধি ও ব্যর্থতার প্রশ্ন অবশ্যই উত্থাপিত হতে পারে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়-যে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রাপথ, অন্তত ঔপনিবেশিক আমলের ষোলো বছর, আদৌ কুসুমাস্তীর্ণ ছিলো না। সুখের বিষয় নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাংলা একাডেমী তার প্রতিশ্রুত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় নি। সার্বক্ষণিক প্রতিকূলতার ভেতরেই এখানে নীরবে জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন পণ্ডিত ও গবেষকবৃন্দ। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিয়মিত অর্থাভাব ছিলো, ছিলো অবিরাম হস্তক্ষেপ, তথাপি একাডেমী একনায়কের অভিরুচির কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। দখলদার বাহিনীর জ্বলন্ত ক্রোধ তার অন্যতম লক্ষ্যস্থল হিসেবে ২৫শে মার্চের ভয়াবহ রাতে একাডেমী ভবনকে তাই নির্ভুলভাবেই সনাক্ত করেছিলো।

ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে উত্থিত স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত হবার পর স্বভাবতই বাংলা একাডেমীর দায়িত্ব ও কর্মপরিধি সংপ্রসারিত হয়। ভাষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিভিন্নমুখী কার্যক্রম যেমন অব্যাহত থাকে, তেমনি জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলা প্রবর্তনের লক্ষ্যে গৃহীত হয় একাধিক প্রকল্প। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চার পথ উন্মুক্ত করার জন্যে আইন, সমাজ-বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা, প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্ব অনিবার্যভাবেই একাডেমীর ওপরে ন্যস্ত হয়। উল্লেখ্য-যে গত পনেরো বছর বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণের জন্যে একাডেমী থেকে পাঁচশত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এবং আরো তিন শত বই বর্তমান পঞ্চবার্ষিক প্রকল্পের আওতায় প্রকাশনাধীন। বাংলা মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের যে কী-বোর্ড শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী উদ্ভাবন করেছিলেন তার উন্নয়ন এবং বৈদ্যুতিকীকরণের লক্ষ্যেও একাডেমী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অফিস-আদালতে বাংলা মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের ব্যবহার যাতে আরো ব্যাপক ও

সুগম হয়, সেজন্য একাডেমীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে নিয়মিত প্রশিক্ষণ। অনুরূপ উদ্যোগ বাংলা সাঁটলিপি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও গৃহীত হয়েছে। একদা মাতৃভাষার অবমাননায় আত্মাহুতি দিয়েছিলেন আমাদের সাহসী সহোদরগণ, সেই বিয়োগান্ত ঘটনার স্মৃতি আমাদের আবেগ-জীবনে এখনো অম্লান। এবং আমাদের সকল কর্মকাণ্ডে বাংলা ভাষাকে প্রাপ্য মর্যাদা অর্পণের মাধ্যমেই সেই অমর শহীদদের প্রতি আমরা যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারি। শিক্ষা, প্রশাসন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মাতৃভাষার নিঃসপত্ন স্বীকৃতি অর্জন তাই একান্ত জরুরী।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

আমি জানি, বাংলা একাডেমীর কাছে আপনাদের প্রত্যাশা অপরিমেয়। এবং তা অহেতুক নয়। সমগ্র দেশে এমন আর কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যার হৃদয়তন্ত্রীতে জাতির সাংস্কৃতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এতো নিবিড়ভাবে স্পন্দিত হয়। অনুরূপভাবে একাডেমীও সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে সহজেই কামনা করে নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা। একথা সত্য-যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান সাধারণত বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতোই সচল ও কল্লোলিত জীবন-প্রবাহ থেকে দূরবর্তী অবস্থান গ্রহণ করে। সুখের বিষয়, গণ-মানুষের স্বপ্ন-সঞ্জাত বাংলা একাডেমীর ভূমিকা সেই স্বার্থপরতায় কলঙ্কিত হয় নি। এই সুযোগে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই সেইসব শিক্ষক, লেখক, কবি, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও পেশাজীবীকে যাঁরা আমাদের সকল সফল কর্মোদ্যোগে অংশ নিয়েছেন বারবার। ব্যর্থতার দায়ভাগ মেনে নিতে লজ্জা নেই ; তা ভবিষ্যতের জন্যে নিশ্চয় অধিকতর সতর্ক ও সাবধান হতে শেখাবে আমাদের। আমার বিশ্বাস অদূর আগামীতে একাডেমীর কার্যক্রম আরো অনেক দূর বিস্তৃত হবে এবং তখনো কারো সহানুভূতি থেকে আমরা বঞ্চিত হবো না।

সুধীবৃন্দ

আমরা চাই ভবিষ্যতের বাংলাদেশে বাংলা হবে সকল সাংস্কৃতিক প্রগতির অপরিহার্য বাহন। মাতৃভাষার মাধ্যমে আমাদের জাতীয় মেধা পাবে নিঃসঙ্কোচ ও সাবলীল অভিব্যক্তির অবারিত সুযোগ। সৃজনশীলতার বিভিন্ন অঞ্চলে

উন্মোচিত হবে অবরুদ্ধ কল্পনার সহস্র অর্গল। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানে, কৃষি ও চিকিৎসায়, প্রকৌশল ও সমাজ চিন্তায় আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রত্যেক পদক্ষেপ হবে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। এবং সেই অভীষ্ট অর্জনের জন্যে বাংলা একাডেমীকে আরো যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। গ্রহণ করতে হবে আরো অনেক নতুন প্রকল্প---এমন সব প্রকল্প যার বাস্তবায়নের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডারে আমাদের প্রবেশ হবে সহজসাধ্য, বিশ্ববিদ্যা-সঞ্চয়ে আমাদের অধিকার পাবে অনায়াস স্বীকৃতি। সেই শুভদিনের জন্যে হয়তো দীর্ঘ প্রতীক্ষার পথ পার হতে হবে, কিন্তু নিরলস শ্রম ও ঐকান্তিক সাধনা আমাদের অনন্য পাথেয়। তাই জয় আমাদের অনিবার্য।

সুধীবৃন্দ

আজকের এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণে সম্মত হয়ে প্রফেসর মুহম্মদ শামসউল হক বাংলা একাডেমীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার মনোভাবই ব্যক্ত করেছেন। তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। প্রবীণ কথাশিল্পী শওকত ওসমান আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে প্রস্তুত করেছেন প্রতিষ্ঠা-দিবস ভাষণ। তাঁর কাছে আমরা ঋণী হয়ে রইলাম। সবশেষে আমার নিবেদন, এই অনুষ্ঠানের ত্রুটি-বিচ্যুতির যাবতীয় দায়িত্ব আমার, এর যেটুকু সাফল্য তার সাথে যুক্ত আছে একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের পরিকল্পনা ও নির্দেশ এবং আমার প্রিয় সহকর্মীদের কর্মদক্ষতা।

সুধীবৃন্দ, আপনাদের সবাইকে আমার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ।

শওকত ওসমান

বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের সমাগত অনুরাগীবৃন্দ,

বত্রিশতম এই প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে ভাষণ-দানের আমন্ত্রণের জন্য আমি বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ও পরিষদের সদস্যদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এড়িয়ে যেতে অক্ষম।

বাংলা একাডেমী কী প্রাতিষ্ঠানিক একটি নাম-মাত্র? না। এই নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ইতিহাস অতীতের অযুত নরনারীর যৌথ কণ্ঠস্বররূপে দুদ্দাড় আমার কানে আছড়ে পড়ে। এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের এক পবিত্র জ্ঞানপীঠ যার প্রাঙ্গণে ঐতিহ্যের বহু দিকশূল সারি সারি প্রোথিত। এমন স্থানে আমার মত নগণ্য সাহিত্যসেবীর দাঁড়াতেও পায়ে কম্পন লাগে, তরঙ্গিত হয় বুক। অন্যদিকে আন্তরিকতার অমর্যাদা কোন শোভন ব্যাপার নয়। তাই আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেওয়ার সাহস হয় নি।

এই প্রাঙ্গণ থেকেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি রচনার সূত্রপাত। মজ্‌কুর এলাকা আর পূর্ব-পাকিস্তান নয়। ইতিহাস রায় দিয়ে বসে আছে। আমার আর কিছু যোগ করা বাহুল্য।

কিন্তু এই চত্বরে আমরা সহজে হাজির হতে পারি নি। অশ্রু, রক্ত ও বহু দুঃখের দরিয়ায় সাঁতার দিতে হয়েছিল তৎপূর্বে। সালাম, বরকত, জব্বার এবং অ-নামা বহু শহীদের আত্মতর্পণ আমরা ভুলে যাই নি। কারণ, ভুলে যেতে অক্ষম। ইতিহাসের কতো দিকশূল অনির্বাণ মশালের মতো না তাঁরা পুঁতে গেছেন ভবিষ্যৎ চলা-পথের সমতলে। মনুষ্যত্বের বহু সবক ত শহীদদের কল্যাণেই পাওয়া। এই ভূখণ্ডের অধিবাসী ১৯৭২ সনে উপলব্ধি করেছিল : স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। মাতৃভাষার সর্বস্তরে ব্যবহারের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা কোন স্বতন্ত্র ব্যাপার নয়। আরো জেনেছিল এই মুল্লুকের অধিবাসীগণ, নিরস্ত্র রিক্ত হস্তের মুঠির উপর নির্ভর করেই যে-কোন হাতিয়ারের—হোক না তা আধুনিক মারণাস্ত্র—মোকাবিলা সম্ভব। মর্মতেজ বা মর্মশক্তির নিকট চামুণ্ডা পেশী-শক্তি শেষ পর্যন্ত নতি-স্বীকারে বাধ্য। ১৯৫২ সনের পাকিস্তানী

শাসকগোষ্ঠী নরহত্যা-মারফৎ মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে জবরদস্তি প্রয়োগ করেছিল। উনিশ বছর পরে ১৯৭১ সনে আরো বিরাট পর্যায়ে দিগ্‌বিদিক তাদের হিংস্র মূর্তি আমরা দেখলাম, বুকফাটা আহাজারী-সিক্ত ধর্ষিতা জননী-ভগিনীর ধূলিশয্যায়; মানুষের পুরুষানুক্রমে বহু যুগের মেহ্‌নতে-গড়া লুণ্ঠিত, অগ্নিদগ্ধ মাথা-গোঁজার আশ্রয়-স্থলে জলে-জাঙ্গালে মাঠে-ময়দানে গণ-কবরের অন্ধকার আদিম স্তব্ধতায়। সেদিনও হানাদারেরা কওমীভা'য়ের লেবাস এবং পরিচয় ত্যাগ করে নি। তারপর থেকে আমরা জানলাম, না, শিখলাম: কেবল কয়েকটি আচার-উপাচারের মিল বা সাযুজ্যে ভাই তৈরী হয় না। মনুষ্যত্বের আরো অন্যান্য উপাদান লাগে তৎসঙ্গে। কওমী লেবাস এবং ধুয়া ছিল জালেমদের ছদ্মবেশ—আর এক রকমের মুখোশ।

এমনতর কঠিন সবক এই প্রাঙ্গণ থেকেই দেশবাসির পাওয়া। ইতিহাসের সারি সারি দিকশূল-মশাল এখানে সাজানো যেন সহজে আমরা দিশাহারা, দিকশূন্য না হই।

সত্য-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সত্যের সৈনিক হওয়ার এমন হদিস বাংলাদেশে আর কোথায় মিলবে? এখান থেকে কতো রকমের শিক্ষাই না পেলাম।

ভাষা-আন্দোলনের কালে অনেক মিষ্টি কথা চালু করেছিল তদানীন্তন শাসনদণ্ডধারী বরকন্দাজের দল। কী চমৎকার আপাতমঙ্গলের আহ্বান: বাংলাভাষা হিন্দু, মালাউন কাফেরের ভাষা, হিঁদুয়ানি-চর্বিত ওই জবানের নিকটে থাকা মানে কালে কালে মুসলমানত্ব গায়েব।

ধর্মচ্যুতির এমন আতঙ্কও সেদিন সরল জনসাধারণের ভেতর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রচারণা মারফত। প্রচার-যন্ত্রের মালিকও তারাই। আবহমান কাল থেকে চালু আছে বাঙলা প্রবাদ: "দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় ভুলো না।" এই প্রাঙ্গণ থেকে আমরা এক মোক্ষম সবক পেলাম। প্রবাদের ঈষৎ হেরফের। কিছু যোগ-বিয়োগ: "দুষ্ট লোকের মিষ্ট নীতিবাক্যে, শাস্ত্র-বাক্যে ভুলো না।"

অবিশ্যি দৈনন্দিনতার প্রবাহ এবং সমাজের শত্রুদের ভোল-পাল্টানো ভোজবাজিতে অনেক সময় মানুষ ইতিহাসের শিক্ষা ভুলে যায়। একদা যারা বাংলা ভাষাকে কাফেরী-জবান ব'লে প্রচারের জন্যে গলায়-গর্দানে তাগদ সঞ্চয় করেছিল, তারা আর জন-সমক্ষে তেমন উচ্চারণের সাহস পায় না।

তাই ব'লে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে—এমন ধারণা ভুল। পিঠের ব্যথা পেটে যেতে পারে। তখন চিকিৎসকগণ তার অন্য নামকরণ করে। কিন্তু ব্যথা ব্যথাই। সুস্থ শরীরের শান্তিহারী।

রাজাকার শব্দটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকাল থেকে বহু পরিচিত। তারা ছিল পাকিস্তানী সৈন্যদের আজ্ঞাবহ গোলাম, কেউ কেউ বন্দুক বা অন্য অস্ত্রধারী—অথবা নিরস্ত্র। এদের রাজনৈতিক রাজাকার বলা চলে। কিন্তু আরো এক ধরনের রাজাকার ছিল তখন। তাদের আখ্যা দেওয়া যায় "সাংস্কৃতিক" রাজাকার। তাদের হাতে অস্ত্র ছিল না। ছিল কলম পেন্সিল তুলি ক্যামেরা ইত্যাদি। কিন্তু দুই শ্রেণীর রাজাকার-ই সুবাদে যমজ সহোদর। একে অপরের পরিপূরক। 'পেশাদার খুনী হত্যা করে' কিন্তু খুনের প্রেরণা যে যোগায়, সে অস্ত্রহীন হলেও বিচারে তার অপরাধ কী লঘু করে দেখা হয়? সাংস্কৃতিক রাজাকার পূর্বে ছিল, এখনও আছে। তবে তারা ভোল পাল্টে ফেলেছে। তাদের চেনা এখন সহজ নয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী শুধু নয়, সকল দেশপ্রেমিকের সতর্ক দৃষ্টি লাজেমী-ভাবে এই দিকে জাগ্রত থাকা উচিত। ভাষা-আন্দোলন কালের মুখোশ-হীন নগ্নমূর্তি ওই রাজাকারদের আমরা আর দেখব না। কিন্তু তারা ডাইনোসোরের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এমন ধারণা ভুল। চিন্তা, ভাবাদর্শের পরিণাম শেষ পর্যন্ত সংঘাত এবং কর্মময়তা বা অ্যাকশান। পরিস্থিতি-গুণে আদর্শ খুনের উত্তেজনা যোগায় বৈকি। কবি সাহিত্যিক নাট্যকার সুরকার শিল্পী প্রমুখ সকল সংস্কৃতি-কর্মী কৃতকর্মের পরিণাম মনে রেখেই নিজ-নিজ সাধনায় ব্যাপৃত থাকবেন—দেশবাসী তা-ই প্রত্যাশা করে। চোখ এমনভাবে খোলা থাকলে নিজের ভুল সংশোধন অনেক সহজে হতে পারে।

প্রশ্ন ওঠা সমীচীন, ভাষার উপর শাসকসম্প্রদায়ের এমন চোটপাট কেন? তার উৎস কোথায়? দলবদ্ধ প্রাণীর মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত, মেহনৎ এবং ভাষাব দৌলতে। রবীন্দ্রনাথের কথায়, ভাষার মত জীবনে-জীবন-যোগ-করার এমন হাতিয়ার, অন্য প্রাণী পায় নি। হৃদয়সংবাদ বহনের এই যন্ত্র গোটা সমাজে ও সামাজিক কাজে সংহতি দান করে। কিন্তু এখানে স্ববিরোধ এসে পড়ে। সেই স্ববিরোধের মাশুল মানুষকেই দিতে হয়, অন্য কোন জীবকে নয়। দলবদ্ধ জীব মানুষ। ব্যক্তি-মানুষ সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টি। ভাষার

জন্যই গোটা সমাজ তার মনের মধ্যে হারিয়ে যায়। এখানে 'হারিয়ে যায়' অর্থ জায়গা পায়। তার সম্ভব ভাষার মত সংকেত—ইংরেজীতে কোড (code) —থাকার ফলে। অন্যদিকে দলের মধ্যে ব্যক্তি-মানুষ হারিয়ে যায়। ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব মানুষের অস্তিত্বের একটি শর্ত। এই দ্বন্দ্ব-নিরসনে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে ভাষার ভূমিকা, চারুশিল্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ-তাত্ত্বিকদের ভাষায় Socio-linguistic relation বা সমাজভাষিক সম্পর্ক ইতিহাসের অন্যতম চালিকা-শক্তি। পাকিস্তানের দণ্ডধরগণ এবং তাদের পূর্বপাকিস্তানী এজেন্টরা বিন্দুমাত্র ভুল করে নি সমাজের যথা-নাজুক স্থানে ঘা দিতে। মেরুদণ্ড ভেঙে দিলে যে-কোন জীবের নড়াচড়ার ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। ভাষা সমাজ-দেহের অত্যন্ত প্রাণবাহী কেন্দ্র। তা ভেঙে দিতে পারলে যে-কোন সমাজের মানুষ আর সংহতি খুঁজে পাবে না। বিচ্ছিন্ন বুদ্বুদের মধ্যে নিরেট, কংক্রিট আর কী পাওয়া যাবে? এমন ক্ষেত্রে মানুষ হয়ে পড়ে আজ্ঞাবাহী গোলাম বা বাক-বিশিষ্ট রবোট (robot)। দেশের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে কোন দেশপ্রেমিক উদাসীন থাকতে পারেন না। থাকা কর্তব্যের ত্রুটি। আমি আরো যোগ করব: মনুষ্যত্বের বিচ্যুতি।

ইংরেজ colonialist বা উপনিবেশবাদীরা ফার্সির জায়গায় ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা খামখা বানায় নি। এক শ' সাতাশি বছর এই উপমহাদেশ পরাধীন হয়ে রইল, ইংরেজ যেখানে প্রভু। উপনিবেশ-ত্যাগের সময় তারা পাঁয়তারা কষা শেষ প্রস্থান-পদাঘাত দিয়ে গেল। তার যন্ত্রণা আমরা ভোগ করছি স্বাধীন-তার পর আজও। বিদেশী পুঁজি-খাটানোর সুড়ং তারা কেটে গিয়েছিল রাজনৈতিক চাল-মারফৎ।

ভাষা আপাতত শ্রব্য ক'টা শব্দ-সমষ্টি নয়। ইতিহাসের সড়কে আরো কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে গেলে একই দৃশ্য দেখা যায়। বঙ্গদেশের পাঠান সুলতানদের আমলে বাঙলা সাহিত্যের বেশ বিস্তার ঘটেছিল রাজকীয় প্রেরণায়। হোসেন শাহ ও পরবর্তী আমলে সুলতানেরা নেহাৎ গরজে বাঙলা-ভাষা প্রেমিক হয়েছিলেন। ইতিহাসের পদক্ষেপ ব্যক্তির অগোচরেই হয়ে যায়। কারণ, প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব কাঠামো আছে এবং সেখানেও আত্ম-সদৃশ persona বা প্রতিমূর্তি সক্রিয় থাকে। সেন-রাজাদের নিকট থেকে বখ্‌তিয়ার খল্‌জী রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। প্রাক্তন শাসকশ্রেণীকে isolate বা কোণঠাসা করা ছিল তদানীন্তন নতুন অধিপতিদের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন।

অন্যথায়, তাঁরা নিজেরাই উচ্ছেদ হয়ে যেতেন। সাবেক শাসক-শ্রেণী ছিল ব্রাহ্মণ। রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃত। বেদ-স্পর্শ পর্যন্ত শুদ্রদের জন্যে নিষিদ্ধ। ধর্মের নানা নিগড়ে ব্রাহ্মণ শাসক-শ্রেণী কর্তৃক জনসাধারণের বিকাশ-পথ এমনই রুদ্ধ ছিল যে তাদের নিকট ত্রাণকর্তারূপেই যেন সুলতানদের আবির্ভাব। সুলতানদের জন্যে জনগণের সমর্থন, টিকে থাকার জন্যে বাধ্যতামূলক। তাদের নিজেদের সমস্যা তখন নিঃশ্বাসের জন্যে নাক-রক্ষা।

অতীতের শিকড়-সন্ধান ছাড়া ভবিষ্যতের পানে এগোনো কষ্টসাধ্য। দাগেস্থানী প্রবাদ: If you fire at the past with a pistol, the future will shot back from a cannon. "যদি অতীতের দিকে পিস্তল ছোঁড়ো, ভবিষ্যৎ তোমার পানে কামান দেগে জবাব দেবে।" ইতিহাসের অপব্যাখ্যার জন্য দিতে হয় চড়া দাম। কারণ, ইতিহাসের গতি-পথ সম্পর্কে অজ্ঞতা। বাংলাদেশে বর্তমানে মানবেতর জীবনযাপনকারী চার লক্ষ মোহাজের ভাই আছে। তাদের কোন রাষ্ট্র নেই, তারা stateless. পাকিস্তানে তারা যেতে চায়। কিন্ত পাকিস্তান তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে আগ্রহী নয়। সম্প্রতি করাচী শহরে বিহারী ও পাঠানদের দাঙ্গায় যে-কোন সৎ মানুষ দুঃখ বোধ করবে। অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষের এই দুর্দশা ইতিহাসের অপব্যাখ্যার ফল, গতিপ্রকৃতি না-জানার পরিণাম।

বাংলা একাডেমী বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনার নকীব। আমি আশা করব, তাদের দায়িত্বের মধ্যে গবেষণার স্থান যেন থাকে খুব উঁচু পর্যায়ে। কারণ, গবেষণা অতীত—তথা ইতিহাস-কে জানার অন্যতম সুষ্ঠু উপায়। অবিশ্যি গবেষণার নামে বিবরণধর্মী এক ধরনের বস্তা-পচা পুথি-কীর্তন শোনা যায়। কর্তৃপক্ষ গবেষণার বিষয়-বস্তু ও গবেষক নির্বাচনে যত্নশীল হবেন। ইতিহাসের পটভূমির মোজেকরূপেই যেন তাদের ফসল জনসমক্ষে উপস্থিত হয়।

বর্তমান ঐতিহাসিক দায়িত্ব-পালনের অন্যতম উপায় সুষ্ঠু জ্ঞান-বিকীরণের পথেই আসতে পারে। সত্যের সন্ধান সামাজিক শ্রীবৃদ্ধিরও পথ। পুরাতন কথা। তবু পুনরুক্তি করতে হয়।

বাংলা একাডেমীর পত্তন ইতিহাসের সড়কে। সামাজিক এই পটভূমি যেন একাডেমী-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিপথ থেকে দূরে সরে না যায়। বিশেষভাবে তারা যেন আরো মনে রাখে, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও এ যুগে অজাতশত্রু

নয়। সঙ্কুচিত পৃথিবীতে হাম্‌লা শুধু 'লোকাল' (local) — মোকামী থাকে না; আন্তর্জাতিকও হোতে পারে। প্রাক্তন উপনিবেশবাদী — আরো স্পষ্টতঃ সাবেক সাম্রাজ্যবাদীরা সংস্কৃতির উপরও থাবা মারে নিজেদের অতীত স্বার্থবজায়ে। বিড়ালের মত নরম পশমে ঢাকা থাকে তাদের থাবার নখর। অবিশ্যি উপনিবেশের একদা প্রভুরা জানে: তে হি না দিবসাঃ। সেই দিন আর নেই। চোখ রাঙিয়ে ভুরু নাচিয়ে আর কার্যোদ্ধার সম্ভব নয় বর্তমানে। মাত্র ছেষট্টি বছর পূর্বের ঘটনা। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ। মিশরের কায়রো শহরে একটা ইংরেজ পুলিশ মেরে ফেলেছিল উত্তেজিত জনতা। বৃটিশ সৈন্যরা বেধড়ক গ্রেপ্তার, লুটপাট চালিয়ে ক্ষান্ত হয় নি। নগরবাসীদের শাস্তি দেওয়া হোলো, এক মাস তারা চার-হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওই রাস্তা পার হবে। এক মাস এই ফরমান চালু ছিল। জনাকীর্ণ নগর-কেন্দ্রের পথ। মজ্‌বুর বহু পথিক-কে ওইভাবে চতুষ্পদ সাজতে হয়। এমন অসংখ্য মানবেতর আরচণের বিবরণ দেওয়া যায়। ফরাসী ইংরেজ ডাচ মার্কিন প্রমুখ শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশবাদীরা কালা মুল্লুকে সকলেই হিট্‌লারের জারজ বাচচা ব'নে যেত। মার্কিন পুঁজিবাদ বিস্তারের অধ্যায় এমনই রক্তাক্ত নৃশংসতার কাহিনী। মুনাফা এবং নিজেদের বিলাসবহুল আয়েসী জীবন-যাপন থেকে আজও ওইসব সভ্য জাতি তৃতীয় বিশ্বের জন্যে এতটুকু ত্যাগ-স্বীকারে রাজী নয়। তারা ভিক্ষা বা খয়রাৎ অবিশ্যি দান করে। তা 'এড্' (aid) নামে পরিচিত। কিন্তু সে-সবের শর্ত কোন স্বাধীন জাতির জন্যে সম্মানজনক নয়। এবং দেখা যায়, এই বদান্যতা তথা ঋণের ভারে অনুগ্রহ-প্রাপ্ত দেশ শেষ পর্যন্ত মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে মাটির উপর। তাঁদের উন্নতি-শ্রীবৃদ্ধি ত দূরের কথা, গণতন্ত্র পর্যন্ত মার খায় প্রচণ্ডভাবে। স্থানীয় দেশী এজেন্ট-দালালদের যোগ-সাজসে বিদেশী ঋণদাতারা কর্তৃত্ব-প্রধান অথরিটেরিয়ান (authoratarian) শাসন-ভার চাপিয়ে দেয় অস্ত্র সরবরাহ মারফৎ। প্রাক্তন উপনিবেশে ওরা রাখ্‌-ঢাক্-হীন সোজাসুজি নগ্ন মোকা-বিলা করত। বর্তমানে প্রকাশ্য সাম্রাজ্যবাদ ভগ্ন-মাজা। তাই শোষণের খেমটা নৃত্য চালু রাখতে ঘোমটা প্রয়োজন হয়। মহাজন সাম্রাজ্যবাদীরা এখন অদৃশ্য থাকে এবং দূর থেকে রশি টানে। ওদের অর্থনৈতিক সুবিধা-ভোগী দেশী এজেন্টগণ নফরের কাজ করে। যেহেতু তৃতীয় বিশ্ব সভ্যতা তথা প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ, তাই উক্ত প্রাক্তন উপনিবেশবাদীরা

তাদের উন্নত যন্ত্র-উৎপাদিত চক্‌চকে নানা পণ্যের ঝলকে অধিবাসীদের—বিশেষতঃ তরুণদের—চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ব্লু জীনের পাৎলুন, টু-ইন-ওয়ান এবং এই জাতীয় গ্যাজেটের আকর্ষণে মোহগ্রস্ত বিশ্বের তরুণ সম্প্রদায়। জওয়ান কালে ওইসব জিনিসের প্রতি লোভ স্বাভাবিক। তারা তলিয়ে দেখতে শেখে না, যে-সভ্যতার ঝলক এমন নেশাপ্রদ, তার মানবিক উৎপাদন (human product)---১৯১৮-৩৮ মাত্র কুড়ি বছরে কেন একে অপরের গলা কাটার জন্যে দু-দুটো মহাযুদ্ধ করল? প্রাণের অপচয় পাঁচ কোটি মানুষ। সম্পদের হিসেব বাদ দিলুম। তবু একটি নিরীক্ষার কথা না বলে পারলুম না। এক অর্থনীতিবিদ লিখেছিলেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে-সম্পদের অপচয় ঘটে তা মানব কল্যাণে নিয়োজিত হলে, পৃথিবীর প্রত্যেক নাগরিককে প্রতিদিন এক পাউণ্ড রুটি অন্ততঃ বিনামূল্যে বিতরণ করা যেতো। বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজের আশি ভাগ এক সময় জার্মানীর একচেটে ছিল। সেই বিজ্ঞানমনা জার্মানীতে কী করে হিট্‌লারের আবির্ভাব ঘটল ভেবে কূল পাওয়া দায়। অবিশ্যি ছয় লক্ষ ইহুদীকে হিটলার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে হত্যা করেছিল গ্যাস-চেম্বারে। বন্দীদের দাঁত-বাঁধানো সোনাটি পর্যন্ত খুলে নেওয়া এবং তাদের চামড়া দিয়ে লাইটের সেড বানানো হোত। All that glitters is not gold—যা চক্‌চক করে তা-ই সোনা নয়। প্রবাদটা য়ুরোপের এবং ইংরেজের। তৃতীয় বিশ্বের তরুণদের প্রবাদটি মনে গেঁথে রাখা উচিত। শুধু বাইরের আড়ম্বরে মানুষের আত্মা গড়ে ওঠে না। সভ্যতাগর্বী জাতিগুলো অনুন্নত দেশের সংস্কৃতির উপর হামলা চালায় খুব সতর্কতার সঙ্গে, অতি সন্তর্পণে নানা পাঁয়তারাসহ।

বাংলা একাডেমীর সেদিকে সজাগ থাকা উচিত। কারণ, সংস্কৃতির কারিগরী দিকের দায়িত্ব এমন সব প্রতিষ্ঠানের। অনেক সময় পাউণ্ড-ডলারের থলি হাতে ওরা হাজির হয়। হা-ভাতে দরিদ্র জাতি আমরা। আমাদের পক্ষে ওদের ফিরিয়ে দেওয়া সহজ হয় না। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে থাকে মজকুর সভ্যজাতির পাল। বাংলা একাডেমীর চোখ যেন খোলা থাকে এমন ক্ষেত্রে। যদিও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, তবু জানা দরকার, শিল্প-সাহিত্য কার জন্যে, কিসের জন্যে? উপযোগিতা বা utility এই প্রশ্নে অনেকে নাক সিট্‌কাতে পারেন। তৃতীয় বিশ্বের নাগরিকদের পক্ষে বর্তমান পুঁজিবাদী সভ্যতার মুখোশধারী তথাকথিত আন্তর্জাতিক ফড়ে-দালাল-মার্কা হাঙরদের হাঁ-মুখের

ব্যাদন-মোকাবিলায় সৌন্দর্য থেকে উপযোগিতার প্রশ্ন আলাদা থুয়ে রাখা অন্যায় নয় শুধু চরম মূর্খতা। বিবেক, রুচি গঠনের পরোক্ষ-ভার বাংলা একাডেমীর উপর ন্যস্ত বৈকি।

শুধু প্রতিষ্ঠান নয়, সাম্রাজ্যবাদীদের আরো লক্ষ্যস্থল থাকে ব্যক্তি-পর্যায়ে। সংস্কৃতিসেবী ব্যক্তিদের সামনেও তারা টোপ ফেলে। দরিদ্র তৃতীয় বিশ্ব। দরিদ্রতর লেখক শিল্পী চলচ্চিত্রকার, সুরকার প্রমুখ জন। তৃতীয় বিশ্বের সংস্কৃতিসেবী সন্তানদেরও জানা উচিত—ব্যক্তি-পর্যায়েও সভ্য-জাতির দুরভিসন্ধি ও নাশকতা অব্যাহত থাকে। এই দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া আত্মহত্যাব সামিল দেশের নাগরিক এবং শিল্পের সাধক হিসেবে। স্বদেশের সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধির উপরই শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ এবং আয়ুষ্কাল নির্ভর করে। স্পেনের কবি লোর্কারই স্বদেশবাসী আর এক আধুনিক কবি গ্যাব্রি-য়েল সেলায়া (Gabriel Celaya) তৃতীয় বিশ্বের মুখপাত্র হিসেবে চীৎকার দিতে বিস্মৃত হন না। য়ুরোপের সবচেয়ে দরিদ্র দেশ স্পেন ও পর্তুগাল। ওদের অবস্থা অনুন্নত দেশের মতই। তাই বোধ হয়, কবি সেলায়া ফুকার দিয়ে ওঠেন—

Let us not be poet, baying like a solitary hound in the night of crime. খুন-খারাবীর রাত্রে নিঃসঙ্গ কুকুরের মত আর্তনাদ উত্থাপনের মত কবি যেন আমরা না হই।

আমার মনে হয়, তৃতীয় বিশ্বের সংস্কৃতি-কর্মীদের কর্তব্য তিনি যথাযথ চিহ্নিত করেছেন। কবি আরো বলেন—

Let us be like those poets—the great, the only, universal ones—who instead of speaking to us from without as in a cofessional, speak within us and stimulate that identification with them or of them with us, which guarantees their authenticity.

যদিও গ্যাব্রিয়েল সেলায়া এখানে কবিদের আদর্শ উত্থাপন করেছেন, তবু সেই জায়গায় প্রত্যেক সংস্কৃতি-সাধক যে-যার বিভাগীয় পূর্বসূরীদের নাম বসিয়ে নিতে পারেন। এই আহ্বান তৃতীয় বিশ্বের প্রত্যেক কর্মীর জন্যে। কবি বলছেন সকলের আদর্শপুরুষ এমনই ব্যক্তি হওয়া উচিত, যিনি অনন্য এবং বিশ্বজনীন পর্যায়ে পৌঁছেছেন। তাঁদের বাণী বাইরে থেকে কথিত নয় যেমন পাদ্রীর নিকট স্বীকারোক্তি-তে ঘটে। তাঁরা বলেন ভেতর থেকে যা

তাঁদের সঙ্গে আমাদের অথবা আমাদের সঙ্গে তাঁদেব একাত্মতা উদ্দীপিত করে। যার ফলে তাঁদের অকৃত্রিমতায় আর সন্দেহের কোন জায়গা থাকে না।

তৃতীয় বিশ্বের সকল কবি-সাহিত্যিক শিল্পী প্রমুখের আদর্শ-পথ এমনই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিট্যুশানের দায়িত্ব আরো বেশী। তাই আমি মনে করি প্রতিষ্ঠান স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া একান্ত দরকার, যেন কোন বিবেকের প্রশ্ন-মোকাবিলায় পরমুখাপেক্ষী না হতে হয়।

দুঃখের বিষয়, বাংলা একাডেমী একত্রিশ বছরেও তেমন পর্যায়ে পেঁছুতে পারে নি। অস্তিত্ব সরকারী অনুদানেব উপর নির্ভরশীল। এই পরিস্থিতি-পরিখা থেকে কী ভাবে রেহাই পাওয়া যায়, তা বেশ গুরুত্বের সঙ্গে ভাবা উচিত। স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপর জোর দেওয়াব হেতু, তা-ছাড়া বাংলা একাডেমীর জ্ঞান এবং বিবেক সাধনার মহৎ পীঠে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। দারিদ্র্য কাউকে মহৎ করে না। নজরুল নিজের জীবন-উদাহরণে প্রমাণ করে গেছেন, বৃহত্তর সম্ভাবনাময় মহীরুহ কী ভাবে অকালে শুকিয়ে যেতে পারে। অন্য আর এক বিপদ আছে। সব রকম অনুদানের পেছনে রশি থাকে। নুন খেলে কিছু গুণ গাইতে হয়। তখন বিবেকের সঙ্গে আপোষের প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। কোন প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতা এবং পবিত্রতা রক্ষা এমন ক্ষেত্রে দায় হয়ে পড়ে। উদাহরণ বহু দেওয়া যায়। হাতের কাছ থেকে একটি: কুড়ি হাজার কোটী ডলার-ব্যয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী শেষ পর্যন্ত তার অত্যাচার, দুর্নীতি, দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যা-কে রক্ষা করতে পারে নি এবং দেশে দেশে ইঁদুরের মত আশ্রয়-সন্ধানে পরে দেশে দেশে হন্যে তৎপর হতে হয়েছিল যে-ব্যক্তি মহোদয়-কে—সেই ইরানের শাহ্‌কে কী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—হোক তা অনারারি—ডক্টরেট ডিগ্রী দেয় নি?

নেপথ্য—পেছনের কাহিনী আন্দাজ করা আদৌ কঠিন নয়। পাকিস্তান সরকারের চাপধর্মী অনুরোধ বিদ্যানিকেতনের কর্তৃপক্ষকে রক্ষা করতে হয়েছিলো। পাকিস্তান সরকার শা'কে তোয়াজ করার অভিলাষী। কাবণ, উভয়ের সাদৃশ্য শোষণের ক্ষেত্রে। এক বিধবা আর এক বিধবা-কে বোন ডাকে। বাহ্যতঃ ইরান ও পাকিস্তানের বন্ধুত্ব ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে

নাকি গড়ে ওঠে। অন্ততঃ তা-ই প্রচার করা হয়। অথচ ফরাসীদের বিরুদ্ধে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম কালে পাকিস্তান সরকার টু-শব্দ পর্যন্ত তোলে নি। বলা বাহুল্য, আলজেরিয়া মুসলমানের দেশ এবং তার শতকরা কুড়িজন অধিবাসী (পাঁচ জনের পরিবারে এক জন) প্রাণ-বিসর্জন দিয়েছিল। পাকিস্তান সরকারেব ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ তখন কোথায় ছিল, খোদা-কে মালুম। আমাদের নিকটে অবশ্যি থোড়া-থোড়া মালুম। তখন আন্তর্জাতিক বাজারে ফ্রান্স ছিল পাটের খরিদ্দার হিসেবে নাম্বার টু—দুই নম্বর খরিদ্দার। সোনালী আঁশ বৈদেশিক স্বর্ণমুদ্রা অর্জন করে। ফ্রান্স তখন সেই স্বর্ণ-প্রসবিনী প্রাবাদিক হংস। এমন হাঁস-কে কী বধ করা যায়? তাদের চটানো-ও মূর্খতা। বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়া করাচী মুলতান লাহোর প্রভৃতি শহরে বিরাট আধুনিক যন্ত্রশিল্প কী করে গড়ে ওঠবে? তেজারতীর নিকট ইসলামী ভ্রাতৃত্ব তুচ্ছ। পূর্ব-পাকিস্তানের দরিদ্র মুসলমান চাষী-ভাই পচা পানিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দেহময় পাঁচড়া রোগ-সহ পাট কাচে অর্থাৎ সোনালী আঁশ তৈরী করে। ওদেব কথা পাকিস্তান সরকারের মনেও থাকে নি। আভিজাত্য, রুচির প্রশ্ন আছে না? পচা ডোবার দিকে কেন বোরা-ম্যামন প্রভৃতি ব্যবসাদারদের তোষণকারী সরকারের নজর যাবে? এইজন্য বলছি, অনুদান বা অন্যান্য সাহায্য ইনস্টিট্যুশনের জন্য কল্যাণকর নয়।

বর্তমান যুগে শুধু মোকামী নয়, বিদেশী দুশমনদের কথাও ত হিসাবে রাখতে হয়। তৃতীয় বিশ্বের নবলব্ধ স্বাধীনতা প্রকৃতভাবে টিকিয়ে রাখা দায়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা যদি বা মেলে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিকিয়ে যায়। নেই ভাত ত জোড়হাত। বাঙলা প্রবাদ স্মরণীয়। স্বাধীনতা হয়ত কোন রকমে টিকে থাকে। কিন্তু তা ভগ্ন মেরুদণ্ড—এমন কী নৈতিক মেরুদণ্ড পর্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ।

এই মানবেতর চেতনার বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের দায়িত্ব তৃতীয় বিশ্বের প্রত্যেক ইনস্টিট্যুশনের, প্রতিটি দেশপ্রেমী ব্যক্তির। গণতান্ত্রিক মানস-আবহাওয়া গড়ে তোলা বাধ্যতামূলক। সমাজ-গঠনে এবং আত্মিক উন্নয়নে। অবিশ্যি গণতন্ত্রের নানা সংজ্ঞা চালু আছে পণ্ডিত এবং অপণ্ডিত মহলে। ইংলণ্ডে এখনও রাজা-রাণীর পালা বর্তমান। তবুও তা গণতন্ত্র এবং কেউ কেউ মন্তব্য করেঃ উত্তম গণতন্ত্র। গ্রীক নগর-রাষ্ট্রে হাজার হাজার

ক্রীতদাসদের কোন উচ্চবাচ্য ছিল না ভোট ত দূরের কথা। তা-ও নাকি গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা—পণ্ডিতদের মুখে শোনা যায়।

আমার গণতন্ত্রের সংজ্ঞা কিন্তু মনে রাখা খুব সহজ। একটি দেশে কতখানি গণতন্ত্র চালু আছে তা নিরূপণও প্রায় বিনা মেহনতে সম্ভব। জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে দৈনন্দিনতার প্রবাহ-পটে ও অন্যান্য পর্যায়ে দেশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা কতখানি চালু আছে? এমন প্রশ্নের উপরই হিসেব করা যায়, গণতন্ত্রের পরিমাণ কতখানি বা কতটুকু। অনুপাতই সেখানে আসল পরিচয়। সত্তর বছর পূর্বে জন্মেছিলাম। বর্তমান মেট্রিক-বিন্যাসেব তখন প্রচলন ছিল না। সেকালে টাকার মূল্য ছিল ষোল আনা। তা দিয়ে অনুপাত (ইংরেজি রেশিও) নির্ধারণ হোত। যদি দেখা যায় দেশে মাতৃভাষার ব্যবহার বারো আনা, তাহলে ওই খানে আছে বারো আনা গণতন্ত্র, বাকী চার আনা ফু-ফু-ফুসমন্ত্র। দশ আনা মাতৃভাষার প্রচলন থাকলে দশ আনা গণতন্ত্র বাকী ছ' আনা ফাঁকিজুকি যন্ত্র। আট আনা চালু থাকলে অর্ধেক গণতন্ত্র বাকী অর্ধেক হাড়-পেষাই মুড়িঘন্ট। যদি চার আনা মাতৃভাষার ব্যবহার চলে, তাহোলে চার আনা গণতন্ত্র বাকী বারো আনার চৌহদ্দি ঝলমল, চক্‌মকে বিবির বেড-রুম পর্যন্ত। এইভাবে নানা অনুপাত নির্ধারণ করা যায়। অবশ্যি পণ্ডিত-পলিটিসিয়ানরা নানা চুলচেরা তর্ক জুড়তে পারেন। সাধারণভাবে আমার মানসাঙ্ক খুব সহজেই কষে নেওয়া যায়। বিশেষ মেহনৎ লাগার কথা নয়।

আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, কতো দিকে না চোখ রাখতে হয় বর্তমান যুগে কোন আদর্শের নিকটে পৌঁছুতে। পরিবেশ-সচেতনতা অবিশ্যি সব যুগেই দরকার হয়। কিন্তু হাল-জমানায় তা-ছাড়া এক পা এগোনোর উপায় নেই। উনিশ শতকের পৃথিবী গায়েব। প্রযুক্তিবিদ্যা এবং বিজ্ঞানের মহিমায় পৃথিবী ছোট হয়ে গেছে কিন্তু দায়িত্ব অনুপাতে প্রচণ্ড বিস্তৃত। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেরও তা থেকে রেহাই নেই। তার অর্থ এই নয় যে স্বদেশের চতুর্দিকে প্রাচীর তুলে আমাদের বসবাস করতে হবে। রাজনৈতিক মানচিত্রে সীমান্ত (ফ্রন্টিয়ার) থাকতে পারে। কিন্তু আজব এক রাজ্য সংস্কৃতির রাজ্য—যেখানে সীমান্ত অচল, যেখানে কাঁটা তারের বেড়ার প্রস্তাব উত্থাপনও মূর্খতা। সাংস্কৃতিক সম্পদে কোন জাতির একচেটে অধিকার থাকে না—তার সূত্রপাত যে-কোন দেশেই হোক না কেন। আবু সীনা, আবু রুশদ কী ইব্‌নে খলদুন মুসলমান ছিলেন। সুতরাং

খ্রীষ্টান বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট তাঁরা অস্পৃশ্য হবেন—এমন চিন্তা এক রকমের আধ্যাত্মিক আত্মহত্যার সামিল। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের যে-অভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি তা য়ুরোপের অবদান। আরো চিহ্নিত করে বলা যায় তা খ্রীষ্টান এবং ইহুদীগণের অবদান। ইহুদী-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আলবার্ট আইনস্টাইন। এই আপতিক উপাদানের জন্যে তাঁর সাধনা-লব্ধ ফল-কে যদি কোন মুসলমান অস্বীকার করে তা আত্মহত্যা ছাড়া আর কী? গোটা পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে আইনস্টাইনের কল্যাণে। প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্যের উৎস সেইখানে। এমন উদাহরণ আরো বাড়ানো যায়। ম্যালেরিয়ার জুলুমে কুষ্টিয়া যশোর খুলনা প্রভৃতি জেলার গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে উনিশ শতকে। বিদেশী ডাক্তার—খ্রীষ্টান অবিশ্যি—ডেনিসন রস ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক বের করলেন কলিকাতা শহরের এক ল্যাবোরেটরির ভেতর বছরের পর বছর গবেষণার ফলে। গবেষণা নয়, এ-কে এবাদৎ তপস্যা বলা যায়। এই মহাপ্রাণ ইংরেজ কী খ্রীষ্টান ব'লে শ্রদ্ধেয় নয়? মানুষের দুর্দশা-দুঃখ, রোগভোগের যন্ত্রণা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ওই মহতী সাধনায়।

যাঁদের নাম করলাম, তাঁরা সকলেই বিশ্বনাগরিক। উনবিংশ শতাব্দীর উগ্র জাতীয়তাবাদ বর্তমান যুগে অচল। জাতিপুঞ্জের পত্তন ত সূত্রপাত। প্রাচীন মহাপুরুষেরা স্বপ্ন দেখেছিলেন মানব-জাতি সম্পর্কে: একটি পরিবার একটি আকাশের নীচে। সেই পথেই মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। নচেৎ দানব আণবিক বোমার যুগে গোটা মানব-জাতির নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা খুব বেশী।

বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ সর্ব্বৈব হবে বৈকি। একদা বর্ধমান হাউসেই বাংলা একাডেমী বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত। একাডেমীর ঠিকানায় বর্ধমান হাউসের উল্লেখ থাকা উচিত। সংস্কৃতির লক্ষ্যই বিস্তার এবং সীমান্ত-উত্তরণ। বর্ধমান-শব্দ সেই দ্যোতনা বহন করে। হাউস-শব্দও থাকা দরকার। কারণ, এই ইনস্টিটুশন কোন রকম কূপমণ্ডূকতার আশ্রয়স্থল নয়। তা ঘোষিত হয় ওই ইংরেজী শব্দে। একাডেমী ত গ্রীক শব্দ, প্লেটোর নামের সঙ্গে জড়িত। যেহেতু বিদেশী শব্দ তা কোন সংস্কৃতি-পূজারী পরিশীলিত মনের মানুষ বাদ দিতে বলবে?

গোড়ায় উল্লিখিত, বাংলা একাডেমী সারি সারি ঐতিহ্যের দিকশূল। মানুষের স্বাধিকার, স্বাধীনতা, দেশপ্রেম, মানবিক মর্যাদার ঝাণ্ডা চির-উড্ডীন রাখার শপথ— এবং এমনতর আরো মূল্যবোধ উজ্জীবনী চেতনার উৎস। এই প্রতিষ্ঠান পৃথিবী-অবলোকনের জানালা, জ্ঞান-চর্চার বিশাল নিকেতনরূপে কালে কালে বিস্তার লাভ করুক। বাংলাদেশের ঠিকানা হোক বাংলা একাডেমী। এই স্বপ্ন আমি পোষণ করে যাব তাবৎ আমার জীবৎ-কাল।

মুহম্মদ শামসউল হক

প্রতিষ্ঠা দিবসের শ্রদ্ধেয় প্রধান বক্তা, বাংলা একাডেমীর সম্মানিত মহাপরিচালক ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবর্গ এবং বিজ্ঞ সুধীবৃন্দ,

ঐতিহ্যবাহী বাংলা একাডেমীর ৩২তম প্রতিষ্ঠা-দিবসে যাঁদের আত্মদান এই একাডেমীকে একটি জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এক অনন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, মহান ভাষা আন্দোলনের সেই বীর শহীদদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-তাপস ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নকল্পে যে পণ্ডিতবর্গ, চিন্তাবিদ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এ একাডেমী স্থাপনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন, তাঁদেরও সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই। দেশের বরেণ্য অনেক খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ, যাঁদের অনেকেই আজ এখানে উপস্থিত, বাংলা একাডেমীর উন্নয়নে সৃষ্টিমুখী অবদান রেখেছেন; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদেরও অভিনন্দন।

আরো অভিনন্দন জানাই তাঁদের, যাঁদের শ্রম, নিষ্ঠা এবং সংগঠন-কুশলতা একাডেমীকে ক্রমোন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলা একাডেমীর বহুমুখী কর্মসূচীর সার্থক বাস্তবায়নের ফলে সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান আজ এক বিশেষ সম্মান ও কৃতিত্বের অধিকারী। মহাপরিচালক ডক্টর আবু হেনা মোস্তফা কামালের ব্যক্তিগত অবদানও নিঃসন্দেহে মূল্যবান। আজকের এই শুভদিনে তাঁকে এবং তাঁর কৃতী সহকর্মীদের বিশেষ অভিনন্দন জানাই।

কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং মহাপরিচালক মহোদয় আমাকে আজকের এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার আমন্ত্রণ জানিয়ে যে সৌজন্য প্রদর্শন করেছেন সেজন্য আমি সম্মানিত ও কৃতজ্ঞ।

আজকের প্রধান বক্তা জনাব শওকত ওসমান আমাদের দেশের একজন বিশেষ খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় যখন তিনি একজন তরুণ অধ্যাপক এবং প্রতিশ্রুতিশীল উদীয়মান

সাহিত্যিক। কিছুকালের মধ্যেই তাঁর অসামান্য সৃজনী প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায় তাঁর রচিত এবং বহু প্রশংসিত "ক্রীতদাসের হাসি"তে। পরবর্তীকালে সাহিত্যে তাঁর উত্তরোত্তর সাফল্য তাঁকে এক বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রতিষ্ঠা দিবসে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ যেমন সারগর্ভ তেমনি চিন্তাউদ্দীপক। তাঁর এই মূল্যবান ভাষণের জন্য আমাদের সকলের পক্ষে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এরূপ অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ একটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বাংলা একাডেমী স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে বিরাজমান জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সমস্যার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ হয় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এবং তা বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা-প্রক্রিয়াকে নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত করে। তত্ত্বগতভাবে যে সকল ধ্যানধারণা এরূপ একটি একাডেমী স্থাপনের প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করে, দেখা যায় তার প্রধান লক্ষ্য ছিল তিনটি। এক, ঐ সময়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কথায়, "স্বাধীন পূর্ব বাংলার স্বাধীন নাগরিক হিসেবে আজ আমাদের প্রয়োজন হয়েছে সর্ব শাখায় সুসমৃদ্ধ এক সাহিত্য। এ সাহিত্য হবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়।... আমাদের প্রয়োজন আজ আদিকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলার মুসলমানের সাহিত্য সাধনার বিস্তৃত ইতিহাস লেখা এবং প্রাচীন মুসলিম লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশ করা।"[১] দুই, "এই সোনার বাংলাকে কেবল জ্ঞানে নয়, ধনধান্যে, জ্ঞানে-গুণে, শিল্প-বিজ্ঞানে পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের সমকক্ষ করতে হবে। তাই কেবল কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিভাগে বাংলাকে উচচ আসন নিতে ও দিতে হবে। তার জন্য শিক্ষার মাধ্যমে স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আগাগোড়া বাংলা করতে হবে।"[২] তিন, "আমাদিগকে একটি একাডেমী (পরিষদ) গড়তে হবে যার কর্তব্য হবে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ বাংলায় প্রকাশ। এজন্য এক পরিভাষা-সমিতির প্রয়োজন আছে।"[৩]

পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমী যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়, তা মূলত একই ছিল।

এ সকল ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য অর্জনে বাংলা একাডেমীর অগ্রগতি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃতপ্রায় পুথি, লোককাহিনী, পাণ্ডুলিপি, ইত্যাদি এবং সামাজিক ও জাতীয় ইতিহাস ও ও ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে বাংলা একাডেমী কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তেমনি নতুন সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে বাঙ্গালীর সাহিত্য-প্রতিভা বিকাশে এবং আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ এবং চর্চার মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টারও লক্ষণীয় অগ্রগতি হয়েছে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বাংলা মাধ্যম প্রচলিত হয়েছে।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে বাংলা ভাষার উন্নয়নের যে লক্ষ্যগুলি অনুপ্রাণিত করেছিল তা কাব্য এবং উপন্যাসের উন্নয়নে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভাষা ও সাহিত্যের সামগ্রিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ফলে বাংলা সাহিত্যকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বৃহত্তর লক্ষ্য ছিল "সোনার বাংলা"কে অন্যান্য উন্নত দেশের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। আমার মনে হয়, এই বৃহত্তর লক্ষ্যটির তাৎপর্য হলো জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বাংলার মাধ্যমে অগ্রসর একটি সীমিত শিক্ষিত গোষ্ঠী সৃষ্টি নয়। এই লক্ষ্যটি ছিল, বাংলা ভাষার ব্যবহার সমগ্র জাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করবে। ফলে, সাধারণ জনগণের জীবন আলোকিত হবে। এ আশা কি পূরণ হয়েছে বা এ লক্ষ্যে কি কোন অর্থবহ অগ্রগতি হয়েছে?

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতি সম্পর্কে মতভেদ থাকতে পারে। তবে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে যতটা অগ্রগতি হয়েছে তা জাতির এক ক্ষুদ্র অংশে সীমাবদ্ধ এবং এর কল্যাণস্পর্শ হতে জাতির এক বিরাট এবং বৃহত্তর অংশ বঞ্চিত। স্বাধীনতাউত্তরকালে পনর বছর পরেও শত-করা প্রায় ৮০ জন এখনও নিরক্ষর। সামগ্রিক জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভেসে ওঠে এক করুণ খণ্ডিত সমাজের চিত্র। একদিকে ক্ষুদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়, অপর-দিকে বিরাট অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী। একদিকে সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ে কর্মরত বিভিন্ন আয়ের এক ক্ষুদ্র শ্রেণী; অপরদিকে শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ জন দারিদ্র্যসীমার নিচে। একদিকে বিলাসবহুল জীবনের জৌলুস

এবং সম্পদের অপচয়; অপরদিকে ন্যূনতম সম্পদের অভাবে মানবেতর জীবন যাপন।

আরো হৃদয়বিদারক হলো যে এ ভাগ্যাহত জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েও তারা মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী অতীতের শৃঙ্খলে এখনও আবদ্ধ। তাদের মন-মানসিকতা ঐ দূর অতীতের অন্ধকারে এখনও আচ্ছন্ন। অবশ্য এটা মনে করা ঠিক হবে না যে তারা তাদের জাতীয় সত্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন। জাতীয় সঙ্কট-মুহূর্তে, যেমন ভাষা আন্দোলনে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে, তারা জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে, ত্যাগের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। একান্ত পরিতাপের বিষয় যে ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়যুক্ত হবার পরও দেশের এই বিরাট জনগোষ্ঠী অশিক্ষা এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামে এখনও পরাজিত। আইনত এবং নীতিগতভাবে তাদের গণতান্ত্রিক নাগরিক অধিকার রয়েছে সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে অধিকার হতেও তারা বঞ্চিত। কারণ, এই অধিকার ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি বাংলাদেশে সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীল প্রতিষ্ঠান নির্মাণে ব্যর্থতারও একটি প্রধান কারণ।

এ সমস্যার সমাধান সহজ নয়। কোনো কোনো দেশ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে সমাজের আমূল পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবের সাহায্য গ্রহণ করেছে। তাদের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে একটি নতুন সমাজ নির্মাণে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন অপেক্ষা মানসিকতার পরি-বর্তন সাধন অধিকতর কঠিন। চীনের জনৈক নেতা সম্প্রতিকালে এ অভিমত প্রকাশ করেন যে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের ফলে আজ চীনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে। কিন্তু চিন্তায়, নৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্য-বোধে কাঙ্ক্ষিত সংস্কারের জন্য মানসিকতার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।[৪] কেউ কেউ এক নতুন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথাও ভাবছেন।

বাংলাদেশে এ সমস্যা সমাধান আরো কঠিন এবং জটিল; এ জন্য যে বাংলাদেশে শিক্ষিত প্রভাবশালী সম্প্রদায়ও খণ্ডিত বিখণ্ডিত। রাজনৈতিক মেরুকরণ এমন পর্যায়ে এসেছে যে জাতীয় ঐক্য ও নিরাপত্তা বিপন্ন। শক্তিশালী সামাজিক, সাংস্কৃতিক, গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে বর্তমান পরিবেশ কেবল যে প্রতিকূল তাই নয়, সুপ্রতিষ্ঠিত অনেক জাতীয়

প্রতিষ্ঠান, যথা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানগুলির স্থিতিশীল অগ্রগতির পথেও বিরাট হুমকি সৃষ্টি করেছে।

মতের ভিন্নতা গণতান্ত্রিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য এবং একটি সমাজের গতিশীলতা ও অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। কিন্তু মতভিন্নতা এবং মত মেরুকরণ সমার্থক নয়। মতে এবং ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে ভিন্নতা সত্ত্বেও অনেক প্রতিবেশী দেশ ন্যূনতম ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে এগিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে। দুর্ভাগ্য যে বাংলাদেশে মত ও স্বার্থের ভিন্নতা এক ভয়াবহ অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে এবং তা যাঁরা জাতি গঠনে নেতৃত্ব প্রদান করবেন তাঁদের গঠনমূলক কর্মশক্তিকে ক্ষয়িষ্ণু করেছে।

এই অশুভ পরিস্থিতির অবসান কিভাবে সম্ভব তার দিক-নির্দেশনা দেয়া কঠিন। তবে প্রাচীনকাল থেকে যে কয়েকটি প্রধান সভ্যতা মানব সমাজের অগ্রগতিতে স্থায়ী অবদান রেখেছে তাদের উত্থান-পতনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়: "যে সভ্যতাগুলো পতনোন্মুখ বা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত, তাদের মধ্যে দু'টি সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় যথা—(১) সমাজের প্রভাবশালী নেতৃত্ব প্রদানকারী অংশের মধ্যে সৃজনশীলতায় স্থবিরতা, এবং (২) পারস্পরিক সমঝোতা ও সহনশীলতার অভাবে জাতীয় ঐক্যের ভাঙ্গন ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। প্রথমোক্ত পরিস্থিতির মূল কারণ সৃষ্টিমুখী উদ্যোগ ও সৃষ্টিকর্মের প্রতি রাজনৈতিক শক্তির অনীহা বা অবজ্ঞা। দ্বিতীয় পরিস্থিতির মূলে রয়েছে অবক্ষয়, প্রধানতঃ ক্ষমতার লালসা বা অন্যভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থের প্রাধান্য। এরূপ সামাজিক পরিস্থিতিতে বস্তুনিষ্ঠ মুক্ত মন এবং জ্ঞানের ক্রমনবায়নের অভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতি একটি একান্ত আনুষ্ঠানিক, নিষ্প্রাণ এবং সৃষ্টিবিমুখ রূপ পরিগ্রহ করে থাকে।"[৫]

মহান ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে তার যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে জাতির নবজাগরণ এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় এক রক্তাক্ত সূচনা। যতদিন দেশের এক বিরাট অংশ একটি সুন্দর এবং পরিপূর্ণ জীবনের অধিকার হতে বঞ্চিত থাকবে ততদিন মহান ভাষা আন্দোলন অসমাপ্ত থাকবে। তেমনি যতদিন দেশের অধিকাংশ জনগণ তাদের মৌলিক মানবিক অধিকার হতে বঞ্চিত থাকবে,—স্বাধীনতা সংগ্রামের মৌল লক্ষ্য অর্জিত হবে না।

ক্ষমতার অভিলাষ এবং ব্যক্তি স্বার্থ উভয়ই রাজনীতিতে সুপরিচিত ঘটনা। পরিপক্ক এবং বিজ্ঞ রাজনীতিবিদগণ এই অভিলাষ এবং স্বার্থ চরিতার্থ করার অপরিহার্য সোপান হিসেবেই বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়াসী হন। অন্যথায়, ব্যক্তি ও জাতি উভয়কেই ক্ষতবিক্ষত হতে দেখা যায়। অবশ্য ইতিহাসে বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে রাষ্ট্রনায়কসুলভ প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি এবং মনোভাব রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহারে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। তেমনি, বিরল হলেও কোনরূপ রাজনৈতিক অভি-লাষ পোষণ না করে এবং রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হয়েও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ এবং নেতৃত্ব প্রদানের দৃষ্টান্ত বিভিন্ন দেশে রয়েছে। আমাদের দেশে ভাষা আন্দোলন তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের প্রধান রূপকার মানুষ। ইতিহাসে এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই যেখানে একটি অশিক্ষিত জাতি সুন্দর ও উন্নত জীবনের অধিকারী হয়েছে। তেমনি এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই যেখানে একটি শিক্ষিত জাতি অনির্দিষ্টকালের জন্য অনুন্নত থেকে গেছে।

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে নিরক্ষর, দরিদ্র ও মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণা, মূল্যবোধের শৃংখলে আবদ্ধ জনগোষ্ঠীর মানসিকতার পরিবর্তন যেমন প্রয়োজন, শিক্ষিত এবং বর্তমান সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মানসিকতার পরিবর্তনও জাতির অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। এদের মধ্যে বিরাজমান আদর্শগত মানসিক সংঘাত এবং পরস্পর বিরোধী মনোভাব জাতীয় অগ্র-গতির পথে প্রধান অন্তরায়। দৃষ্টান্ত, ক্ষয়িষ্ণু আচার ও প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত-নের জন্য সোচ্চার দাবীর পাশাপাশি সংস্কার বিরোধী কঠোর আন্দোলন। প্রকাশ্যে দুর্নীতি ও সমাজ বিরোধী কর্মের নিন্দা, কার্যত নিজের স্বার্থে ঐ নিন্দনীয় কাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন। গণতান্ত্রিক সমাজ-জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পাশাপাশি পরিলক্ষিত হয় মুক্তমনের অভাব, পর মতে অসহিষ্ণুতা এবং জাতীয় স্বার্থের উপর ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থের প্রধান্য।

এ সকল অন্তরায়ের মোকাবেলায় জাতীয় চেতনাকে উজ্জীবিত রাখতে এবং জাতীয় উন্নয়নের আশা আকাঙ্ক্ষাকে কাঙ্ক্ষিত রূপ প্রদানে রাজনৈতিক প্রেরণা ও রাষ্ট্রনায়কসুলভ নেতৃত্বের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে বাংলাদেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে মুক্তবুদ্ধি চিন্তাবিদ, যাঁরা রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে

জড়িত নন, তাঁদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা-দেশের জনগণ পৃথিবীর এই অষ্টম বৃহত্তম দেশটিকে তার যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যে আদর্শদীপ্ত মহান ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তা যেমন বিশ্বের সকল স্বাধীনতাকামী জনগণের প্রশংসা অর্জন করে, তেমনি জাতির অগ্রগতির পথে প্রেরণার এক চিরন্তর উৎস সঞ্চারিত করে। জাতিত্বে, ভাষায়, ধর্মে ও সংস্কৃতিতে বিরাজমান সম-প্রকৃতিও বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্যের এক বিরল বৈশিষ্ট্য। জাতীয় সংহতির এক গৌরবময় ঐতিহাসিক ও সামাজিক উত্তরাধিকারের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ কেন বারবার রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে, এ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

এর উপর আলোক সম্পাতে জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে পণ্ডিত, গবেষক এবং চিন্তাবিদদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন অর্জনে সমসাময়িক বিশ্বে জ্ঞানে বিজ্ঞানে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে, তার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁদের অগ্রসর হতে হবে। বিশ্বের এই বেগবান জ্ঞান প্রবাহে তাদের প্রবেশের চেষ্টা করতে হবে। আমাদের জাতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের লক্ষ্যে বাংলা ভাষার মাধ্যমেই আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আত্মস্থ করতে হবে এবং এর কল্যাণকর প্রভাব সামগ্রিকভাবে জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে। তবেই মহান ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের স্বপ্ন "সকলের জন্য এক সুন্দর ও পরিপূর্ণ জীবন" বাস্তবায়িত হতে পারে। এ লক্ষ্যে বাংলা একাডেমীর প্রচেষ্টার পূর্ণ সাফল্য এবং একাডেমীর উত্তরোত্তর উন্নতি এবং অগ্রগতি কামনা করি। সকলকে আবার ধন্যবাদ।

১. বশীর আলহেলাল: বাংলা একাডেমীর ইতিহাস (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬) পৃঃ ৮
২. ঐ ঐ পৃঃ ৯
৩. ঐ ঐ পৃঃ ৯
৪. লিউ জাইকো, অধ্যক্ষ, লিটাবেসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, চাইনিজ একাডেমী অব সোসিয়েল সায়েনসেস, ("এশিয়া উইক" ১৬ নভেম্বর, ১৯৮৬, পৃঃ ২৩-২৪)
৫. মহম্মদ শামসুউল হক, "শিক্ষা, সমাজ ও উন্নয়ন" (বাংলা একাডেমী বক্তৃতা-১)

বার্ষিক সাধারণ সভায় মহাপরিচালকের প্রতিবেদন

১৯৮৫-৮৬

বিষয়সূচী

ভূমিকা

আজ (২৫-১২-৮৬ তারিখে) বাংলা একাডেমীর একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিগত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৩-১০-৮২ তারিখে। ১৯৮৩ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা ৩১-১২-৮৩ তারিখে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সত্ত্বেও ঐ সময় সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিধিনিষেধ থাকায় শেষ মুহূর্তে তা স্থগিত করতে হয়। উল্লিখিত সাধারণ সভায় সদস্যদের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮২-৮৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছিলো। উক্ত প্রতিবেদনটি পরে ডাকযোগে সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়। বর্তমান প্রতিবেদন ১৯৮৫-৮৬ অর্থ বছরের জন্য হলেও ১৯৮৪ এবং ১৯৮৫ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এই দুই বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণও পরিবেশিত হলো।

পূর্ববর্তী দুই অর্থ বছরের কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
১৯৮৩-৮৪

১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় পাঠ্যপুস্তক প্রকল্পে মোট ৪৭টি পুস্তক এবং পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত প্রকল্পে ৬৮টি পুস্তক ও ৮টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ বছরের প্রকাশনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলো 'ছোটদের অভিধান'। বাংলাভাষায় এ ধরনের অভিধান এই প্রথম। ১৬ হাজার শব্দ সম্বলিত, চার রঙ, অফসেটে ছাপা এই অভিধানটি মুদ্রণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ছয় লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়া যায়। এর সংকলন ও সম্পাদনার সম্পূর্ণ কাজ বাংলা একাডেমীর পনেরো জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত একটি দল সম্পন্ন করে, এবং এর সংকলনের প্রাথমিক কাজ থেকে শুরু করে মুদ্রণ যাবতীয় কাজ মাত্র আট মাসের মধ্যে শেষ করা হয়। ১৯৮৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর বাংলা একাডেমীর উনত্রিশতম প্রতিষ্ঠা দিবসে অভিধানটি প্রকাশিত হয়।

অমর একুশে অনুষ্ঠানমালা, গ্রন্থমেলা, বৈশাখী মেলা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদ্‌যাপন এবং অন্যান্য নিয়মিত বাৎসরিক অনুষ্ঠানের আয়োজন

ছাড়াও বাংলা একাডেমী ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে দুটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করে। একটি হচ্ছে ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত চতুর্দশ ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন উপলক্ষে ইসলামী বই ও লোকশিল্প প্রদর্শনী, অন্যটি বুদ্ধিজীবী স্মৃতি প্রদর্শনী।

ইসলামী বই ও লোকশিল্প প্রদর্শনী ৫ ডিসেম্বর থেকে ১২ই ডিসেম্বর '৮৩ পর্যন্ত চলে। ইসলামী শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার মহাপরিচালক জনাব এ বুত্তালেব সহ দেশী-বিদেশী বহু পণ্ডিত ও সংস্কৃতিসেবী প্রদর্শনীটি দেখতে আসেন।

১৪ জন শহীদ বুদ্ধিজীবীর ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৩ সালের ১৪ই থেকে ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। যেসব বুদ্ধিজীবীর জিনিসপত্র প্রদর্শিত হয় তাঁরা হলেন: ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব, ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সার, রাশীদুল হাসান, আনোয়ার পাশা, ডঃ ফজলে রাব্বি, নিজামউদ্দিন আহমদ, আলতাফ মাহমুদ, জহির রায়হান, ডঃ মোহাম্মদ মোর্তজা, গিয়াসউদ্দিন আহমদ ও সৈয়দ নাজমুল হক।

এ বছরে 'বাংলা একাডেমী বক্তৃতামালা'র প্রবর্তন করা হয়। এই বক্তৃতামালার জন্য একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদ তিনটি ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেন: (ক) বিজ্ঞান, (খ) সমাজ-বিজ্ঞান, এবং (গ) ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি। ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ মাসের মধ্যে ৬টি বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা ছিলেন: প্রফেসর আনিসুজ্জামান ('পুরনো বাংলা গদ্য'), প্রফেসর আবু রুশদ মতিনউদ্দীন ('শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ: তাঁদের উপন্যাস'), প্রফেসর এ. এম. হারুন অর রশীদ ('বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের সামাজিকতা ও দার্শনিক পটভূমি এবং বাংলাদেশে বিজ্ঞান-চর্চা'), প্রফেসর শিবনারায়ণ রায় ('সাহিত্যে আধুনিকতা') এবং ডঃ অসীম রায় ('বাংলায় সমন্বয়ধর্মী ইসলামী ঐতিহ্য')।

দীর্ঘদিন সংস্কারাভাবে ঐতিহ্যবাহী 'বর্ধমান ভবন' অত্যন্ত জীর্ণ দশায় এসে পৌঁছেছিলো। ভবনটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা ক'রে এই অর্থ বছরে এর স্থাপত্যরীতি অক্ষুণ্ন রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী সার্বিক সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একদল লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্থপতি ও প্রকৌশলীর ওপর এই সংস্কার কাজ

তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৮৩-৮৪ সালে কাজটি আরম্ভ করা হলেও পরবর্তী পর্যায়ে প্রাথমিক সংস্কার পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন সাধন এবং তজ্জনিত অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের বিলম্বের কারণে সংস্কার কাজটি সম্পন্ন করতে দুই বছর সময় লেগে যায়।

১৯৮৩ সালের শেষ দিকে বাংলা একাডেমী প্রথম বারের মতো প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। ২৮-৮-৮৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদার সংগে ৩ রা ডিসেম্বর বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বছরের বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখকদের সনদপত্র ও পুরস্কার প্রদান এবং একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠাদিবস ভাষণ প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। তবে ১৯৮৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর অনিবার্য কারণে প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপন করা সম্ভব হয় নি, ১৯৮৪ সালের ১১ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়।

১৯৮৪-৮৫

১৯৮৪-৮৫ অর্থবছরে উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত প্রকল্পে ১১১টি পুস্তক ও ১২ টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে'র ব্যঞ্জন বর্ণ অংশের মুদ্রণ কাজ এই বছর শেষ হয়। এই অভিধানের স্বরবর্ণ অংশ প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৭৪ সালে। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নজরুল রচনাবলীর সবকটি খণ্ড প্রকাশের কাজও সম্পূর্ণ হয়। এই বছরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা 'চরিতাভিধান'।

অমর একুশে '৮৫-তে 'মোদের গরব মোদের আশা' নামে একটি বিশেষ ক্যাসেট প্রকাশ করা হয়। ১৯৫২, '৫৩ ও' ৫৪ সালে প্রকাশিত ও প্রচারিত কবিতা, গান ও নাটকের নির্বাচিত অংশ এই ক্যাসেটে ধারণ করা হয়।

১৯৮৪ সালের বুদ্ধিজীবী দিবসে আরো ব্যাপক আকারে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি সংগ্রহের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে যেসব বুদ্ধিজীবী শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের অনেকের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এই প্রদর্শনীতে রক্ষিত হয়।

এই বছরে একাডেমী একটি বাংলা বর্ষপঞ্জী প্রকাশ করে। এতে সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতি তারিখে সংঘটিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়।

১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে সংস্কৃতি পরিষদ ও বাংলা একাডেমীর যৌথ উদ্যোগে প্রথম বারের মতো বাংলা একাডেমীতে বিজ্ঞান-লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বে ঢাকায় বা এদেশের অন্য কোথাও বিজ্ঞান-লেখকদের কোনো সম্মেলন হয় নি। তিনদিন ব্যাপী 'বিজ্ঞান-লেখক সম্মেলন ১৩৯২' -এ ঢাকার বাইরে থেকেও বহু বিজ্ঞান-লেখক যোগদান করেন। সম্মেলনের কার্যবিবরণী (পঠিত প্রবন্ধাবলী সহ) 'বিজ্ঞান-লেখক-সম্মেলন ১৩৯২' নামে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৮৪-৮৫ সালে বাংলা একাডেমী বক্তৃতামালা কর্মসূচীতে মোট ৬টি বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা ছিলেন: প্রফেসর আহমদ শরীফ ('মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা'), প্রফেসর মুহম্মদ শামস-উল-হক ('জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা'), প্রফেসর শওকত ওসমান ('সংস্কৃতির চড়াই-উৎরাই'), প্রফেসর মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ('বাঙালী মুসলমানের জাগরণ'), জনাব গাজী শামসুর রহমান ('আইনের দর্শন বিষয়ক চিন্তা') ও প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান ('শিল্প চিন্তা')।

এ বছরে বেশ কিছু নতুন নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: কাফেটারিয়া ভবন নির্মাণ, নামাজ ঘর নির্মাণ এবং গুদামঘরের তেতলা নির্মাণ। দীর্ঘদিন থেকে বাংলা একাডেমীতে কোনো ক্যাণ্টিন নেই। তাছাড়া, একটি পুরাতন নিম্নমানের টিনশেডে একাডেমীর পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র এবং ব্যাংক অবস্থিত ছিলো। নিচতলায় ব্যাংক ও পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র, দোতলায় আধুনিক কাফেটারিয়া এবং তেতলায় অতিথি কক্ষের জন্য একটি ত্রিতল ভবনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। অগ্রণী ব্যাংক থেকে অগ্রিম নিয়ে কাফেটারিয়া ভবনের নিচতলার কাজ শেষ হয়েছে এবং ব্যাংক ও বিক্রয়কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়েছে। এই বছরে নির্মাণের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে নামাজঘরটি ব্যবহারোপযোগী করে দেওয়া হয়। গুদামঘরের তেতলা নির্মাণের পরিকল্পনা এই বছরে করা হলেও প্রকৃত কাজ পরবর্তী অর্ধবছরের আগে শুরু করা সম্ভব হয় নি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৮৫-৮৬

১. বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিবরণ

১৯৮৫-৮৬ অর্থবছর ছিলো তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম বছর। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় বাংলা একাডেমীর তিনটি প্রকল্প সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। প্রকল্পগুলি হচ্ছে:

(ক) তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ সম্বলিত উচ্চশিক্ষাস্তরে বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে ৩০০টি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে।

(খ) এক কোটি বাষট্টি লক্ষ বায়ান্ন হাজার ব্যয়-বরাদ্দ সম্বলিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে ১৯০টি গ্রন্থ এবং ৭০টি পত্রিকা প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে।

(গ) বাংলা মুদ্রাক্ষরযন্ত্রের উন্নতিসাধন ও বৈদ্যুতিকীকরণ। এই প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্দ পঁচিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচ শত টাকা।

১৯৮৫-৮৬ সালে সরকার অনুমোদিত বার্ষিক উন্নয়ন মঞ্জুরীর বাইরে ফোকলোর উন্নয়ন প্রকল্পে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন থেকে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি অনুদান হিসেবে পাওয়া যায়।

১.১ উচ্চশিক্ষা স্তরে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশন প্রকল্প

১৯৮৫-৮৬ অর্থবছরে এই প্রকল্পে ব্যয় হয় প্রায় ৪৮'৬৪ লক্ষ টাকা। বিজ্ঞান বিষয়ক ২৯টি এবং অন্যান্য বিষয়ের ২৬টি—মোট ৫৫টি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই ৫৫টি পুস্তকের মধ্যে রয়েছে পাঠ্য ও সহায়ক গ্রন্থ প্রথম সংস্করণ ৪২টি, পরিভাষা কোষ বা শব্দকোষ জাতীয় পুস্তক ৬টি এবং পূর্ব প্রকাশিত পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ ৭টি।

১.২ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প

এই প্রকল্পে গত অর্থবছরে ব্যয় হয় ৫১'৫০ লক্ষ টাকা এবং ৫১টি ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত পুস্তক, ১১টি পত্রিকা ও ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালার ১০১টি পুস্তক—মোট ১৬৩টি পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৮৬-এর অমর একুশে উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তকসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা। এই গ্রন্থমালায় জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিচিত্র প্রসঙ্গ নিয়ে

স্বল্প পরিসরে সহজবোধ্য ভাষায় সাধারণ পাঠকদের জন্য ১০১টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থমালার প্রতিটি বইয়ের দাম রাখা হয়েছে মাত্র পনের টাকা।

১.৩ বাংলা মুদ্রাক্ষরযন্ত্রের উন্নতি সাধন বৈদ্যুতিকীকরণ প্রকল্প

তিন বছর মেয়াদী এই প্রকল্পের দু'টি প্রধান দিক: (১) বর্তমান মুনীর অপটিমা মুদ্রাক্ষরযন্ত্রের কী-বোর্ডের প্রয়োজনীয় সংস্কার করে এর উপযোগিতা ও গতি বৃদ্ধি করা, সেই সঙ্গে এর যান্ত্রিক দিকের উন্নয়ন; (২) বাংলা ইলেক-ট্রনিক মুদ্রাক্ষরযন্ত্র নির্মাণ।

১৯৮৫-৮৬ অর্থবছরে কী-বোর্ডের সংস্কার সম্পর্কে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের পর্যালোচনা করে একটি সমন্বিত সুপারিশের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.৪ ফোকলোর উন্নয়ন প্রকল্প

ফোকলোর চর্চার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ১৯৮৫-৮৬ সালে ফোর্ড ফাউণ্ডে-শনের সহযোগিতা ও অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমী একটি প্রকল্প গ্রহণ করে এবং তার প্রথম পর্যায় বাস্তবায়নের কাজ এই বৎসর সম্পন্ন হয়। দেশ ব্যাপী ব্যাপক জরিপ কাজ চালানো হয় এবং এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৮৫ থেকে ২১শে জানুয়ারী ১৯৮৬ পর্যন্ত চার সপ্তাহ ব্যাপী বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় ফোকলোর কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্ম-শালার উদ্বোধন করেন উপমহাদেশের প্রবীণ ফোকলোরবিদ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন। কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দানের জন্য আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ও লোকতত্ত্ববিদ প্রফেসর অ্যালান ডাণ্ডিস এবং ভারতের ডঃ জহরলাল হাণ্ডু ও শ্রী শঙ্কর সেন গুপ্ত প্রশিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ডঃ মযহারুল ইসলাম, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী প্রমুখ বাংলা-দেশের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণও কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে নির্বাচিত ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন। সরেজমিনে প্রশিক্ষণ দানের জন্য তাঁদেরকে কুমিল্লার ময়না-মতি, ঢাকার সোনারগাঁ, রূপসী, ধামরাই ও সাভার, মানিকগঞ্জের সিংগাইর ও চারিগ্রাম প্রভৃতি ফোকলোরের উপাদানসমৃদ্ধ অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়।

কর্মশালায় বাংলা একাডেমীর অধীনে একটি ফোকলোর ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. নির্মাণ ও সংস্কার

১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৪-৮৫ সালে সূচিত বেশ কিছু নির্মাণ ও সংস্কার কাজ ১৯৮৫-৮৬ অর্থবছরে শেষ করা হয়েছে। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে বর্ধমান ভবন সংস্কার, কাফেটারিয়া ভবনের নিচতলা নির্মাণ, নামাজ ঘর নির্মাণ, পুকুর পাড় ভরাট ও সংস্কার, এবং ট্রান্সফরমার স্থাপন। বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার উন্নয়নের লক্ষ্যে গুদামঘরের তেতলার নির্মাণ কাজ ৮৫-৮৬ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার কথা থাকলেও অনিবার্য কারণে কাজটি শেষ করা সম্ভব হয় নি, বর্তমান অর্থবছরে এই কাজ শেষ হবে। অর্থাভাবে কাফেটারিয়া ভবনের দোতলা নির্মাণের কাজেও হাত দেওয়া সম্ভব হয় নি। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি সংস্কারকৃত বর্ধমান হাউসের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদ রফিকের অশীতিপর বৃদ্ধা মাতা রাফিজা খাতুন। ৭ই মার্চ ১৯৮৬ তারিখে একাডেমীর নতুন বই বিক্রয় কেন্দ্র উদ্বোধন করেন জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক।

৩. অমর একুশে '৮৬ উদ্‌যাপন

অমর একুশে '৮৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১লা ফেব্রুয়ারি '৮৬ সকাল দশটায় একাডেমী প্রাঙ্গণে শিশু কিশোরদের এক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। "রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন" শীর্ষক এই প্রতিযোগিতায় প্রায় সাড়ে চারশত শিশু-কিশোর অংশ গ্রহণ করে।

৭-২-৮৬ তারিখে গ্রন্থমেলা উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন সভায় প্রবীণ প্রকাশক জনাব মহিউদ্দীন আহমদকে বাংলা একাডেমী এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়।

৮ই থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সূচনা পর্বের কার্যক্রমে প্রতিদিন বাংলা একাডেমীর প্রকাশিত এক বা একাধিক পুস্তক আলোচিত হয় এবং সংগীত পরিবেশিত হয়।

১৫ থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় মূল অনুষ্ঠানমালা। সাত দিনের আলোচনা-সভার বিষয়গুলি ছিলো: "বাংলার সমাজ চিন্তা: ঐতিহ্য ও বিবর্তন", "জ্যোতির্বিজ্ঞান: নতুন দিগন্ত", "সমকালীন সাহিত্যে

লোক উপাদানের ব্যবহার", বাংলা ভাষায় দর্শন চর্চা", "বাংলা মুদ্রণযন্ত্র: পঞ্চানন কর্মকার ও তৎপরবর্তী ধারা", "একুশের মূল্যবোধ: সাহিত্যের উৎস সন্ধান এবং একুশ আমাদের পরিচয়"। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ১৬-২-৮৬ তারিখে শিল্পী শাহাবুদ্দীনের "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন শিল্পী কামরুল হাসান। ২০-২-৮৬ তারিখে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

২৩ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৬দিন অনুষ্ঠিত হয় একুশোত্তর অনুষ্ঠানমালা। ২৩ তারিখে 'ভাষা আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমী ও বাংলাদেশ গবেষণা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে। পরবর্তী পাঁচ দিন 'আমার লেখা' শীর্ষক বিশেষ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দেশের খ্যাতনামা ১১জন লেখক। এঁরা হচ্ছেন সর্বজনাব আবুল হোসেন, রাবেয়া খাতুন, নির্মলেন্দু গুণ, বেগম লায়লা সামাদ, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আবু রুশদ মতিন উদ্দীন, শওকত ওসমান, ফজল শাহাবুদ্দিন, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সানাউল হক এবং সাঈদ আহমদ।

৪. গ্রন্থমেলা

অন্যান্য বছরের মতো এবারও বাংলা একাডেমী বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহযোগিতায় অমর একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজন করে। ৭-২-৮৬ তারিখে শুরু হয়ে ২৮-২-৮৬ পর্যন্ত এই মেলা চলে। ১৯৮৫ সালের গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিলো ৫৫ এবং স্টলের সংখ্যা ৮২, এবার ১০২টি স্টল নিয়ে ৬৪টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেন। যেসব প্রকাশক আগের এক বছরে কমপক্ষে তিনটি গবেষণামূলক কিংবা সাহিত্যের বই প্রকাশ করেছেন, গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদেরকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

বাংলা একাডেমী গত ৩১-১০-৮৫ থেকে ৯-১১-৮৫ পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের বইমেলায় অংশগ্রহণ করে। ২৪শে অক্টোবর থেকে ৩০শে অক্টোবর '৮৫ পর্যন্ত বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলাতে বাংলা একাডেমীর কিছু বই প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

৫. বর্ষবরণ ও বৈশাখী মেলা

প্রতি বছরের মতো এবছরও বাংলা একাডেমী বর্ষবরণ উপলক্ষে ১৩৯৩ সালের ১লা থেকে ৭ই বৈশাখ (১৫—২১এপ্রিল ১৯৮৬) পর্যন্ত কুটির শিল্পের প্রদর্শনী, বই মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই উপলক্ষে ২রা বৈশাখে একাডেমী প্রাঙ্গণে শিশু-কিশোরদের জন্যে 'গ্রাম বাংলা' শীর্ষক এক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৪ঠা বৈশাখ ১৩৯৩ (১৮ই এপ্রিল ১৯৮৬) তারিখে বর্ধমান হাউসে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের একক চিত্র-প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন শিল্পী কামরুল হাসান। ২৪-৪-৮৬ পর্যন্ত সাত দিন সর্ব সাধারণের জন্য এই প্রদর্শনী খোলা রাখা হয়। ময়মনসিংহের জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা ও বেগম আবেদিনেব সৌজন্যে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা সম্ভব হয়।

৬. শহীদুল্লাহ জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বাংলা একাডেমী গত ১০-৭-৮৫ থেকে ১৩-৭-৮৫ পর্যন্ত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে।

এই উপলক্ষে বাংলা একাডেমী ১০, ১২, এবং ১৩ই জুলাই তিনটি আলোচনা-সভার আয়োজন করে। আলোচনার বিষয় ছিলো যথাক্রমে "ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : তাঁর জীবন ও সমকাল", "বাংলা একাডেমী ও ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ" এবং "ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ"। ১১-৭-৮৫ তারিখে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা উপলক্ষেও একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ১০-৭-৮৫ থেকে ১৩-৭-৮৫ তারিখ পর্যন্ত চারদিন ব্যাপী ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জীবন ও কর্মভিত্তিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য-যে উপমহাদেশের এই খ্যাতনামা পণ্ডিত বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত "আঞ্চলিক ভাষার অভিধান"-এর প্রধান সম্পাদক হিসেবে ১৯৬০ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর বাংলা একাডেমীর সাথে যুক্ত ছিলেন।

৭. রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

এ বছর দেশে-বিদেশে সাড়ম্বরে রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বাংলা একাডেমী রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন

২৫শে বৈশাখ থেকে মৃত্যুদিন ২২শে শ্রাবণ পর্যন্ত প্রায় তিন মাস ব্যাপী একটি অনুষ্ঠানমালার পরিকল্পনা করে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২৫শে বৈশাখের (৯-৫-৮৬) আলোচনা, আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান ছাড়াও রবীন্দ্র বিষয়ক সাতটি বক্তৃতার আয়োজন করা হয় এবং ছয়টি গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা নেয়া হয়। এর মধ্যে তিনটি বক্তৃতা গত অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর অম্লান দত্ত 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন' (২৫-৫-৮৬), ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন 'রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-চিন্তা' (১৫-৬-৮৬) এবং ডক্টর সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম 'রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ সাহিত্য' (২৫-৬-৮৬) বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিকল্পিত ছয়টি গ্রন্থের মধ্যে দু'টি গ্রন্থ গত অর্থ বছরে এবং অন্য চারটি গ্রন্থ বর্তমান অর্থ বছরে প্রকাশিত হয়।

৮. বাংলা একাডেমীর ৩১-তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

৩রা ডিসেম্বর ১৯৮৫ তারিখে বাংলা একাডেমীর একত্রিশতম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক এবং 'প্রতিষ্ঠাদিবস ভাষণ' দেন অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। অনুষ্ঠানে ১৯৮৪ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকদের এবং একাডেমীর প্রবীণতম কর্মচারী জনাব আবদুল কুদ্দুস পাটোয়ারীকে সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে 'ধ্রুপদী' শীর্ষক অনুষ্ঠানে রাগাশ্রয়ী বাংলা গান ও যন্ত্রসংগীত পরিবেশিত হয়।

৯. বাংলা একাডেমী বক্তৃতামালা

এ বছর বাংলা একাডেমী বক্তৃতামালায় দুইজন বক্তা অংশগ্রহণ করেন। ১৩-১-৮৬ তারিখে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজী অনুবাদক উইলিয়াম রাডিচে রবীন্দ্র রচনাবলীর ইংরেজী অনুবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। ২২,২৩ ও ২৪শে জানুয়ারী আবু জাফর শামসুদ্দীন "বাঙালির সমন্বিত লোক-সংস্কৃতি' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন।

১০. অন্যান্য অনুষ্ঠান

১৯৮৫-৮৬ অর্থবছরে আয়োজিত অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে: ১১-৭-৮৬ তারিখে মরহুম কবি আহসান হাবীবের মৃত্যু বার্ষিকীতে 'স্মরণ

সভা', ২২শে শ্রাবণ ১৩৯২, ৭ই আগস্ট ১৯৮৫ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে 'নতুন নতুন হে' শীর্ষক আলোচনা সভা, আবৃত্তিসহ নৃত্য ও সংগীতানুষ্ঠান; ২৯-৮-৮৫ তারিখে কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে' 'তরুণ অরুণ বীণা' শীর্ষক স্মরণ সভায় একক আলোচনা, নাট্যাভিনয় ও সংগীতানুষ্ঠান; ৮-১১-৮৫ তারিখে ইন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটি মূল পত্রের হস্তান্তর অনুষ্ঠান; ৯-১২-৮৫ তারিখে বেগম রোকেয়ার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বেগম রোকেয়ার রচনা থেকে পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠান; ১৪-১২-৮৫ তারিখে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে আলোচনা সভা; 'বিজয় দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৫-১২-৮৫ তারিখে নীলদর্পণ নাটকের মঞ্চায়ন এবং ১৬-১২-৮৬ তারিখে আলোচনা সভা, আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান; ৪-২-৮৬ তারিখে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ সভা; ২৬-৩-৮৬ তারিখে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান; ২৬-৫-৮৬ তারিখে কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা সভা, আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান; ২৮-৫-৮৬ তারিখে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা সভা; ১৯-৬-৮৬ তারিখে বিজ্ঞান সংস্কৃতি পরিষদের সহযোগিতায় বিজ্ঞান লেখক সম্মেলন ১৩৯৩, এবং ২৯-৬-৮৬ তারিখে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা।

১১. কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা

১৯৮৫-৮৬ অর্থবছরে বাংলা একাডেমী কার্যনির্বাহী পরিষদের মোট চল্লিশটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ১৯টি ছিলো সাধারণ সভা, ২১টি বিশেষ সভা।

১২. বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারের লক্ষ্য ছিলো বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সম্পদ সংগ্রহ করা। বর্তমানে বাংলা একাডেমীর সংগ্রহে প্রায় ৭০,০০০ বই, ১২,০০০ বাঁধাই পত্রিকা এবং ৪০,০০০ খোলা পত্রিকা রয়েছে। বহু পুরনো ও দুর্লভ বই ও পত্রিকা

এই সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া রয়েছে ঢাকা থেকে বিগত বছর-গুলিতে প্রকাশিত একুশের সংকলনের প্রায় সব সংখ্যা।

পূর্বে বাংলা একাডেমীর সদস্য, ফেলো এবং গবেষকগণই কেবল একা-ডেমীর গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারতেন। গত বছর সকল স্তরের পাঠকের জন্যই গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে।

বর্ধমান ভবনের সংস্কারের কারণে ১৯৮৫ সালে নবনির্মিত গুদামভবনের দোতলায় বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার স্থানান্তর করা হয়। সেখানে একটি সুসজ্জিত পাঠকক্ষও নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারকে পুনরায় বর্ধমান ভবনে স্থানান্তবের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

১৩. বাংলা একাডেমী প্রেস

বাংলা একাডেমী প্রেস বাংলা একাডেমীর অংশ হলেও সরকার প্রবর্তিত শিল্প আইন ও বিধি অনুযায়ী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রেসের স্ব-উপার্জিত অর্থেই এর সকল ব্যয় নির্বাহ করতে হয়।

পূর্ববর্তী দুই বছরে মুনাফা করলেও বাংলা একাডেমী প্রেস ১৯৮৫-৮৬ অর্থবছরে মুনাফা করতে পারে নি। ঐ বছরে প্রাক্কলিত কাজের বা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নানা কারণে অর্জিত হতে পারে নি, এবং প্রকৃত আয়ের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় বেশী হওয়ায় প্রায় ৬লক্ষ টাকা লোকসান হয়। অর্থাভাবে প্রয়োজনীয় মনো ডাইকেস এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ ক্রয় করতে না পারায় উৎপাদন আংশিকভাবে ব্যাহত হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে এই সংকট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চলছে।

পরিশিষ্ট—ক

বাংলা একাডেমীর সংগঠন ও জনশক্তি

সংসদ সভাপতি*

১-৭-৮৫ তারিখের কার্যনির্বাহী পরিষদ

সভাপতি: মহাপরিচালক জনাব কাজী মো: মনজুরে মওলা**

সদস্যবৃন্দ

১। ডঃ আনোয়ার হোসেন
২। ডঃ এ.এম. হারুন অর রশীদ
৩। ডঃ ফারুক আজিজ খান
} বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত।

৪। ডঃ আবদুর রহীম খোন্দকার—চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

৫। জনাব মুহম্মদ ফারুক---চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

৬। ডঃ আলাউদ্দিন আল-আজাদ—সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের প্রতিনিধি।

৭। জনাব গোলাম হোসেন—অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি।

৮। জনাব সানাউল হক নির্বাচিত প্রতিনিধি (কার্যকালের মেয়াদ সম্প্রসারিত)

৯। জনাব আবুল হোসেন
১০। প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
} বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসেবে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সহযোজিত।

১১। জনাব মঈনুল হাসান—সচিব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩০-৬-৮৬ তারিখের কার্যনির্বাহী পরিষদ

সভাপতি: মহাপরিচালক: ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল***

সদস্যবৃন্দ

১। ডঃ আনোয়ার হোসেন
২। ডঃ এ.এম. হারুন অর রশীদ
৩। ডঃ ফারুক আজিজ খান
} বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত।

---

* ১৯৮৫-৮৬ সালে বাংলা একাডেমীর সভাপতির পদ শূন্য ছিল।

** কার্যকাল: ১১-৩-৮৬ তারিখ পযন্ত।

*** কার্যকাল শুরু ১১.৩.৮৬ তারিখ থেকে।

৪। জনাব মোল্লা এবাদত হোসেন—চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

৫। জনাব মুহম্মদ ফারুক—চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

৬। ডঃ আলাউদ্দিন আল-আজাদ—সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের প্রতিনিধি।

৭। জনাব গোলাম হোসেন—অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি।

৮। জনাব সানাউল হক—নির্বাচিত প্রতিনিধি (কার্যকালের মেয়াদ সম্প্রসারিত)।

৯। জনাব আবুল হোসেন
১০। প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী } বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসেবে পরিষদ কর্তৃক সহযোজিত।

১১। জনাব মঈনুল হাসান—সচিব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বাংলা একাডেমীর বিভাগ ও উপবিভাগসমূহ

(ক) পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন ৪টি বিভাগ,

১. গবেষণা'-সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ

২. ভাষা-সাহিত্য'-সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ

৩. পাঠ্যপুস্তক বিভাগ

৪. প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ

(খ) গ্রন্থাগার (পরিচালকের সমমর্যাদাসম্পন্ন প্রধান গ্রন্থাগারিকের নিয়ন্ত্রণাধীন)

(গ) মহাপরিচালকের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন সমন্বয় ও জনসংযোগ উপবিভাগ এবং সচিবের নিয়ন্ত্রণাধীন ৩টি উপবিভাগ:

১. হিসাব রক্ষণ ও বাজেট, ২. পরিষদ, ৩. বিপণন ও বিক্রয়-উন্নয়ন।

উপপরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট ১৮টি উপবিভাগ

১. গবেষণা ২. সংকলন ৩. ফোকলোর ৪. ভাষা ও সাহিত্য ৫. সংস্কৃতি ৬. পত্রিকা ৭. সাপ্তাহিকী ৮. ভৌতবিজ্ঞান ও প্রকৌশল ৯. জীববিজ্ঞান, কৃষি ও চিকিৎসা বিজ্ঞান ১০. সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য ১১. প্রাতিষ্ঠানিক ১২. পরিকল্পনা ১৩. ভাষা প্রশিক্ষণ ১৪. কারিগরী প্রশিক্ষণ ১৫. বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন ১৬. হিসাব রক্ষণ ও বাজেট ১৭. পরিষদ ১৮. সমন্বয় ও জনসংযোগ।

অনুমোদিত মোট পদের সংখ্যা ৩২৭। এর ভেতর মহাপরিচালক ১, সচিব ১, পরিচালক ৪, প্রধান গ্রন্থাগারিক ১, উপপরিচালক ও সমপর্যায়ের ২৪, সহ-পরিচালক ও সমপর্যায়ের ২৩, অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর পদ ৪৯, দ্বিতীয় শ্রেণীব পদ ৩৬, তৃতীয় শ্রেণীর পদ ১১৪ এবং চতুর্থ শ্রেণীর পদ ৭৪টি।

বাংলা একাডেমীর জনশক্তি (৩০-৬-৮৬ তারিখে)

৩০-৬-৮৬ তারিখে অনুমোদিত কর্মশক্তির বিপরীতে কর্মরত জনশক্তির চিত্র :

ক্রমিক নং	পদনাম ও শ্রেণী	অনুমোদিত জনশক্তি	কর্মরত জনশক্তি	শূন্যপদ
১।	মহাপরিচালক	১	১	—
২।	সচিব	১	১	—
৩।	প্রথম শ্রেণীর পদ	১০১	৯৯	
৪।	দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ	৩৬	২৩	১৩
৫।	তৃতীয় শ্রেণীর পদ	১১৪	৪৯	৬৫
৬।	চতুর্থ শ্রেণীর পদ	৭৪	৬৭	৭
	মোট	৩২৭	২৪০	৮৭

..৮৫-৮৬ অর্থবছরে একজন উপপরিচালক নিয়েনে পশ্চিম জার্মানীতে কর্মরত এবং একজন সহ-পরিচালক শিক্ষা ছুটিতে ভারতে ছিলেন।

বাংলা একাডেমী প্রেসের জনশক্তি

৩০-৬-৮৬ তারিখে অনুমোদিত কর্মশক্তির বিপরীতে কর্মরত জনশক্তির চিত্র :

ক্রমিক নং	পদ ও শ্রেণী	অনুমোদিত জনশক্তি	কর্মরত জনশক্তি	শূন্যপদ
১।	প্রথম শ্রেণী	৪	২	২
২।	দ্বিতীয় শ্রেণী	১	১	—
৩।	তৃতীয় শ্রেণী	১১	১১	—
৪।	চতুর্থ শ্রেণী	১৩	১১	২
৫।	টেকনিক্যাল স্টাফ	১০৩	৯৪	৯
	মোট :	১৩২	১১৯	১৩

ফোকলোর কর্মশালা

প্রথম আঞ্চলিক ফোকলোর কর্মশালা : জামালপুর

দ্বিতীয় আঞ্চলিক ফোকলোর কর্মশালা : সিলেট

দ্বিতীয় জাতীয় ফোকলোর কর্মশালা : ঢাকা

প্রথম আঞ্চলিক ফোকলোর কর্মশালা-১৯৮৬
জামালপুর

বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় জামালপুরে ৩০ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৬ তারিখ পর্যন্ত চার দিন ব্যাপী প্রথম আঞ্চলিক ফোকলোর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব নূরুল ইসলাম খান। কর্মশালা সম্পর্কিত প্রতিবেদন পেশ করেন একাডেমীর গবেষণা-সংকলন ও ফোকলোর বিভাগের পরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান।

৩০-১১-৮৬ তারিখ সকাল সাড়ে এগারটায় জামালপুর পাবলিক হলে কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রধান অতিথি মাননীয় স্পীকার জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকা ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প এবং দেশীয় সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, এ দেশের পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে সর্বত্র দেশীয় লোকশিল্প, সংস্কৃতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এগুলো সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। এখনো পল্লীর নিভৃত প্রান্তে বাউল সুর করে গান গায়, জারি-সারি-ভাটিয়ালি গান আমাদের মুগ্ধ করে কিন্তু তাদের সে কথার মালাকে আমরা গেঁথে রাখতে সমর্থ হইনি। অবিলম্বে ক্যাসেটের মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করা দরকার। যে জাতি তার ইতিহাসকে ভুলে যায়, তার সংস্কৃতিকে ভুলে যায় সে জাতি কখনই উন্নত হতে পারে না, সে দেশের সংস্কৃতি ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে পারে না। লোকজ শিল্প ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণের জন্য জনগণ এবং বাংলা একাডেমীকে এগিয়ে আসা উচিত।

সভাপতির ভাষণে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, বাংলা একাডেমী ইতিমধ্যেই ফোকলোর বিষয়ক ৪৯টি সংকলন করেছে এবং এ বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ভারতের বিশিষ্ট ফোকলোর গবেষক ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় এবং বাংলাদেশের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ প্রমুখ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। কর্মশালার বিষয় ছিল বাংলাদেশের লোকশিল্প। শ্রেণীকক্ষ পাঠদান পদ্ধতিতে পরিচালিত এই কর্মশালায় দশজন প্রশিক্ষণার্থী এবং ষোলজন পর্যবেক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

৩০-১১-৮৬ তারিখ বিকেলে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণ জামালপুরের বজরাপুরের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প পল্লীতে শিক্ষা সফরে যান। এখানে প্রশিক্ষণার্থীগণকে মৃৎশিল্পের উপকরণ, মাটি প্রস্তুত করার পদ্ধতি, কুম্ভকারের চাকা, পোড়ানো পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে সরেজমিনে অবহিত করা হয়।

বিকেল সাড়ে চারটায় জামালপুব কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের শ্রেণীকক্ষে প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হয়। নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ প্রশিক্ষণার্থীদেব উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি বলেন, "বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফোকলোরের সংগ্রহ, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে বলে আমার মনে হয়"। তিনি একাডেমীর সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ও ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "প্রত্যেক মহান সাহিত্যের ভিত্তি হলো লোকসাহিত্য"। লোকসাহিত্য থেকে উপাদান, চিত্রকল্প, উপমা ইত্যাদি নিয়ে সাহিত্য ও শিল্পের নবনির্মাণ করা যায়। ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প, কাঁসা শিল্প ইত্যাদিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে নবনির্মাণের পথকে প্রশস্ত করতে এই কর্মশালার গুরুত্ব অপরিসীম।

২-১২-৮৬ তারিখ সকাল আটটায় জামালপুর থেকে প্রশিক্ষণার্থীসহ প্রশিক্ষকগণ ইসলামপুরের ঐতিহ্যবাহী কাঁসাশিল্প পল্লীতে শিক্ষা সফরে যান। এখানে তাঁরা কর্মরত শিল্পীদের কাঁসার কাজ প্রত্যক্ষ করেন। তাদের সাক্ষাৎকার এবং কাঁসাজাত দ্রব্যাদি তৈরীর পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেন।

৩-১২-৮৬ তারিখ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠান বিকেল ছয়টায় জামালপুর পাবলিক হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী। ডঃ সিদ্দিকী প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।

দ্বিতীয় আঞ্চলিক ফোকলোর কর্মশালা-১৯৮৭
সিলেট

বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহযোগিতায় সিলেটে দু'দিনব্যাপী আঞ্চলিক ফোকলোর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেটের সারদা হলে কর্মশালা উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মুসলিম চৌধুরী। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বাংলা একাডেমীর ফেলো এবং প্রবীণ সংস্কৃতিসেবী জনাব মোহাম্মদ নুরুল হক।

২৮ ও ২৯ জানুয়ারী ১৯৮৭-এ দু'দিন কর্মশালা চলে। কর্মশালার বিষয় ছিল 'বাংলাদেশের লোকসংগীত'। ভারতের সেণ্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ান ল্যাংগুয়েজেসের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ডঃ জহরলাল হাণ্ডু কর্মশালার প্রশিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ প্রমুখ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে যোগ দেন।

সভার বিশেষ অতিথি জনাব মোহাম্মদ নুরুল হক বাংলাদেশের ফোকলোরকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে বাংলা একাডেমীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। উদ্বোধনী ভাষণে একাডেমীর মহাপরিচালক বলেন যে, বাংলাদেশে ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বছরে আঞ্চলিক ফোকলোর কর্মশালার প্রথমটি জামালপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় আঞ্চলিক ফোকলোর কর্মশালা সিলেটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দ্বিতীয় জাতীয় ফোকলোর কর্মশালা ঢাকায় ৩ ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হবে। এই কর্মশালায় আমাদের দেশের ফোকলোর গবেষক ও সংগ্রাহকগণ ফোকলোর চর্চার আধুনিক ধারার সঙ্গে পরিচিত হবেন। আমাদের আত্ম-পরিচয় উদ্ধার ও সংস্কৃতির পুনর্গঠনের জন্য ফোকলোর চর্চা অত্যাবশ্যক। আজকের পৃথিবীতে ফোকলোরের বৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। ফোকলোরের বৈজ্ঞানিক চর্চা না হলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বপুরুষদের অবদান অবিশ্লেষিত থেকে যাবে।

বর্তমানে ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের এক দুস্তর ব্যবধান সূচিত হয়েছে। আমরা কারা ? আমাদের স্বরূপ কী ? ফোকলোর বিজ্ঞানের চর্চার মাধ্যমে আমরা আমাদের জাতীয় সত্তা আবিষ্কার করতে পারবো। প্রকৃতই যাঁরা জ্ঞানের সাধনা করবেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষ তাঁদেরকে স্মরণ করবে। নিয়মিতভাবে এ ধরনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলে প্রত্যেক বছর কিছু কিছু দক্ষ ফোকলোর কর্মী তৈরী হবেন। ভবিষ্যতে বাংলা একাডেমীকে কেন্দ্র করে একটি ফোকলোর ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমরা আশা করি।

আমাদের দেশ লোকসংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। আমাদের সংস্কৃতির নিজস্ব কোন চেহারা কি নেই ? নিশ্চই আছে। ফোকলোরের চর্চার মাধ্যমে আমরা আমাদের সংস্কৃতির সেই নিজস্ব চেহারাকে আবিষ্কার করতে পারব।

বাংলা একাডেমী সারাদেশে তার কর্মকাণ্ডকে সম্প্রসারিত করছে। বাংলা একাডেমী সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একটি আঞ্চলিক চেহারা আছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আঞ্চলিক চেহারা রয়েছে। কিন্তু বাংলা একাডেমী কোন আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান নয়। ভবিষ্যতে আমরা আরো অনেক বড় দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করতে পারব। এ ক্ষেত্রে ফোকলোর বিশেষ গুরুত্ব পাবে।

দ্বিতীয় জাতীয় ফোকলোর কর্মশালা-১৯৮৭
ঢাকা

বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে এবং ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহযোগিতায় দ্বিতীয় জাতীয় ফোকলোর কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ থেকে তিন সপ্তাহব্যাপী এই কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীন ফোকলোর বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

ফিনল্যাণ্ডের টুর্কু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোরিস্টিকসের প্রফেসর এবং নর্ডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোর বিশেষজ্ঞ প্রফেসর লরি হংকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিল-ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর ও ফোকলাইফের প্রফেসর হেনরি গ্লাসি এবং ভারতের কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের (মহীশূর) ফোকলোর বিভাগের প্রধান ডঃ জহরলাল হাণ্ডু কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। দেশের বিশিষ্ট ফোকলোর বিশেষজ্ঞগণ—ডঃ মযহারুল ইসলাম, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী ডঃ মুখলেসুর রহমান, আবদুল হাফিজ, তোফায়েল আহমদ, ডঃ হামিদা হোসেন, ডঃ আনোয়ারুল করীম ও ডঃ ওয়াকিল আহমদ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে যোগ দেন।

৩ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল। স্বাগত ভাষণে তিনি বলেন, আজ থেকে ৩৫ বছর আগে আমাদের দেশের যে সব সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল তরুণরা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন আমি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তখন থেকে আপন সংস্কৃতির সন্ধানে আমাদের যে যাত্রা শুরু হয়েছে বর্তমান ফোকলোর কর্মশালা তারই একটি অন্যতম পদক্ষেপ। তাঁরা বাংলা একাডেমীর কর্মকাণ্ডে এক অমোঘ সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করেছেন। আমি শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বর্তমানে বাংলা একাডেমীর কর্মকাণ্ড আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। ইতিমধ্যে জামালপুর ও সিলেটে দু'টি আঞ্চলিক ফোকলোর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রক্রিয়া যদি ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকে তাহলে কর্মশালার মাধ্যমে একদল দক্ষ কর্মী ও গবেষক তৈরী করা যাবে। আমাদের ফোকলোরের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন প্রফেসর মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। এদেশে পরবর্তীকালে যাঁরা এ কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন তাঁরা মনসুরউদ্দীনের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

বর্তমান বিশ্বে ফোকলোরের বৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠন হচ্ছে। জ্ঞানের এই ক্ষেত্রে গবেষকের সংখ্যা আমাদের দেশে খুবই নগণ্য। সেজন্য আমরা এই প্রকল্প গ্রহণ করেছি। একদিন বাংলা একাডেমীকে কেন্দ্র করে একটি ফোকলোর ইনস্টিটিউট গড়ে উঠবে বলে আমি আশা করি।

ফোকলোর শব্দটির একটি সর্বজনগ্রাহ্য বাংলা প্রতিশব্দ এখনো পাওয়া যায় নি। আমি নবীন ও প্রবীণ সবার কাছে শব্দটির একটি গ্রহণযোগ্য বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে বের করার আহবান জানাচ্ছি। ফোকলোর বিজ্ঞানের চর্চায় বাংলা একাডেমীর কর্মকাণ্ডে আমি সবার সহযোগিতা কামনা করি।

এরপর প্রকল্প পরিচালক, বাংলা একাডেমীর গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগের পরিচালক, জনাব শামসুজ্জামান খান তাঁর প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রফেসর লরি হংকো, প্রফেসর হেনরি গ্লাসি এবং ডঃ জহরলাল হাণ্ডু শুভেচ্ছা ভাষণ দেন। সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বলেন, পৃথিবীর সব মানুষের নিকট আমি ক্ষমা চাই। আমার জীবন অবসন্ন। চোখ, কান বা পা চলতে চায়না। বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা আমাদের জীবনে এক অসম্ভব কাণ্ড।

সংগীত সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার। শুধু বাণী দিয়ে কিছুই বুঝা যাবেনা। লোকসংগীত সংগ্রহের সংগে সংগে সুরও সংগ্রহ করতে হবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বাংলা একাডেমীর প্রতি আহবান জানাচ্ছি। বাংলা একাডেমী থেকে সব ধরনের বই প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। সুন্দর পরিবেশ না হলে সুন্দর জীবন হতে পারে না।।

বাংলা একাডেমীকে কেন্দ্র করে একটি ফোকলোর ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত জরুরী। ইংরেজী ভাষায় বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপক

দ্বিতীয় জাতীয় ফোকলোর কর্মশালা উপলক্ষে আয়োজিত কারুশিল্পীদের প্রদর্শনী
(ফেব্রুয়ারি '৮৭)
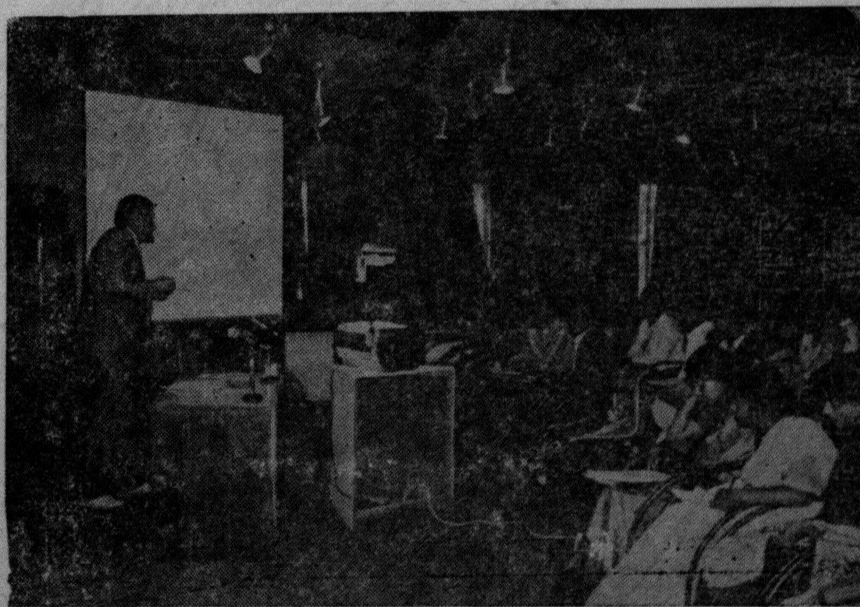
ফোকলোর কর্মশালায় ক্লাশ নিচ্ছেন প্রফেসর রি হংকো (ফেব্রুয়ারি '৮৭)

প্রচার হওয়া অত্যাবশ্যক। আমাদের দেশ ও জাতিকে জাগ্রত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এমনকি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ফোকলোর পঠন-পাঠন একান্ত হয়ে পড়েছে।

এই কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাছাই করা ২২ জন ফোকলোর সংগ্রাহক ও গবেষক প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় জাতীয় ফোকলোর কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচয়

১। রেবেকা হক, বি.এ. (অনার্স), এম.এ. (বাংলা)
প্রভাষক, ইডেন কলেজ
ঢাকা।

২। খগেশ কিরণ তালুকদার, বি.এ. (অনার্স), এম.এ. (বাংলা)
সহকারী অধ্যাপক
নজরুল কলেজ, ত্রিশাল
ময়মনসিংহ।

৩। মোহাম্মদ আশরাফউদ্দীন, এম.এ.
প্রভাষক
সরকারী জাহেদা সফির মহিলা কলেজ

৪। সরকার নূরুল মোমেন, বি.এ. (অনার্স), এম.এ. (বাংলা)
কালচারাল অফিসার
শিল্পকলা একাডেমী
টাংগাইল।

৫। রহিমা আখতার কল্পনা, এম.এ. (বাংলা)
গবেষণা সহকারী
কারিকা, ঢাকা।

৬। মোহাম্মদ নূরুল হক, বি.এ. (অনার্স), এম.এ. (বাংলা)
প্রভাষক
ভোলা সরকারী কলেজ
ভোলা।

৭। রওশন আরা, বি.এ. (অনার্স), এম.এ. (বাংলা)
গবেষক
৫২/৩, রোড নং ৫, কল্যাণপুর, ঢাকা

৮। প্রদীপ কান্তি মজুমদার, এম.এ. (বাংলা)
সহকারী অধ্যাপক
শেরপুর সরকারী কলেজ
শেরপুর।

৯। মুহম্মদ ফরিদউদ্দীন, এম.এ. (বাংলা)
সহকারী অধ্যাপক
শাহজাদপুর সরকারী কলেজ
সিরাজগঞ্জ।

১০। তপতী রাণী সরকার, এম.এ. (ভাষাতত্ত্ব),
এম.এফ.এল. (১ম বর্ষ ভাষাতত্ত্ব)
পিএইচ.ডি. গবেষক

১১। সৈকত আসগর, বি.এ. (অনার্স), এম.এ. (বাংলা)
পিএইচ.ডি. গবেষক
প্রভাষক
সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ
মানিকগঞ্জ।

১২। আবুবকর সিদ্দিক
কণ্ঠশিল্পী রেডিও/টিভি

১৩। মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন, বি.এ.
অনুষ্ঠান বিভাগ
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

১৪। মুহম্মদ আমীর খসরু, এম.এ.
সহকারী সম্পাদক
সাপ্তাহিক ভোলাবাণী
ভোলা।

১৫। রেজা রব্বানী, এইচ.এস.সি.
সংগীতশাখা, গণসংযোগ দপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৬। হাসান আহমদ, বি.এফ.এ.
ইন্সট্রাকটর, ডিজাইন এ্যান্ড গ্রাফিক্স
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
ঢাকা।

১৭। নারায়ণচন্দ্র সাহা, বি.এ., বি.এড.
শিক্ষক
জি.কে. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, শেরপুর
শেরপুর।

১৮। মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, বি.এ. (অনার্স) ১ম বর্ষ
সরকারী কলেজ
সিলেট।

১৯। মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান মাহবুব, বি. কম (১ম বর্ষ)
মদনমোহন কলেজ
সিলেট।

২০। সাহিদা খানম জলি, বি.এ. (অনার্স), এম.এ. (শেষ বর্ষ)

২১। নাসীরউদ্দীন আহমদ, কে.এল.ই এম.
গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ,
সিলেট।

২২। মোঃ মাহবুবুল হক, বি.এ. (অনার্স), এম.এ.
প্রভাষক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
চট্টগ্রাম।

প্রফেসর লরি হংকোর বিশেষ বক্তৃতা: কালেভালা

ফিনল্যান্ডের টুর্কু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং নর্ডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক ডঃ লরি হংকো ১৩ ফেব্রুয়ারি '৮৭ সকাল দশটায় বাংলা একাডেমীর সেমিনার কক্ষে ফিনল্যান্ডের মহাকাব্য 'কালেভালা'-র উপর এক বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর খান সারওয়ার মুর্শিদ। স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল। প্রফেসর লরি হংকোকে পরিচয় করিয়ে দেন একাডেমীর গবেষণা-সংকলন ও ফোকলোর বিভাগের পরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান।

স্বাগত ভাষণে প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, ফিনল্যান্ডের মহাকাব্য 'কালেভালা' সেদেশের জাতিগত ঐক্য ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল এবং এর মধ্য দিয়ে লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞান-ভিত্তিক চর্চার একটি ধারাও সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আমাদের লোকসংস্কৃতির সম্পদ বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংগৃহীত ও সম্পাদিত হয় নি। বাংলা একাডেমী আয়োজিত আঞ্চলিক ও জাতীয় ফোকলোর কর্মশালার উদ্দেশ্য হল ফোকলোরের বৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠনের জন্য একদল কর্মী ও গবেষক তৈরী করা। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের সংস্কৃতির ঐক্যসূত্র নির্ণয় করতে সক্ষম হব।

প্রফেসর হংকো কালেভালা থেকে অংশবিশেষ পাঠ করে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। রুশ-সুইডিশ প্রভাবে আত্মপরিচয়-বিস্মৃত ফিনল্যান্ডে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লেখকের নাম পরিচয়হীন লোককবিতা সম্পাদনার মাধ্যমে কালেভালাকে একটি মহাকাব্যের রূপ দেয়া হয়। এই মহাকাব্যের মাধ্যমেই ফিনল্যাণ্ডের স্বকীয় জাতিসত্তা প্রথমবারের মত উদ্‌ঘাটিত হয়। ফিনিশ লিটারারি সোসাইটির সভাপতি এবং ইউনেস্কোর ফোকলোর সংরক্ষণ কমিটির সদস্য প্রফেসর হংকো বলেন ফিনল্যাণ্ডের আত্মপরিচয় খোঁজার প্রচেষ্টার সংগে সংগে বাংলাদেশের আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা তথা ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। আগে ফিনল্যাণ্ডের অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা রুশ ও সুইডিশ ভাষা ব্যবহার করতেন। মহাকাব্যটি প্রকাশের পর তাদের মধ্যে ফিনল্যাণ্ডের নিজস্ব ভাষা ব্যবহার শুরু হয়। 'কালেভালা' পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৭৭৮ খ্রীঃ। ১৭৭৮ খ্রীঃ ফিনল্যাণ্ডে ইতিহাস চিন্তায় পিতৃপুরুষ হেনরি গ্যাব্রিয়েল পোর্থান-এর একটি গবেষণা-সন্দর্ভের

মাধ্যমে। ফিনল্যাণ্ডের গবেষকরা "আমাদের পূর্বপুরুষরা বর্বর ছিলেন না" এই চিন্তাধারা থেকে ফিনল্যাণ্ডের ইতিহাস ও লোক-কবিতা নিয়ে কাজ শুরু করেন। 'কালেভালা' চর্চা এদিক থেকে বহুমাত্রিকতা পেয়ে যায় — কেউ একে দেখে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে, কেউ দেখে মিথ হিসাবে, কেউ বা দেখে লোক-কবিতার মধ্য দিয়ে মহাকাব্য হিসাবে। ১৮২৮ খ্রীঃ লোনর্ট-এর সম্পাদনায় ছোট আকারে কালেভালা প্রকাশিত হয়। লোনর্ট লোকগীতিকা থেকে সাহায্য নিয়ে একদিকে যেমন এর পরিপাটি কাব্য নির্মাণ করেন অন্যদিকে তেমনি ফিনিশ জাতির উদ্ভবের সূত্রও এর মধ্য থেকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টা চালান। স্ক্যান্ডিনেভীয় মহাকাব্য এদ্দা-র মতই কালেভালা-রও উৎস ফিনল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষের জীবন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভালবাসা। ফিনিশ জাতির অন্তর্গত চেতনা ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এবং প্রাচীনত্ব কালেভালায় চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে। প্রফেসর হংকো বলেন ফিনিশ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার উৎস হিসাবেও অবদান রাখছে কালেভালা।

কালেভালা মাটির গভীরে প্রোথিত ফিনিশ ঐতিহ্যকেই শুধু ধারণ করেনি বরং লোক-কবিতার মধ্য দিয়ে নব নির্মাণের এক চমৎকার প্রয়াসকেই তুলে ধরেছে। কারণ ফিনরা মনে করে লোক-কবিতা হল জাতীয় ইতিহাসের মহাফেজখানা (আর্কাইভ)।

সভাপতির ভাষণে প্রফেসর খান সারওয়ার মুর্শিদ একুশে উপলক্ষে 'কালেভালা'-র উপর আলোচনাকে উপযোগী এবং বাংলা একাডেমীর চমৎকার কল্পনাশক্তির পরিচয়বহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। বক্তৃতার পর 'কালেভালা'-র উপর কিছু প্রশ্ন করেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ, ডঃ হায়াৎ মামুদ প্রমুখ। ডঃ লরি হংকো বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালককে ফিনল্যাণ্ড লিটারারি সোসাইটির (১৮৩১) দেড় শত বার্ষিকী উপলক্ষে সোসাইটি প্রতীক উপহার দেন। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর হংকোকে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত কিছু বই উপহার দেন।

দ্বিতীয় জাতীয় ফোকলোর কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠান---১৯৮৭

বাংলা একাডেমী আয়োজিত তিন সপ্তাহব্যাপী দ্বিতীয় জাতীয় ফোকলোর কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠান ২৩শে ফেব্রুয়ারি '৮৭ তারিখ সকাল দশটায় একাডেমীর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব নূরুল ইসলাম খান। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের উপদেষ্টা ড়ঃ ভি. সি. জোসিও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অতিথি প্রশিক্ষক ড: জহরলাল হাণ্ডু এরপর শুভেচ্ছা ভাষণ দেন। তিনি বলেন বর্তমান কর্মশালা গত বছরের কর্মশালার প্রশিক্ষণ কোর্সের পুনরাবৃত্তি নয়। বর্তমান কর্মশালায় নতুন বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের বিপুল ফোকলোর সম্পদ অধ্যয়ন করতে হলে দু'বছরেও তা সম্পন্ন করা যাবে না। বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও আত্ম পরিচয় উদ্ধারে কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীগণ আত্ম-নিয়োগ করবেন। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালসমূহে বিশেষ করে নতুন বিশ্ববিদ্যালযসমূহে ফোকলোর বিভাগ খোলার পরামর্শ দেন তিনি। বাংলা একাডেমীর প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় একটি ফোকলোর ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলাদেশে ফোকলোর চর্চা ও গবেষণার পথ উন্মুক্ত হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এরপর প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন প্রধান অতিথি জনাব নূরুল ইসলাম খান।

জনাব নূরুল ইসলাম খান প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন ফোকলোরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক জন্ম জন্মান্তরের। মানুষের জীবনের তাৎপর্যের সঙ্গে ফোকলোরের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বর্তমান সভ্যতায় মানুষের জীবন টেনশন-এ আক্রান্ত। জন্মলাভ করার পর থেকে অশান্তি, অস্থিরতা ও উন্মাদনার মধ্যে মানুষ জীবন যাপন করেছে। মানুষের চিত্তে কোন শান্তি নেই। সামনে এগিয়ে চলা অনেকটা প্রহসনের মত। আমাদের পূর্বপুরুষদের নিকট এ ধরনের জীবনযাপন কল্পনাতীত ছিল। যান্ত্রিক সভ্যতায় আমাদের জীবন

দুর্বিসহ ও বিপর্যস্ত। বাংলা একাডেমী আয়োজিত ফোকলোর কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান বাস্তবক্ষেত্রে কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে তার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। একটি ফোকলোর ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে ফোকলোর চর্চাকে অর্থবহ করে তুলতে হবে। বাংলা একাডেমী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করে এধরনের একটি প্রকল্প প্রণয়ন করতে পারে। ফোকলোর চর্চাকে আমাদের জীবনে অর্থবহ করে তোলার লক্ষ্যে একটি বাস্তব পরিকল্পনা প্রয়োজন। ঐকান্তিকতা থাকলে তেমন প্রকল্প অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে। বাংলা একাডেমী কর্তৃক এ ধরনের বাস্তব প্রকল্প প্রণীত হলে এর জন্য অর্থের কোন অসুবিধা হবে না।

সভাপতির ভাষণে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন বাংলা একাডেমীতে ফোকলোর প্রকল্পের বাস্তবায়নের কাজ খুবই স্বভাবিক। বাংলা একাডেমীর কর্মতৎপরতা সব সময় বহির্মুখী হবে তা ঠিক নয়। এখানে জ্ঞানের চর্চা হবে অভিনিবেশ সহকারে। দিনের পর দিন পরিশ্রম করে কাজ করে যেতে হবে। দু'বছর, পাঁচ বছর বা আরো পরে এ ধরনের গবেষণা কাজের ফল হয়ত পাওয়া যাবে। বাংলা একাডেমীর নিকট থেকে এ ধরনের গবেষণাকর্মের দ্রুত ফল আশা করা বাঞ্ছিত হবে না। কর্পোরেশন বা শিল্প কারখানার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ন্যায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ ধরনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ সম্ভব নয়।

বাংলা একাডেমীতে ভবিষ্যতে তৃতীয় জাতীয় ফোকলোর কর্মশালা আয়োজনের উদ্যোগ এখন থেকেই নিতে হবে। আমাদের একটি আলাদা গ্রন্থাগার ভবন অচিরেই নির্মাণ করা প্রয়োজন। পৃথিবীর কোন দেশে গ্রন্থাগারের সঙ্গে অন্য কোন বিভাগ নেই।

বাংলা একাডেমীকে কেন্দ্র করে উচ্চতর গবেষণার জন্য আমরা একটি ফোকলোর ইনষ্টিটিউট করতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলা একাডেমীতে ফোকলোরের বৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠন করা যাবে। বাংলা একাডেমী আয়োজিত দু'টি কর্মশালায় যাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাঁদের সহযোগিতা নিতে হবে।

আমরা এখনো জানি না আমরা কারা। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের মূল্যবান উপাদান সংগ্রহের মাধ্যমে আমাদের জাতিসত্তার পরিচয় উদ্ধার করতে সক্ষম হব।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন একাডেমীর গবেষণা-সংকলন ও ফোকলোর বিভাগের পরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান। স্বাগত ভাষণে তিনি বলেন বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চায় রূপান্তর আনার ব্যাপারে এ কর্মশালা একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে ফোকলোর চর্চা হয়েছে তা বহুলাংশে উনবিংশ শতাব্দীর ধারারই অনুসৃতি। প্রথম ও দ্বিতীয় জাতীয় কর্মশালার মাধ্যমে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ফোকলোর চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচনের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের দেশের বিপুল ফোকলোর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তার তাৎপর্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তো হয়নিই এমনকি সংগ্রহ, সংরক্ষণ প্রচেষ্টাও একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। বাংলাদেশেব বিচিত্র ও বিপুল ফোকলোর উপাদান যথাযথ-ভাবে বহির্বিশ্বে প্রচারিত হলে তা শুধু আমাদের পরিচয়কেই তুলে ধরবে না, বরং বিশ্বের ফোকলোর ভুগোলেও বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার স্থান নির্ধা-রিত হবে। প্রশিক্ষণ, অধ্যয়ন এবং নতুন গবেষণার মাধ্যমে বাংলা একাডেমী হয়ে উঠুক ফোকলোর চর্চার একটি মূল কেন্দ্র, এবং দেশে সৃষ্টি হোক নতুন প্রজন্মের একদল ফোকলোর গবেষক। আমাদের জাতিসত্তাগত পরিচয় ফোকলোরেই মলতঃ বিধৃত। বাংলা একাডেমী হয়ে উঠুক আমাদের সংস্কৃতি ও লোক ঐতিহ্য চর্চার ঠিকানা।

গ্রন্থমেলা উদ্বোধন

২৪.১০.১৩৯৩ / ৭.২.১৯৮৭ শনিবার

স্বাগত ভাষণ

সভাপতির ভাষণ

আহ্বায়কের ধন্যবাদ জ্ঞাপন

গ্রন্থমেলার নীতিমালা

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

পরম শ্রদ্ধেয় সভাপতি, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সম্মানিত প্রতিনিধি, গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক ও সুধীমণ্ডলী,

অমর একুশে গ্রন্থমেলার এই উদ্বোধন দিবসে মহান ভাষা আন্দোলনে যাঁরা নির্ভয়ে আত্মদান করেছিলেন, তাঁদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। মাতৃভাষা ও আপন সংস্কৃতির সম্ভ্রম পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে যে-মহৎ চেতনার উজ্জীবন, আমাদের সকল সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অনিবার্যভাবেই তার প্রেরণা অনির্বাণ। আজকের এই গ্রন্থমেলাও তার ব্যতিক্রম নয়।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় শিক্ষার হার বাড়ে নি—তথাপি একথা সত্য-যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের আয়তন গত পনেরো বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে, বই, বইয়ের পাঠক ও লেখকের সংখ্যাও বেড়েছে। হয়তো চাহিদার তুলনায় বইয়ের সংখ্যা এখনো অপ্রতুল, তবুও কেবল বাংলা একাডেমী এবং পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি আয়োজিত 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'র কয়েক বছরের তথ্য ও পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে পাঠাভ্যাসের ক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন চোখে পড়ে। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিতান্তই অপ্রাতিষ্ঠানিক-ভাবে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে বই বিক্রয়ের যে-উদ্যোগ গৃহীত হয়, ১৯৭৮ সালে তা সম্পূর্ণতই প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে একটি নিয়মিত বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। তবে, ১৯৭৯ সালেই প্রথমবারের মতো বাংলা একাডেমীর প্রযোজনায় এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহযোগিতায় একাডেমীর প্রাঙ্গণে পূর্ণাঙ্গ ২১-এর গ্রন্থমেলার সূচনা। ১৯৮৫ সালে এই গ্রন্থমেলা 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'য় রূপান্তরিত হয়। ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত মেলায় মাত্র ত্রিশটি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালে অংশগ্রহণ-কারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিলো ৫৪। ১৯৮৪ সালের গ্রন্থমেলায় স্টলের সংখ্যা ছিল ৮০; ১৯৮৫ সালে স্টলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৮২ এবং মোট

৫৫টি প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালে স্টল ও অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা-বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ১০২ ও ৬৪। বর্তমান গ্রন্থমেলায় ১৫৩টি স্টলে মোট ১০৩টি প্রতিষ্ঠান তাঁদের গ্রন্থসম্ভার সাজিয়েছেন। লক্ষণীয় যে গত সাত বছরে মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তিন গুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। সন্দেহ নেই, প্রকাশনা সংস্থাগুলির এই উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সমাজের ক্রমবর্ধমান গ্রন্থপ্রীতি গভীরভাবে সম্পর্কিত। গ্রন্থ সম্পর্কে পাঠকগোষ্ঠীর এই আগ্রহ ও ঔৎসুক্য অবশ্যই কল্যাণকর। কিন্তু বর্তমানে প্রকাশনা-শিল্প যে-সংকটের ভেতরে নিমজ্জিত, তার নিরসন না হ'লে পাঠকের হাতে বই কীভাবে পৌঁছুবে? কাগজ, মুদ্রণ, বাঁধাই ইত্যাদির দাম আশংকাজনকভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে বই ক্রমশই সাধারণ পাঠকের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে কেবল প্রকাশনাই বিঘ্নিত হবে না, তার পরিণামে বইয়ের বিকল্প হিসাবে স্থূল বিনোদনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে নতুন প্রজন্ম এবং তা সমগ্র জাতির জন্যে সুফল বয়ে আনবে না।

সুধীবৃন্দ,

আমি জানি, সকল মহৎ লক্ষ্যই অন্তরায় কণ্টকিত। তবু, আমরা সমস্যার ভয়ে পিছিয়ে থাকতে পারি না। আন্তরিক প্রযত্ন ও সাধনার বলে মানুষ সকল অনতিক্রম্য বাধাই শেষ পর্যন্ত লঙ্ঘন করে এবং জয়ী হয়। সমবেতভাবে উদ্যোগী হ'লে এই সংকটও আমরা উত্তীর্ণ হতে পারবো।

পরম সম্মানিত সভাপতি,

এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আপনার সহৃদয় উপস্থিতির জন্যে আমরা গর্বিত। আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে আপনাকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। অমর একুশে গ্রন্থমেলা '৮৭-র সফল আয়োজনে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির উদার সহযোগিতার কথা এই প্রসঙ্গে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক এই মেলার পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নে যে-শ্রম স্বীকার করেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমি তাঁকে এবং বাংলা একাডেমীর

যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিরলস প্রচেষ্টায় এই আয়োজন সুসম্পন্ন হয়েছে তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র প্রভৃতি সকল প্রচার মাধ্যমকেও জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা।

সুধীমণ্ডলী,

এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সবার উপস্থিতি আমাদেরকে দিয়েছে প্রেরণা ও মনোবল। আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

সিরাজুল হক

মাননীয় মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সদস্যগণ ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ ঃ

আজ অমর একুশে ১৯৮৭ গ্রন্থমেলার শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে আমার মত নগণ্য ব্যক্তিকে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ করা হয়েছে বলে আমি আপনাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ উপলক্ষে আমি সর্বপ্রথম অমর একুশ ১৯৫২-এর সম্বন্ধে দুটি কথা বলতে চাই, কেননা ঐ দিনের ঘটনা আমি কখনও ভুলব না। আমি ছিলাম তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ প্রতি বছর আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এক ভয়াবহ ঘটনার কথা, যার ফলশ্রুতিতে আমরা পেয়েছি আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা। তাই মাতৃভাষার চেতনা আমাদের স্বাধীনতার চেতনা--এতে কোন সন্দেহ নেই। এরই ইঙ্গিত পেয়েছিলাম আমি আজ হতে ৫১ বৎসর পূর্বে যখন ১৯৩৬ সালে হের হিটলারের আমলে জার্মানির Frankfurt A. M. বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মাস অধ্যয়নে রত ছিলাম। ঐ সময় আমি প্রতি রোববারে সন্ধ্যার পর প্রসিদ্ধ জার্মান কবি গ্যেটের বাড়ীতে তাঁর Faust ও Yung Fan নাটক দেখতে যেতুম। একদিন আমার হাতে ইংরেজীতে লিখিত একটা Pamphlet তা পড়লো। পড়ে দেখি প্রত্যেকটি বাক্য অশুদ্ধ। আমার পাশে বসা ছিলেন Frankfurt বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। আমি তাঁকে Pamphlet দেখিয়ে বললাম, "দেখুন এ Pamphlet কত অশুদ্ধ ইংরেজীতে লেখা।" তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন, "আমরা বিদেশী-ভাষার পরওয়া করি না। আমরা সবকিছু আমাদের মাতৃভাষায়ই করে থাকি। আপনারা British Subject আপনাদের বিশুদ্ধ ইংরেজী তো শিখতেই হয়। তবে মনে রাখবেন কোনদিন যদি আপনারা স্বাধীনতা লাভ করেন, তখন কিন্তু আপনাদের ইংরেজী আমাদের ইংরেজীর মতই হবে।" সেদিনের কথাটা আমি উপলব্ধি করেছিলাম দীর্ঘ ১৬ বৎসর পর ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ সালে যখন আমাদের ছেলেরা মাতৃভাষার রক্ষার্থে বুক পেতে দিয়েছিল পুলিশের গুলির

সামনে, যার বদৌলতে অবশেষে লাভ করেছি আমরা স্বাধীনতা। এই একুশের দিনে তারা ধরে নিয়ে জেলে ভরেছিল বহু ছাত্রকে যাদের মধ্যে আমার দ্বিতীয় পুত্র মনসুরুল হকও ছিল। ঐ দিনই আমার অর্ধাঙ্গিনী মাহফুযা হক লিখেছিলেন এই ছোট্ট কবিতা। কবিতাটি এই:

বিপ্লবী

ওরে বিপ্লবী দল,
এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।
নিজের দাবি লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চল।
বাংলা ভাষা মুছতে যারা
বদ্ধপরিকর

বুঝে নেরে তোদের দাবি
কিসের তোদের ডর?
আসুক পুলিশ করুক গুলি,
করতে দে,
ধরুক পুলিশ ভরুক জেলে,
ভরতে দে,
মরণরে কি ভাই, ভয় করিস রে,
বীরের দল!
মরণে তোর কিসের ভয়?
এগিয়ে চল।

মুছতে যারা মুখের বুলি,
চালায় বুকে বুলেট গুলি
ব্যূহ ভেদী বীরের দল,
এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।
বীরের মতন মরতে পারা,
কয় জনা ভাই পারে কারা?
নবীন তোরা স্বাধীন তোরা,
তোরা নওজোয়ান,

নিজের দাবী লক্ষ্য রেখে
হওরে আগুয়ান,
এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২।
(গোলা-গুলির আওয়াজ শুনে, বাংলা ভাষার চেতনায়)

মায়ের ভাষায় আমরা লালিত পালিত। মায়ের ভাষায় আমরা অবাধে বিচরণ করি আমাদের চিন্তার জগতে মৎস্য যেমন অবাধে বিচরণ করে পানিতে। আমাদের এই মাতৃভাষার লালন ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন গ্রন্থ রচনার, বই কেনা, বই পড়া, ও বই পড়তে সাহায্য করা ও বই পড়ার উৎসাহ প্রদান করা। আজকের এই বই মেলার উৎসবে হাজির হতে পেরে আমি নিজকে ধন্য মনে করছি। আমি বই ভালবাসি, বই কিনি ও বই পড়ি ও বই-র যত্ন নি। আমার কাছে সবচাইতে বেশী প্রিয় আমার গ্রন্থাগার। তাই এই বই মেলার জন্য জানাই আমার আন্তরিক মুবারকবাদ।

বাংলা একাডেমীর জন্মলগ্ন থেকেই আমি এর জীবন সদস্য ও এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। এই একাডেমী কর্তৃক বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনার সঙ্গেও আমি জড়িত ছিলাম। বুখারী শরীফের বাংলা তরজমায়ও আমি অংশগ্রহণ করেছি। বর্তমানে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিতব্য বৃহৎ বাংলা বিশ্বকোষের সঙ্গেও আমি একান্তভাবে জড়িত। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে গর্বিত ও আনন্দিত যে বাংলা একাডেমী ও বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি ও অন্যান্য সংস্থা যেভাবে বাংলা ভাষার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তা যদি কায়েম থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতে আরবী ভাষার ন্যায় আমাদের বাংলা-ভাষাও একদিন আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করবে।

গ্রন্থাগার ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয় না। আমাদের প্রতি গ্রামে, প্রতি মহকুমায়, প্রতি উপজেলায় ও জেলায় পাবলিক গ্রন্থাগার থাকা প্রয়োজন যাতে অবসর সময় আমরা বই পড়ে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। দীর্ঘ ৫২ বৎসর পূর্বে আমি যখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Oriental School-এর ছাত্র তখন আমি দু'সপ্তাহের জন্য দূরে এক গ্রামে

এক চাষীর বাড়ীতে Paying guest হিসেবে বাস করি। সে গ্রামে দেখেছি প্রত্যেক বাড়ীতেই লাইব্রেরী আছে, এমন কি ওদের রান্নাঘরেও লাইব্রেরী। মেয়েরা রান্নাবান্নার সময় অবসর মত বই পড়ে। অযথা তারা এক মিনিটও নষ্ট করে না।

বন্ধুগণ, মনে রাখবেন, মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রতি বছরই আসবে ও যাবে আমাদের প্রেরণা যোগাতে যাতে আমরা আমাদের মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের চর্চা করতে পারি যেমন করেছে চীনারা, জাপানীরা ও রাশিয়ানরা। ঐ সব দেশেই আমি ঘুরেছি এবং দেখেছি যে তারা বিদেশী ভাষার ধার ধারে না। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করে। তাদের দেশে আমাদের কেউ পড়তে গেলে প্রথমে তাদের ভাষা শিখতে হয় এবং তাদের ভাষায় সন্দর্ভ লিখে ডিগ্রী নিতে হয়, অন্য কোন ভাষায় নয়।

অবশেষে আবার আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এই গ্রন্থ-মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি ও করুণাময় আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করছি যাতে প্রতি বছর আপনারা এই গ্রন্থমেলা বসাতে পারেন। এবং আমাদের ছেলে-মেয়েদের গ্রন্থমুখী করতে পারেন। তারা আজকাল ক্লাসের পড়াশুনা বাদ দিয়ে অশ্লীল বই পড়ছে, মাদক দ্রব্যের দিকে ঝুঁকে পড়েছে ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। আল্লাহ্ পাক তাদের সুমতি দিন এবং ভাল বই পড়ার তওফিক দিন। আমীন, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

হাবীব-উল আলম

মাননীয় সভাপতি, শ্রদ্ধেয় মহাপরিচালক, সম্মানিত আলোচক, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সম্মানিত প্রতিনিধি, গ্রন্থমেলায় অংশ-গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলী।

অমর একুশে গ্রন্থমেলার এই উদ্বোধন দিবসে প্রথমেই আমি ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

আজকের এই গ্রন্থমেলায় আমি আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই।

একদা মাতৃভাষাকে জীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেসব বীর সন্তান শহীদ হয়েছিলেন, আজকের অমর একুশে গ্রন্থমেলা তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত। একুশের চেতনা ও আদর্শকে সমন্নত রাখাই এই গ্রন্থ-মেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ১৯৮৫ সাল থেকে বাংলা একাডেমী আয়োজিত এই গ্রন্থমেলার নামকরণ করা হয়েছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা।

মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই একটি জাতি তার পূর্ণতা লাভ করতে পারে। আপন সত্তাকে বিশ্ব দরবারের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আর একাজে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে চলেছেন দেশের লেখক-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী ও প্রকাশকগণ। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে হয়তো দেখা যাবে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি। কিন্তু এ কথাও সত্যি যে প্রতি বছর অনেক নবীন ও তরুণ লেখকের রচনা-সম্ভার নিয়ে প্রকাশকগণ আমাদের গ্রন্থভুবনকে সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত করছেন। অমর একুশে গ্রন্থমেলা সে-সাক্ষ্য বহন করছে।

এবারের গ্রন্থমেলায়ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকাশক, বিশেষ করে একুশে উপলক্ষে, জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন বই প্রকাশ করছেন। তাঁরা এই দিনটির জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছেন। আমাদের সকলের জন্যেই এটা আনন্দের বিষয়।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে এবারের গ্রন্থমেলা আয়তনে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক নতুন প্রকাশনা-সংস্থা অংশ নিয়েছে। বিগত বছর-গুলোর চাইতে এবারে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেড়েছে।

গতবছর যেখানে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৬৪, এবারে সেখানে তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০৩-এ। অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ গ্রন্থমেলার ক্রমবর্ধমান সাফল্যেরই পরিচায়ক। আমরা আশা করবো এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

এই গ্রন্থমেলা আয়োজনে বিগত বছরগুলোর মতো এবারেও বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি আমাদের সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে অমর একুশে গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটির সদস্য ও সমিতির প্রতিনিধি জনাব চিত্তরঞ্জন সাহা, জনাব ওসমান গণি, জনাব রহুল আমিন এবং ইফতেখার রসুল জর্জ এই গ্রন্থমেলা আয়োজনে আমাকে যেভাবে উপদেশ, পরামর্শ ও সহযোগিতা দান করেছেন তার জন্য আমি তাঁদের সকলের কাছে ঋণী। আমি সমভাবে ঋণী বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং অমর একুশে গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের কাছে। তাঁদের পরামর্শ ও সহযোগিতা ছাড়া এ ধরনের আয়োজন সম্ভব হতো না। আমি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ না করে পারছি না যে অমর একুশে গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটির সভাপতি বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল গ্রন্থ-মেলার আয়োজনে আমাকে সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাঁর কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

এ গ্রন্থমেলা আয়োজনে ত্রাণ মন্ত্রণালয়, এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা আমাদের সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ। এখানে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও অন্যান্য সংবাদ-মাধ্যমের যেসব প্রতিনিধি উপস্থিত আছেন তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই গণসংযোগ দপ্তরকেও।

গ্রন্থমেলার এই অনুষ্ঠান আয়োজনে একাডেমীর সংস্কৃতি উপ-বিভাগ সহায়তা করেছে। আমি এই উপ-বিভাগের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এ ছাড়া গ্রন্থমেলা আয়োজনে একাডেমীর যেসব সহকর্মী সাহায্য করেছেন তাঁদের কাছেও আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আজকের এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব এবং অমর একুশে গ্রন্থমেলা উদ্বোধন করার জন্য অনুগ্রহ করে সম্মত হওয়ায় শ্রদ্ধেয় ডঃ সিরাজুল হকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির পক্ষ থেকে সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় জনাব সেরাজুল হক ভাষণদানে সম্মত হওয়ায় এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ এর পরিচালক শ্রদ্ধেয় জনাব ফজলে রাব্বি গ্রন্থমেলা বিষয়ক আলোচনা করতে সম্মত হওয়ায় আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

গ্রন্থমেলা আয়োজনে আমাদের হয়তো অনেক ত্রুটি থেকে গেছে। এ ত্রুটি অনিচ্ছাকৃত। এজন্য আমি আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

সুধীমণ্ডলী, পরিশেষে আমি আপনাদের আবারো অমর একুশে গ্রন্থ-মেলায় স্বাগত জানাই।

গ্রন্থমেলাকে সর্বাংগসুন্দর ও সার্থক করে তোলার জন্য আপনাদের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।

ধন্যবাদ।

গ্রন্থমেলার নীতিমালা ও নিয়মাবলী

১. প্রস্তাবনা

১.১. অমর একুশে ১৯৮৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে অমর একুশে গ্রন্থমেলা আয়োজিত হবে।

২. সহযোগিতা

২.১. বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি অমর একুশে গ্রন্থমেলা আয়োজনে বাংলা একাডেমীকে সহযোগিতা প্রদান করবে।

৩. গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটি

৩.১. গ্রন্থমেলা পরিচালনা করবে গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটি। এ কমিটিতে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। বাংলা একাডেমীর বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন উপ-বিভাগের উপ-পরিচালক কমিটির আহ্বায়ক হবেন। (কমিটির পূর্ণাঙ্গ তালিকা ১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

৪. গ্রন্থমেলার স্থান

৪.১. একাডেমীর কর্মচারীদের বাসস্থানের উত্তর দিকে পুকুর পাড় থেকে পশ্চিমের দেয়াল পর্যন্ত স্থান, পশ্চিমের দেয়াল বরাবর স্থান, আণবিক শক্তি কমিশন সংলগ্ন উত্তর ও পশ্চিম দেয়াল বরাবর স্থান এবং পশ্চিমের দেয়াল থেকে ক্যাফেটারিয়া ভবন পর্যন্ত স্থান জুড়ে অমর একুশে গ্রন্থমেলার স্টল হবে।

৪.২. প্রয়োজনবোধে বইয়ের স্টলের স্থানের কিছুটা রদবদল করা যেতে পারে।

৫. গ্রন্থমেলার সময়

৫.১. অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২৪-১০-৯৩/৭-২-৮৭ থেকে ১৫-১১-৯৩/ ২৮-২-৮৭ তারিখ পর্যন্ত চলবে।

৫.২. প্রয়োজনবোধে একাডেমী উপর্যুক্ত সময়-সীমা হ্রাস করতে পারবে। তবে কোন অবস্থাতেই এ সময়-সীমা বাড়ানো যাবে না।

৫.৩. গ্রন্থমেলা প্রতিদিন বিকেল তিনটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকবে। ছুটির দিন সকাল এগারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত গ্রন্থমেলা খোলা থাকবে। শুক্রবার দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত গ্রন্থমেলা বন্ধ থাকবে। ২১শে ফেব্রুয়ারি মেলা সকাল সাড়ে সাতটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

৬. গ্রন্থমেলা উদ্বোধন

৬.১. ২৪-১০-৯৩/৭-২-৮৭ তারিখে বিকেল সাড়ে চারটেয় অমর একুশে গ্রন্থমেলা উদ্বোধন করা হবে।

৭. গ্রন্থমেলার প্রকৃতি

৭.১. অমর একুশে গ্রন্থমেলায় বাংলাদেশে প্রকাশিত বইয়ের প্রচার ও বিক্রি উৎসাহিত করা হবে। বাংলাদেশের বাইরের কোন দেশ থেকে প্রকাশিত বই অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রচার বা বিক্রি করা যাবে না, তবে তা প্রদর্শন করা যাবে।

৭.২. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে এ মর্মে নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যে, তাঁর স্টলে রক্ষিত ও প্রদর্শিত বইয়ের ন্যূনতম ষাট শতাংশ বাংলাদেশে প্রকাশিত বই হবে।

৮. বইয়ের স্টল

৮.১. গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণের জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান আবেদন করবে, তাদের মধ্যে বরাদ্দ করার জন্য সর্বমোট একশটি বইয়ের স্টল নির্দিষ্ট থাকবে। তবে এ সংখ্যা চূড়ান্ত নয় এবং প্রয়োজনবোধে এর পরিবর্তন করা যেতে পারে।

৮.২. আবেদনকারীরা যে ক'টি স্টল বরাদ্দের জন্য আবেদন করবেন, তার সংখ্যা যদি একশয়ের কম হয়, তাহলে যে ক'টি স্টল

বরাদ্দের জন্য আবেদনপত্র পাওয়া যাবে, সে কটি স্টল নির্মাণ করা হবে।

৮.৩. স্টলসমূহ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত হবে। পর্যায়সমূহ 'ক', 'খ' ও 'গ' বলে অভিহিত হবে। তিনটি স্টল নিয়ে 'ক' পর্যায়ের প্রতিটি একক, দু'টি স্টল নিয়ে 'খ' পর্যায়ের প্রতিটি একক এবং একটি স্টল নিয়ে 'গ' পর্যায়ের প্রতিটি একক গঠিত হবে।

৮.৪. গ্রন্থমেলায় 'ক' পর্যায়ের মোট ছয়টি, 'খ' পর্যায়ের মোট চব্বিশটি এবং 'গ' পর্যায়ের মোট চৌত্রিশটি একক থাকবে, তবে এ সংখ্যা চূড়ান্ত নয় এবং প্রয়োজনবোধে এর পরিবর্তন করা যেতে পারে।

৮.৫. 'ক' পর্যায়ের এককের মাপ হবে সাধারণভাবে ২৪´×৮´×৮´, 'খ' পর্যায়ের এককের মাপ হবে সাধারণভাবে ১৬´×৮´×৮´ এবং 'গ' পর্যায়ের এককের মাপ হবে সাধারণভাবে ৮´×৮´×৮´। এ-মাপ সব স্টলের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সঠিক না-ও হতে পারে, এবং যদি কোন ক্ষেত্রে তা সঠিক না হয়, তাহলে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সে বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন করতে পারবে না। তবে মাপ সঠিক রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে।

৮.৬. প্রতিটি এককের কাঠামো বাঁশ দিয়ে তৈরি করে দেয়া হবে এবং পেছনে ও ছাদে টিন লাগিয়ে দেয়া হবে। দুটি এককের মধ্যে কোন টিন বা বেড়া দেয়া থাকবে না।

৯. স্টল বরাদ্দের বিজ্ঞাপন

৯.১. বইয়ের স্টল বরাদ্দের জন্য ন্যূনতম তিনটি জাতীয় দৈনিক সংবাদ পত্রের প্রথম, বা, তা সম্ভব না হলে, শেষ পৃষ্ঠায় ৬.১০.৯৩/২০.১.৮৭ তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপন দেয়া হবে।

১০. বইয়ের স্টলের জন্য আবেদন করার পদ্ধতি

১০.১. সকল আবেদনকারীকে নির্ধারিত আবেদনপত্রে আবেদন করতে হবে। প্রতিটি আবেদনপত্রের দাম হবে পঁচিশ টাকা মাত্র। প্রতিটি আবেদনপত্রের সঙ্গে নিয়মাবলী সংযুক্ত হবে। আবেদনপত্র

৭.১০.৯৩/২১.১.৮৭ থেকে ১২.১০.৯৩/২৬.১.৮৭ তারিখ পর্যন্ত ছুটির দিনসহ প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে বেলা একটার মধ্যে বিক্রি করা হবে।

১০.২. আবেদনপত্র আহ্বায়ক, গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটি, উপ-পরিচালক, বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন উপ-বিভাগের কাছ থেকে সংগ্রহ করা যাবে এবং তাঁর কাছে জমা দিতে হবে। অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র জমা নেয়া হবে না।

১০.৩. আবেদনপত্র জমা দেয়ার সময় আবেদনকারীকে স্টলের কাঠামো নির্মাণ, বিদ্যুৎ-সংযোগ ও বিদ্যুৎ ব্যবহার ব্যয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়ের অংশ হিসেবে ব্যাংক ড্রাফট বা পে অর্ডার-এর মাধ্যমে "বাংলা একাডেমী ঢাকা"-এর অনুকূলে 'ক' পর্যায়ের প্রতিটি এককের জন্য ৫,১০০/ (পাঁচ হাজার একশত) টাকা, 'খ' পর্যায়ের প্রতিটি এককের জন্য ২,৮০০/ দুই হাজার আটশত) টাকা ও 'গ' পর্যায়ের প্রতিটি এককের জন্য ১,১০০/- (এক হাজার একশত) টাকা হারে অর্থ প্রদান করতে হবে। যেসব আবেদনপত্রের সঙ্গে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার সংলগ্ন থাকবে না, সেসব আবেদনপত্র জমা নেয়া হবে না। যদি কোন কারণে গ্রন্থমেলার সময়-সীমা হ্রাস করা হয়, তাহলে জমা-দেয়া টাকা বা তার অংশবিশেষ ফেরৎ দেয়া হবে না এবং কোন অংশগ্রহণকারী তা ফেরৎ চাইতে পারবেন না ও ফেরৎ না দেয়ার জন্য তিনি কোন মামলা দায়ের করতে পারবেন না।

১০.৪. স্টলের জন্য আবেদনপত্র ১৩.১০.৯৩/২৭.১.৮৭ তারিখ বেলা একটা পর্যন্ত জমা দেয়া যাবে। এই সময়ের পর প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ (যদি থাকে) বিবেচিত হবে না।

১০.৫. উপরের ১০.৩ ধারায় উল্লিখিত অর্থ ছাড়াও প্রত্যেক আবেদনকারীকে ১০.৩ ধারা অনুযায়ী মোট প্রদত্ত অর্থের ২৫ শতাংশ ১০.৩ ধারায় উল্লিখিত অর্থ প্রদানের সময়ই একই পদ্ধতিতে অগ্রিম প্রদান করতে হবে, তবে

ক. যেসব স্টল গ্রন্থমেলার উদ্বোধনের দিনে অমর একুশে গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটির বিবেচনায় পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হবে সেসব স্টলের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ হারে প্রদত্ত এই অর্থ বাংলা একাডেমী বরাদ্দপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে গ্রন্থমেলা শেষ হওয়ার আগে ফেরৎ দেবে; এবং

খ. যেসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির মাধ্যমে আবেদন করবে এবং উক্ত সমিতি যেসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অমর একুশে গ্রন্থমেলা শুরু হওয়ার দিন তাদের স্টল পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হওয়ার নিশ্চয়তা দেবে ও দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তাদেরকে উপর্যুক্ত প্রদত্ত অর্থের ২৫ শতাংশ টাকা অগ্রিম প্রদান করতে হবে না। এই ধরনের কোনো স্টল যদি গ্রন্থমেলা উদ্বোধনের তারিখে গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটির বিবেচনায় পূর্ণাঙ্গভাবে চালু না হয় তাহলে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি গ্রন্থমেলা উদ্বোধনের তারিখ থেকে চার দিনের মধ্যে (ছুটির দিন ছাড়া) এ ধরনের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১০.৩ ধারা অনুযায়ী মোট প্রদত্ত অর্থের ২৫ শতাংশ একাডেমীকে জমা দেবেন।

১০.৬. যদি কোনো বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান গ্রন্থমেলা উদ্বোধনের দিন পূর্ণাঙ্গভাবে তার স্টল চালু করতে না পারে তাহলে তার বরাদ্দ তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং ১৯৮৮ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় সে প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে না। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১৫.৩ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

১০.৭. একাডেমী বা গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হলে আবেদনকারী তাঁর প্রকাশিত বা পরিবেশিত বই একাডেমীতে জমা দিবেন। গ্রন্থমেলা চলাকালে আবেদনকারী জমা-দেয়া বই ফেরৎ নিয়ে যেতে পারবেন।

১১. অংশগ্রহণের যোগ্যতা

১১.১. নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার আবেদনপত্র বিবেচিত হবে না :

ক. যে পুস্তক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান একাডেমীর প্রাপ্য সম্পূর্ণ পরিশোধ করেনি ;

খ. যে প্রকাশকের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা পাঁচের কম ;

গ. যে পরিবেশকের পরিবেশিত বইয়ের সংখ্যা দশের কম (পরিবেশিত বইয়ের পরিবেশক হিসেবে নাম মুদ্রিত থাকতে হবে) ;

ঘ. যেসব প্রতিষ্ঠান একই সঙ্গে প্রকাশক ও পরিবেশক, সেসব প্রকাশক ও পরিবেশকের মধ্যে যাঁদের মোট প্রকাশিত ও পরিবেশিত বইয়ের সংখ্যা দশের কম, এবং

ঙ. যে আবেদনকারীর অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ করা একাডেমী বা গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটির বিবেচনায় বাঞ্ছনীয় নয়।

১১.২. যেসব পুস্তক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিগত ১.১.১৯৮৬ থেকে ১৫.১.১৯৮৭ পর্যন্ত সময়ে কমপক্ষে তিনটি বই (সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী হতে হবে, স্কুল-কলেজের পাঠ্য বা সহায়ক বই নয়) প্রকাশ করেছে তাদেরকে স্টল বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অর্থাৎ এদেরকে স্টল বরাদ্দ করার পর যদি কোনো স্টল অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা অন্যদের বরাদ্দ করা হবে।

১১.৩. যেসব আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান মূলতঃ পুস্তক প্রকাশক বা পুস্তক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয়, কিন্তু সাংস্কৃতিক পতিষ্ঠান, সেসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানকে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করা যদি অমর একুশের গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটির বিবেচনায় বাঞ্ছনীয় হয় তাহলে কমিটি তাদের স্টল বরাদ্দ করতে পারবে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১১.১ ও ১১.২ ধারায় উল্লিখিত শর্তাদি অমর একুশে

গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটি শিথিল করতে পারে, তবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দকৃত স্টলের সংখ্যা মোট স্টলের সংখ্যার এক-দশমাংশের বেশী হতে পারবে না। কিন্তু বই বিক্রেতা বা প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভাড়ার যে হার প্রযোজ্য হবে এসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে।

১১.৪. উপরের ১১.১ ও ১১.২ ধারায় উল্লিখিত শর্তাবলী শিথিল করা যাবে না। যেসব প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ বাঞ্ছনীয় নয় বলে বিবেচিত হবে, সেসব প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ বাঞ্ছনীয় কেন নয় তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বা অন্য কাউকে জানাতে একাডেমী বা গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটি বাধ্য থাকবে না এবং একাডেমী বা গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না।

১২. বইয়ের স্টল বরাদ্দ

১২.১. স্টল বরাদ্দের সময় প্রথমে প্রতিটি আবেদনপত্র পরীক্ষা করে দেখা হবে। উপরের ১১.১ ধারা অনুযায়ী যেসব প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার আবেদনপত্র স্টল বরাদ্দ করার জন্য বিবেচনা করা যাবে না, উপর্যুক্ত পরীক্ষার সময় সেগুলি চিহ্নিত করা হবে এবং সেগুলি পরবর্তী সকল বিবেচনা বহির্ভূত রাখা হবে।

১২.২. উপর্যুক্ত পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পর প্রথমে 'ক' পর্যায়ের এককের জন্য বিবেচনাযোগ্য আবেদনপত্রসমূহ, তার পর 'খ' পর্যায়ের এককের জন্য বিবেচনাযোগ্য আবেদনপত্রসমূহ সবশেষে 'গ' পর্যায়ের এককের জন্য বিবেচনাযোগ্য আবেদন-পত্রসমূহ বিবেচিত হবে।

১২.৩. 'ক' পর্যায়ের এককের জন্য বিবেচনাযোগ্য আবেদনপত্রসমূহের মধ্য থেকে প্রকাশ্য লটারীর মাধ্যমে ছয়টি আবেদনপত্র বেছে নেয়া হবে এবং এ ছয়জন আবেদনকারীকে যথাক্রমে 'ক' পর্যায়ের ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ ক্রমিক সংখ্যা-চিহ্নিত একক বরাদ্দ করা হবে।

১২.৪. 'ক' পর্যায়ের এককসমূহের বরাদ্দ সম্পন্ন হওয়ার পর 'ক' পর্যায়ের বিবেচনাযোগ্য, কিন্তু বরাদ্দপ্রাপ্ত নন, এমন আবেদনকারীদের প্রকাশ্য লটারীর মাধ্যমে 'খ' পর্যায়ের একক বরাদ্দ করা হবে। একই লটারীর মাধ্যমে এসব আবেদনকারীর মধ্যে কে কোন্ ক্রমিক সংখ্যা-চিহ্নিত 'খ' পর্যায়ের এককের বরাদ্দ পাবেন তা স্থির করা হবে।

১২.৫. 'ক' পর্যায়ের বিবেচনাযোগ্য সকল আবেদনকারীকে 'ক' এবং, যদি প্রয়োজন হয়, 'খ' পর্যায়ের একক বরাদ্দ করার পর, 'খ' পর্যায়ের এককের জন্য বিবেচনাযোগ্য আবেদনপত্রসমূহের মধ্য থেকে প্রকাশ্য লটারীর মাধ্যমে, 'খ' পর্যায়ের যে কটি এককের বরাদ্দ বাকী থাকবে সে কটি এককের সমান সংখ্যক আবেদনপত্র বেছে নেয়া হবে এবং তাদের 'খ' পর্যায়ের স্টল বরাদ্দ করা হবে। একই লটারীর মাধ্যমে এসব আবেদনকারীর মধ্যে কে কোন্ ক্রমিক সংখ্যা-চিহ্নিত 'খ' পাবেন তা স্থির করা হবে।

১২.৬. 'খ' পর্যায়ের এককসমূহের বরাদ্দ সম্পন্ন হওয়ার পর 'খ' পর্যায়ের বিবেচনাযোগ্য, কিন্তু বরাদ্দপ্রাপ্ত নন, এমন আবেদনকারীদের প্রকাশ্য লটারীর মাধ্যমে 'গ' পর্যায়ের একক বরাদ্দ করা হবে। একই লটারীর মাধ্যমে এসব আবেদনকারীর মধ্যে কে কোন্ ক্রমিক সংখ্যা চিহ্নিত 'গ' পর্যায়ের এককের বরাদ্দ পাবেন তা স্থির করা হবে।

১২.৭. 'খ' পর্যায়ের বিবেচনাযোগ্য সকল আবেদনকারীকে 'খ' এবং যদি প্রয়োজন হয়, 'গ' পর্যায়ের একক বরাদ্দ করার পর 'গ' পর্যায়ের এককের জন্য বিবেচনাযোগ্য আবেদনপত্রসমূহের মধ্য থেকে প্রকাশ্য লটারীর মাধ্যমে, 'গ' পর্যায়ের যে কটি এককের বরাদ্দ বাকী থাকবে সে কটি এককের সমান সংখ্যক আবেদনপত্র বেছে নেয়া হবে এবং তাদের 'গ' পর্যায়ের স্টল বরাদ্দ করা হবে। একই লটারীর মাধ্যমে এসব আবেদনকারীর মধ্যে কে কোন্ ক্রমিক সংখ্যা-চিহ্নিত 'গ' পর্যায়ের এককের বরাদ্দ পাবেন তা স্থির করা হবে।

১২.৮. যেসব আবেদনকারী বরাদ্দ পাবেন না, তাঁরা অপেক্ষা-তালিকায় থাকবেন। যদি কোন স্টলের বরাদ্দ বাতিল হয়ে যায়, তাহলে অপেক্ষা-তালিকার আবেদনকারীদের মধ্যে তা প্রকাশ্য লটারীর মাধ্যমে বরাদ্দ করা হবে। এ লটারীর তারিখ, সময় ও স্থান যথাসময়ে ঘোষিত হবে।

১২.৯ যেসব আবেদনকারীকে বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হবে না, তাঁদের জমা-দেয়া টাকা ২৫-১০-৯৩/৮-২-৮৭ তারিখে ফেরৎ দেয়া হবে।

১২.১০. ১৫-১০-৯৩/২৯-১-৮৭ তারিখ সকাল দশটায় একাডেমীর সভাকক্ষে উপর্যুক্ত লটারী অনুষ্ঠিত হবে। লটারী পরিচালনা করবে অমর একুশে গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটি এবং লটারীর সময় আবেদনকারী বা তাঁর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারেন। লটারী বিষয়ে গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

১২.১১. লটারীর ফলাফল ১৫.১০.৯৩/২৯.১.৮৭ তারিখেই জানিয়ে দেয়া হবে এবং স্টলের বরাদ্দপত্র ১৬.১০.৯৩/৩০.১.৮৭ তারিখ বেলা দশটা থেকে একটার মধ্যে উপ-পরিচালক, বিপণন বিক্রয়োন্নয়ন উপ-বিভাগের কক্ষে নেয়া হবে। অংশগ্রহকারীরা ঐ সময়ের মধ্যে বরাদ্দপত্র সংগ্রহ করবেন।

১৩ অংশগ্রহণের সাধারণ শর্ত

১৩.১. যে অংশগ্রহণকারীকে যে স্টল বরাদ্দ করা হবে তা কোন অবস্থাতেই তিনি কাউকে হস্তান্তর করতে পারবেন না বা তাঁর স্টল কারও স্টলের সঙ্গে বিনিময় করতে পারবেন না।

১৩.২. স্টল সাজানোর দায়িত্ব বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বহন করবে। এজন্য কোন আর্থিক দায়-দায়িত্ব একাডেমী অথবা গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটি গ্রহণ করবে না।

১৩.৩. স্টল সাজানোর জন্য অংশগ্রহণকারী যেসব দ্রব্যসামগ্রী একাডেমী প্রাঙ্গণে আনবেন, সেগুলো আনা-নেয়া ও মেলা চলাকালে

সেগুলোর নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তিনিই বহন করবেন। আনীত দ্রব্যসামগ্রী বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় একাডেমী থেকে গেট পাশ নিয়ে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৩.৪. মেলার প্রস্তুতিপর্বে বা মেলাশেষে বা মেলা চলাকালে কোন চুরি বা দুর্ঘটনা বা অগ্নিকাণ্ড বা অন্য কোন আইন-বিরোধী ঘটনা বা শান্তিভঙ্গ বা বিশৃঙ্খলার জন্য একাডেমী বা গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটি দায়ী থাকবে না, এবং উপর্যুক্ত কারণে একাডেমী বা গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটির কাছ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ চাওয়া যাবে না বা একাডেমী বা গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটির বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা যাবে না। তবে সার্বিক নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করা হবে।

১৩.৫. কোন অংশগ্রহণকারী তাঁর স্টলের সামনে জায়গা দখল করে কোন কিছু নির্মাণ করতে পারবেন না বা কোন খুঁটি গেঁড়ে বা অন্য কোনভাবে আলোকসম্পাত করতে পারবেন না।

১৩.৬. কোন অংশগ্রহণকারী তাঁর স্টল বই ও পত্র-পত্রিকা প্রদর্শন, প্রচার ও বিক্রি এবং বইয়ের সাথে সম্পর্কিত ক্যাসেট বিক্রি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবেন না।

১৩.৭. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী তাঁর স্টল গ্রন্থমেলার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও সুরুচিসম্পন্নভাবে সাজানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৩.৮. কোন অংশগ্রহণকারী গ্রন্থমেলায় ক্যাসেট বাজাতে বা মাইক্রোফোন বা স্পীকার ব্যবহার করতে পারবেন না।

১৩.৯. গ্রন্থমেলার কাজে একাডেমী বা গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত একাডেমীতে কর্মরত কোন ব্যক্তিকে কোন অংশগ্রহণকারী তাঁর ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়োগ করতে পারবেন না বা তাঁকে কোন অর্থ প্রদান করতে পারবেন না।

১৩.১০. গ্রন্থমেলা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ সাধারণভাবে ১৬-১১-৯৩/১-৩-৮৭ তারিখের আগে কোন অংশগ্রহণকারী মেলা

পরিত্যাগ করতে পারবেন না বা তাঁর স্টল বন্ধ করে দিতে পারবেন না। যদি কেউ তা করেন তাহলে পরবর্তী বছরে গ্রন্থ-মেলায় অংশগ্রহণের জন্য তাঁর আবেদনপত্র গৃহীত হবে না।

১৩.১১. অশ্লীলতা সুরুচিসম্মত নয় বা অন্য কোন কারণে কোন বই বা কোন লেখকের বই বা কোন পত্র-পত্রিকা একাডেমী বা গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটি যদি গ্রন্থমেলায় প্রচার বা প্রদর্শন বা বিক্রি করা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা না করে তাহলে কোন অংশগ্রহণকারী এভাবে বাঞ্ছনীয় নয় বলে বিবেচিত বই না পত্র-পত্রিকা প্রদর্শন বা প্রচার বা বিক্রি করতে পারবেন না। একাডেমী বা গ্রন্থমেলা পরিচলনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই ধরনের বই বা পত্র-পত্রিকা অংশগ্রহণকারী তাঁর স্টল থেকে সরিয়ে ফেলবেন। এ বিষয়ে একাডেমী বা গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্তই হবে এবং তার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি তোলা যাবে না। এ সিদ্ধান্ত কোন অংশগ্রহণকারী যদি মানতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাঁর স্টলের বরাদ্দ বাতিল হয়ে যাবে, তাঁকে তাঁর জমা-দেয়া টাকা ফেরৎ দেয়া হবে না এবং তাঁকে ভবিষ্যতে মেলায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া যাবে না।

১৩.১২. গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটি যে কোন সময় যে কোন স্টল পরিদর্শন করতে পারবে এবং কমিটি যদি মনে করে যে, কমিটির সিদ্ধান্ত কোন অংশগ্রহণকারী মেনে চলছেন না, তাহলে কমিটি সে অংশগ্রহণকারীকে বরাদ্দকৃত স্টলের বরাদ্দ বাতিল করে দিতে পারবে, এবং তা করা হলে অংশগ্রহণকারীকে গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটি কর্তৃক, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রন্থমেলা পরিত্যাগ করতে হবে এবং তিনি তাঁর জমা-দেয়া টাকা ফেরৎ পাবেন না।

১৪. বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

১৪.১. ৮´×৮´×৮´ আকারে প্রতিটি স্টলে কাঠের বোর্ডের উপর ফিউজ ও ব্রিজ কাট-আউট সংবলিত একটি করে বিদ্যুৎ পয়েণ্ট

স্থাপন করা হবে অর্থাৎ 'ক' এককে তিনটি, 'খ' এককে দুটি এবং 'গ' এককে একটি বিদ্যুৎ পয়েণ্ট স্থাপন করা হবে।

১৫. বইয়ের স্টল অংশগ্রহণকারীকে হস্তান্তর

১৫.১. ১৭-১০-৯৩/৩১-১-৮৭ তারিখ সকাল দশটায় বরাদ্দপ্রাপ্ত আবেদনকারীকে গ্রন্থমেলার মাঠে একাডেমীর পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ, বরাদ্দকৃত স্টলের কাঠামো বুঝিয়ে দেবেন। এ বুঝিয়ে দেয়ার কাজ সেদিন বেলা একটা পর্যন্ত চলবে। এ সময়ের মধ্যে অবশ্যই সকল অংশগ্রহণকারী তাঁদের স্টলের কাঠামো বুঝে নেবেন।

১৫.২. প্রত্যেক বরাদ্দপ্রাপ্ত অংশগ্রহণকারীকে স্টল তৈরী ও সাজানোর কাজ অবশ্যই ২১-১০-৯৩/৪-২-৮৭ তারিখের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং ২২-১০-৯৩/৫-২-৮৭ তারিখের মধ্যে অব্যবহৃত নির্মাণ-সামগ্রী সম্পূর্ণভাবে একাডেমী প্রাঙ্গণ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

১৫.৩. যদি কোন স্টল তৈরী ও সাজানোর কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন না হয় তাহলে সে স্টলের বরাদ্দ বাতিল হয়ে যাবে এবং সে স্টল নির্মাণের জন্য আনীত দ্রব্য-সামগ্রী সরিয়ে ফেলা হবে। উপর্যুক্ত সামগ্রী সরানোর সময় তার একটি তালিকা পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ বা তাঁর প্রতিনিধি তৈরী করবেন। তালিকা তৈরীর সময় বরাদ্দপ্রাপ্ত অংশগ্রহণকারী নিজে বা তাঁর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারবেন। এ তালিকা অনুযায়ী যদি কোন দ্রব্য-সামগ্রী হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয়, তার জন্য একাডেমী গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটি দায়ী থাকবে না, যদিও এ ধরনের পরিস্থিতি উদ্ভূত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে। এ ব্যবস্থা চূড়ান্ত হবে এবং এর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না। এভাবে যেসব প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ বাতিল হয়ে যাবে সেসব প্রতিষ্ঠান তাদের জমা-দেয়া টাকা ফেরৎ পাবেন কিন্তু পরবর্তী বছর তাদেরকে মেলায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না।

১৫.৪. ২৪-১০-৯৩/৭-২-৮৭ তারিখ বিকেল চারটে থেকে প্রতিটি স্টল সম্পূর্ণভাবে চালু করতে হবে।

১৬. বই বিক্রির কমিশন

১৬.১. বাংলা একাডেমীসহ প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী ১৫% কমিশনে মেলায় বই বিক্রি করবেন।

১৬.২. উপরের ১৬.১. এর নীতি কেবল বই খুচরো বিক্রির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১৭. গ্রন্থমেলার সুযোগ-সুবিধা

১৭.১. মেলায় পুরুষ ও মহিলাদের জন্য টয়লেটের ব্যবস্থা থাকবে।

১৭.২. গ্রন্থমেলা চলাকালে প্রতিদিন সকালে ও দুপুরে মেলা প্রাঙ্গণে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করা হবে।

১৭.৩. গ্রন্থমেলায় জেনারেটর স্থাপনের মাধ্যমে বিশেষ বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হবে। সমগ্র বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ১৯-১০-৯৩/২-২-৮৭ থেকে কার্যকর করার চেষ্টা করা হবে।

১৭.৪. সমগ্র প্রদর্শনী এলাকায় স্পীকারের ব্যবস্থা করা হবে, যাতে প্রয়োজনমত ঘোষণা প্রচার করা যায়। যন্ত্র-সঙ্গীত, নির্বাচিত কণ্ঠ-সঙ্গীত এবং বইয়ের পরিচিতি ধারণকৃত ক্যাসেট বাজানো হবে। আলোচনা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান চলার সময় তা গ্রন্থমেলার প্রাঙ্গণ থেকে শোনার ব্যবস্থা করা হবে।

১৭.৫. মেলায় চিকিৎসা কেন্দ্র থাকবে।

১৭.৬. প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১৭.৭. যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য মেট্রোপলিটন পুলিশকে অনুরোধ জানানো হবে। মেলা চলাকালে একাডেমী, রেডিও-টিভি-স্কুল ব্রডকাস্টিং সিস্টেম, অন্যান্য প্রচার মাধ্যম ও কর্তব্যরত চিকিৎসক ও সাংবাদিকদের গাড়ি ছাড়া অন্য কোন গাড়ি একাডেমী প্রাঙ্গণে ঢুকতে দেয়া হবে না। কোন সাইকেল

বা মোটর সাইকেল বা মপেড বা রিক্সা বা স্কুটার, মেলা চলাকালে একাডেমী প্রাঙ্গণে ঢুকতে দেয়া হবে না।

১৭.৮. দমকল বিভাগকে সৌজন্যমূলক ব্যবস্থা হিসেবে অগ্নি নির্বাপণের জন্য জরুরী ব্যবস্থা তৈরী রাখতে অনুরোধ জানানো হবে।

১৭.৯. মেলায় একটি তথ্যকেন্দ্র থাকবে। যেসব অংশগ্রহণকারী এ তথ্যকেন্দ্র থেকে তাঁদের বই সম্পর্কে প্রচার করতে চাইবেন তাঁরা তা করতে পারবেন। কিন্তু তা করতে গেলে, যা প্রচার করার অনুরোধ করা হবে, তার সম্পূর্ণ লিখিত ভাষ্য স্বাক্ষরসহ তথ্যকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

১৮. অন্যান্য

১৮.১. একাডেমীর কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী গ্রন্থমেলায় কোন স্টল দিতে পারবেন না।

১৮.২. গ্রন্থমেলা চলাকালে বাংলা একাডেমী বিক্রয়কেন্দ্র খোলা থাকবে।

১৮.৩. গ্রন্থমেলাব ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও নিরাপত্তার জন্য যাঁরা কাজ করবেন প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবেন এবং তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৮.৪. গ্রন্থমেলায় দৈনিক বিক্রির পরিমাণ, বিক্রীত বইয়ের প্রকৃতি ইত্যাদি তথ্য জানানোর অনুরোধ জানিয়ে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে নির্ধারিত ছকপত্র দেয়া হবে। গ্রন্থমেলার স্বার্থে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী ছকপত্র পূরণ করে গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটির কাছে জমা দেবেন। যে সব অংশগ্রহণকারী ছকপত্র পূরণ করে জমা দেবেন না পরবর্তী বছর মেলায় তাঁদের অংশগ্রহণ করতে দেয়া নাও যেতে পারে।

১৯. গ্রন্থমেলায় খাবারের স্টল

১৯.১. খাবারের স্টলের সংখ্যা হবে দশ। তবে প্রয়োজনবোধে এ সংখ্যা কম-বেশী করা যেতে পারে। খাবারের স্টল হবে

প্রেসভবন, পুকুরের পাড় ও বর্ধমান ভবনকে সীমানা ধরে মধ্যখানে যে উন্মুক্ত স্থান রয়েছে সেখানে।

১৯.২. প্রতিটি খাবারের স্টলের মাপ হবে সাধারণভাবে ১৬´×১২´×৮।

১৯.৩. খাবারের স্টল বরাদ্দের জন্য একাডেমীর নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞাপন প্রদান করা হবে।

১৯.৪. খাবারের স্টল বরাদ্দ কমিটি লটারীর মাধ্যমে স্টল বরাদ্দ করবেন।

১৯.৫. প্রতিটি খাবারের স্টলের জন্য আবেদনপত্রের সঙ্গে "বাংলা একাডেমী, ঢাকা"-এর অনুকূলে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট্‌ বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা জমা দিতে হবে। এ অর্থ প্রদান করা না হলে আবেদনপত্র জমা নেয়া হবে না। নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের মূল্য হবে পঁচিশ টাকা। এর সঙ্গে নিয়মাবলী সংযুক্ত থাকবে। ৭.১০.৯৩/২১.১.৮৭ থেকে ১২.১০.৯৩/২৬.১.৮৭ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে একটার মধ্যে আবেদনপত্র বিক্রি করা হবে। আবেদনপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১৩.১০.৯৩/২৭.১.৮৭ (বেলা একটা পর্যন্ত)।

১৯.৬. উপরের ১৯.৫ ধারায় উল্লিখিত অর্থ ছাড়াও প্রতি আবেদনকারীকে জামানত হিসাবে ৭৫০/- (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা দিতে হবে। যাঁরা বরাদ্দ পাবেন না তাঁদেরকে ২৭-১০-৯৩/১০-২-৮৭ তারিখে জামানতের অর্থসহ দেয়া পুরো অর্থ ফেরৎ দিয়ে দেয়া হবে। বরাদ্দপ্রাপ্ত আবেদনকারীর জামানতের টাকা মেলা শেষে ফেরৎ দেয়া হবে। তবে তিনি যদি কোন নিয়মভঙ্গ করেন, তাহলে জামানতের টাকা সম্পূর্ণ বা অংশত কেটে নেয়া যেতে পারে।

১৯.৭. কোন খাবারের স্টল কোন ঠেলাগাড়ি আনতে পারবে না। এবং স্টলের ক্যাসেট বাজাতে বা মাইক্রোফোন বা স্পীকার ব্যবহার করতে পারবে না।

১৯.৮. বরাদ্দপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে বা ব্যক্তিকে তার স্টল সাব-লেট করতে পারবে না।

১৯.৯. খাবারের স্টলে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা একাডেমী করবে এবং একাডেমীকৃত ব্যবস্থা ছাড়া অতিরিক্ত বিদ্যুৎ-পয়েন্ট লাগানো যাবে না।

১৯.১০. আলোর ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যাবে না।

১৯.১১. স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরি উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করতে হবে। একাডেমীর সচিব ও পরিচালকমণ্ডলী খাবারের স্টল নিয়মিত তদারক করবেন।

১৯.১২. প্রতিটি স্টলে খাবারের দামের তালিকা ঝুলানো থাকতে হবে। খাবারের মূল্য-তালিকা আগে পরিচালক, প্রতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগকে জমা দিতে হবে। খাবারের মূল্য মেলা চলা-কালে বৃদ্ধি করা যাবে না।

১৯.১৩. যদি সচিব ও পরিচালকমণ্ডলী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কোন স্টলের পরিবেশিত খাবার স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরি নয় বা উন্নতমানের নয় অথবা সে স্টল গ্রন্থমেলার পরিবেশ-বিরোধী কোন পদক্ষেপ নিয়েছে অথবা এ নিয়মাবলী ভঙ্গ করেছে তাহলে তাঁরা সে স্টলের বরাদ্দ বাতিল করে দিতে পারবেন।

২০ অঙ্গীকার পত্র

২০.১. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে এ নীতিমালা ও নিয়মাবলী এবং একাডেমী বা গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে এবং তা মেনে চলার অঙ্গীকারপত্র প্রদান করতে হবে।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটি ১৯৮৭

১. ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল : সভাপতি
মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী

২. জনাব সানাউল হক : সদস্য
কা.নি.প. সদস্য, বা/এ

৩. প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী : সদস্য
কা.নি.প. সদস্য, বা/এ

৪. ডঃ আলাউদ্দিন আল আজাদ : সদস্য
কা.নি.প. সদস্য, বা/এ

৫. জনাব এ. বি. চৌধুরী : সদস্য
কা.নি.প. সদস্য বা/এ

৬. জনাব চিত্তরঞ্জন সাহা : সদস্য
অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক, বাপুপ্রবিস ও
সভাপতি, সৃজনশীল সাহিত্য স্ট্যাণ্ডিং কমিটি

৭. জনাব ইফতেখার রসুল জর্জ : সদস্য
সম্পাদক, সৃজনশীল সাহিত্য স্ট্যাণ্ডিং কমিটি, বাপুপ্রবিস

৮. জনাব ওসমান গণি : সদস্য
সহ-সম্পাদক, সৃজনশীল সাহিত্য স্ট্যাণ্ডিং কমিটি, বাপুপ্রবিস

৯. জনাব রুহুল আমিন : সদস্য
সদস্য, সৃজনশীল সাহিত্য স্ট্যাণ্ডিং কমিটি কার্যকরী
পরিষদ, বাপুপ্রবিস

১০. জনাব মঈনুল হাসান : সদস্য
সচিব, বাংলা একাডেমী

১১. জনাব গোলাম মঈনউদ্দিন : সদস্য
পরিচালক, প্রাপপ্র বিভাগ, বা/এ

১২. জনাব সুব্রত বিকাশ বড়ুয়া : সদস্য
উপ-পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক উপ বিভাগ, বা/এ

১৩. জনাব আশফাক-উল আলম : সদস্য
উপ-পরিচালক, সংস্কৃতি উপ-বিভাগ, বা/এ

১৪. জনাব হাবীব-উল আলম : সদস্য আহবায়ক
উপ-পরিচালক, বিওবি উপ-বিভাগ, বা/এ

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান

'ক' একক

প্রতিষ্ঠানের নাম

১. গ্রন্থালয় ২. মুক্তধারা ৩. থিয়েটার ৪. আহমদ পাবলিশিং হাউস ৫. পুথিঘর লিমিটেড ৬. জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী

'খ' একক

১. নতুন কথা ২ বুক সোসাইটি ৩. নওরোজ কিতাবিস্তান ৪. প্রতিপক্ষ প্রকাশন ৫. পাণ্ডুলিপি ৬. অনিন্দ্য প্রকাশনী ৭. হাক্কানী পাবলিশার্স ৮. কারেন্ট নিউজ ৯. খোশরোজ কিতাব মহল ১০. চৌধুরী পাবলিশার্স ১১. নলেজ হোম ১২. সুবর্ণ ১৩. বিদ্যা প্রকাশ ১৪. ঝিনুক ১৫. নব প্রকাশ ভবন ১৬. বই মঞ্চ ১৭. বুকস এ্যাণ্ড পিরিওডিক্যালস ১৮. টোনাটুনি ১৯. ডানা প্রকাশনী ২০. নওরোজ সাহিত্য সংসদ ২১. গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার ২২. নওরোজ সাহিত্য সম্ভার ২৩. বিউটি বুক হাউস ২৪. ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিঃ ২৫. সাগর পাবলিশার্স ২৬. বইঘর ২৭. কাকলী প্রকাশনী ২৮. খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং

'গ' একক

১. ফেরদৌস পাবলিকেশনস ২. তাজমহল বুক ডিপো ৩. বর্ণ বিচিত্রা ৪. সঞ্চিতা ৫. ঢাকা আহছানিয়া মিশন ৬. আগামী প্রকাশনী ৭. ফোর-কানিয়া লাইব্রেরী ৮. মফিজ বুক হাউস ৫. সুরভী প্রকাশনী ১০. সানন্দ প্রকাশন ১১. জাবেদ ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল ১২ চলন্তিকা বইঘর ১৩. বিকেল প্রকাশনী ১৪. এম. এন. ও. পাবলিকেশন ১৫. কিশোর জগত প্রকাশনী ১৬. ফেরদৌসী প্রকাশনী ১৭.স্বরলিপি প্রকাশনী ১৮. ঢাকা প্রকাশনী ১৯. হাসি প্রকাশনালয় ২০. চর্যাপদ ২১. রূপম প্রকাশনী ২২. নিখিল প্রকাশন ২৩. লেখক প্রকাশনী ২৪. তরফদার প্রকাশনী ২৫. সিন্দাবাদ প্রকাশনী ২৬. গ্রন্থনীড় ২৭. সাহস প্রকাশন ২৮. পালক

পাবলিশার্স ২৯. কালান্তর প্রকাশনী ৩০. প্রগতি প্রকাশনী ৩১. রজনী-গন্ধা প্রকাশনী ৩২. পুঁথিপত্র প্রকাশনী ৩৩. ধানশীষ প্রকাশনী ৩৪. ব্র্যাক প্রকাশনী ৩৫. ন্যাশন্যাল ক্রিশ্চিয়ান ফেলোশীপ অব বাংলাদেশ ৩৬. সুপ্রকাশ ৩৭. আগামীকাল লেখক গোষ্ঠী ৩৮. সব্যসাচী ৩৯. লোকায়ত ৪০. ঢাকা টাউন লাইব্রেরী ৪১. সুলেখা প্রকাশনী ৪২. তিতাস প্রকাশনী ৪৩. বেংগল লাইব্রেরী ৪৪. গণ প্রকাশনী ৪৫. দিন রাত্রি প্রকাশনী ৪৬. দি কলতান প্রকাশনী ৪৭. সংস্কৃতি প্রকাশনী ৪৮. আনন্দ ধারা ৪৯. প্রিয় প্রকাশনী ৫০. রুনা প্রকাশনী ৫১. ত্রিভুজ প্রকাশনী ৫২. ক. খ. গ. লাইব্রেরী ৫৩. গ্রাফোসম্যান ৫৪. শতদল প্রকাশনী লিঃ ৫৫ এখন ৫৬. ষ্টুডেন্ট ওয়েজ ৫৭. অনুপম প্রকাশনী ৫৮. সেরহিন্দ প্রকাশন

প্রতিষ্ঠানের নাম

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২. শিশু একাডেমী ৩. এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ৪. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা ৬. বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ৭. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট ৮. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ৯. বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি ১০. বাংলা একাডেমী

জীবনী গ্রন্থমালা

পরিচিতি

বইয়ের সংখ্যা : ৩০ প্রচ্ছদ : সমর দাস
বইয়ের আকার : ডবল ডিমাই ১/১৬ মূল্য : পনেরো টাকা

প্রসঙ্গ-কথা

সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্যে কবি সাহিত্যিক প্রাবন্ধিকদের প্রামাণ্য জীবন-কথা অপরিহার্য উপাদান হিসাবেই বিবেচিত। দুই দশক আগে অধুনালুপ্ত 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' প্রখ্যাত সাহিত্য সাধকদের জীবনীগ্রন্থ প্রকাশের লক্ষ্যে যে-পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তার গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। দুঃখের বিষয়, মাত্র চৌদ্দটি জীবনী প্রকাশের পরে উন্নয়ন বোর্ডের এই কার্যক্রম পরিত্যক্ত হয়।

বাংলা সাহিত্যের গবেষক ও ইতিহাস রচয়িতাদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই সম্প্রতি বাংলা একাডেমী কর্তৃক "জীবনী গ্রন্থমালা" শীর্ষক যে প্রকল্প গৃহীত হয়েছে তার পূর্ণ বাস্তবায়ন, আমাদের বিশ্বাস, এ ক্ষেত্রে অনুভূত দীর্ঘদিনের শূন্যতা, অংশত হলেও, পূরণ করবে। বাংলা ভাষার একশ' জন বিশিষ্ট লেখকের জীবনী এই প্রকল্পের অধীনে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবে। এবার একুশে ফেব্রুয়ারীতে ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে বাংলা একাডেমীর সশ্রদ্ধ নিবেদন ত্রিশজন স্মরণীয় সাহিত্যশিল্পীর জীবনালেখ্য।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী ঢাকা

গোবিন্দচন্দ্র দাস / সৈয়দ আবুল মকসুদ

(১৮৫৫-১৯১৮)

গোবিন্দ চন্দ্র দাস তাঁর মৌলিক কাব্যশৈলীর গুণে উনিশ শতকের মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেও রবীন্দ্রোত্তর কালের আধুনিক কবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কোনো রোমান্টিক চেতনায় তিনি উদ্বুদ্ধ হননি। নিরন্তর দারিদ্র্যে নিগৃহীত এই কবি প্রধানত দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকেই অকপট ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু সমকালীন সমাজে ও সাহিত্যে তিনি সম্পূর্ণতই উপেক্ষিত জীবন-যাপন করে গেছেন। বর্তমান গ্রন্থে সৈয়দ আবুল মকসুদ 'স্বভাব কবি' গোবিন্দ দাসের বিলুপ্তপ্রায় জীবনকথা পুনরুদ্ধার করেছেন।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ / মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

(১৮৬৮-১৯৬৮)

মুসলিম সাংবাদিকতার জনক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর নাম আজ সর্বজনবিদিত। শতায়ু আকরম উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০৩ সালে, মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে সাংবাদিকতা শুরু করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'দৈনিক আজাদ' (১৯৩৬) পত্রিকা অবিভক্ত বঙ্গদেশে মুসলিম জনমত গঠনে পালন করে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত মওলানা আকরম খাঁ জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় সংগঠনেরই গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অমর কীর্তি হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনীগ্রন্থ 'মোস্তফা চরিত' এবং পবিত্র কোরআনের বঙ্গানুবাদ। বর্তমান গ্রন্থে জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর এই অগ্রণী সাংবাদিকের জীবন ও অবদানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ / আহমদ শরীফ
(১৮৭১-১৯৫৩)

নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহ্যপ্রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বাংলা সাহিত্যের যে বিপুল পুথিসম্পদ সংগ্রহ করেন, তা এখন আমাদের গৌরবময় উত্তরাধিকার। তাঁর নিরলস প্রযত্নে ও সাধনায় মধ্যযুগের অনেক বিস্মৃত কবি ইতিহাসে নতুন মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। কোনো স্বীকৃতি অথবা পুরস্কারের প্রত্যাশায় নয়, কেবল আপন সংস্কৃতির স্বরূপ অন্বেষণে প্রতিশ্রুত সাহিত্যবিশারদ শুধু সংগ্রাহক ছিলেন না, সম্পাদক ও প্রাবন্ধিক হিসাবেও তিনি পথিকৃতের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। অধ্যাপক আহমদ শরীফের এই সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনায় তারই উজ্জ্বল পরিচয় বিধৃত।

কেদারনাথ মজুমদার / যতীন সরকার
(১৮৭০-১৯২৬)

মফঃস্বলবাসী কেদারনাথ মজুমদার ১৮৭০ সালে মৈমনসিংহ জেলায় জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিলো নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তথাপি অসাধারণ সাহিত্যপ্রীতি ও প্রবল জ্ঞানানুসন্ধিৎসার বলে গবেষক ও ইতিহাস-বিদ্ হিসাবে তিনি যে-সাফল্য অর্জন করেন এ পর্যন্ত তার প্রকৃত মূল্যায়ন হয় নি। বাংলা সাহিত্যেব প্রখ্যাত ইতিহাস রচয়িতাদের কাছেও তিনি হয়েছেন উপেক্ষিত। বর্তমান জীবনী গ্রন্থে শ্রী যতীন সরকার এই অবহেলিত সাংবা-দিক ও সাহিত্যসেবীর অবদানের বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন।

রমেশ শীল / সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ
(১৮৭৭-১৯৬৭)

কবিয়াল রমেশ শীল তাঁর জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তীর পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কবিগানের সচ্ছল ধারাটি উনিশ শতকের বঙ্গদেশে নব্য বিত্তশালীদের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয় এবং অশ্লীলতার অবাধ অনুপ্রবেশে তার প্রাণশক্তি ক্রমশই হারিয়ে যেতে থাকে। নবীন বয়সে রমেশ শীলও এই বিকৃত কবি-

গানের ধারাই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু পরে স্বাদেশিকতা ও সমাজ-মনস্কতার সমন্বয়ে তাঁর রচিত গান এক নতুন মাত্রা অর্জন করে। ডক্টর সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ এই গ্রন্থে কবিয়াল রমেশ শীলের জীবনকাহিনী ও শিল্প-সাধনার ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

মুকুন্দদাস / স্বরোচিষ সরকার
(১৮৭৮-১৯৩৪)

চারণ কবি মুকুন্দ দাসের গান ও স্বদেশী আন্দোলন প্রায় অভিন্ন সম্পর্কে গ্রথিত হয়ে আছে। একাধারে যাত্রা ও পালাকার এবং সুগায়ক মুকুন্দ দাস প্রথমত ভক্তিমূলক গান রচনার মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করেন, কিন্তু পরে তিনি গভীর স্বাধিকার বোধে উদ্বুদ্ধ হন। বস্তুত স্বদেশী গানের জন্যেই তাঁর খ্যাতি দেশের সর্বত্র ব্যাপ্তি লাভ করে। তাঁর রচিত যাত্রা ও পালাগানের সংখ্যাও একেবারে নগণ্য নয়। বাংলা সাহিত্যে স্বদেশী যুগের চিত্র পুনর্নিমাণের জন্যে মুকুন্দ দাসের গান নিঃসন্দেহে অমূল্য উপাদান। শ্রী স্বরোচিষ সরকার বর্তমান গ্রন্থে মুকুন্দ দাসের জীবন ও সাধনার যে বিবরণ দিয়েছেন তা পরবর্তী গবেষকের জন্যে সহায়ক হবে বলে মনে করি।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন / লায়লা জামান
(১৮৮০-১৯৩২)

বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী জাগরণের পথিকৃৎ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। অবরোধবাসিনীদের উন্মুক্ত বিশ্বে বেরিয়ে আসার যে-ডাক তিনি দিয়েছিলেন আমাদের সমাজজীবনে আজ তা সার্থকতা পেয়েছে। অথচ তাঁর জীবন শুরু হয়েছিলো অন্তঃপুরচারিণী হিসাবে। নিজের সমাজনির্ধারিত সীমা তিনি অতিক্রম করেছিলেন বিদ্যাচর্চায়, সাহসিকতায় ও জনকল্যাণমুখিতায়। কিন্তু সমাজসেবা যাঁর ব্রত ছিল, তিনিই ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তীক্ষ্ন, সাহসী, ঋজু গদ্য লেখক ও প্রতিভাময়ী সৃজনশীল সাহিত্যিক হিসাবে। বর্তমান গ্রন্থে ডক্টর লায়লা জামান এই মহীয়সী মহিলার জীবন কাহিনী সংকলন করেছেন।

এস. ওয়াজেদ আলি / সৈয়দ আকরম হোসেন
(১৮৯০-১৯৫১)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট লেখক এস. ওয়াজেদ আলি জীবন-চর্যায় ও শিল্প-সাধনায় ছিলেন এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। একাধারে গল্পকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও সম্পাদক ওয়াজেদ আলি সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অনন্য প্রতিভা ও রুচির পরিচয় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর জীবন ও সৃষ্টি দুই-ই বর্ণাঢ্য ও দীপ্তিমান। গল্পে কথকতায় তিনি যেমন ছিলেন সরস ও প্রাণবন্ত, মননশীল রচনায় তেমনি গভীর ভাবুকতা ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। বর্তমান গ্রন্থে অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন এই অধুনাবিস্মৃত সাহিত্যিকের বিচিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

শাহাদাৎ হোসেন / আবদুল মান্নান সৈয়দ
(১৮৯৩-১৯৫৩)

সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করলেও শাহাদাৎ হোসেন প্রধানত কবি ও নাট্যকার হিসাবেই বিশিষ্টতা অর্জন করেন। তাঁর কবিতার অঙ্গসংগঠন ও শব্দবিন্যাসের কঠিন সংহতিতে ধ্রুপদী ব্যঞ্জনার আভাস মেলে। তাঁর নাটকে আছে ইতিহাসের পটভূমিতে সংলগ্ন কুশীলবের অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী। কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও কিশোর পাঠ্য গ্রন্থ মিলিয়ে শাহাদাৎ হোসেনের রচনার পরিমাণ কম নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে সাহিত্যের রূপ ও রীতির লক্ষণীয় পালাবদল ঘটলেও শাহাদাৎ হোসেন তার দ্বারা প্রভাবিত হন নি। জনাব আবদুল মান্নান সৈয়দ বর্তমান গ্রন্থে এই কবি-নাট্যকার ঔপ-ন্যাসিকের জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

কাজী আবদুল ওদুদ / খোন্দকার সিরাজুল হক
(১৮৯৪-১৯৭০)

বাঙালি মুসলিম শিক্ষিত সমাজে কাজী আবদুল ওদুদ 'বুদ্ধির-মুক্তি'র আন্দো-লনের উদ্গাতা। ফরিদপুর জেলার গন্ডগ্রামে যাঁর জন্ম এবং মৃত্যু কলকাতায়, তিনি তাঁর জীবনের একটি বিশেষ পর্যায়ে এদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজে

ভাবান্দোলনের এক জোয়ার এনে দিয়েছিলেন, সার্থক শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও অভিধানপ্রণেতা কাজী আবদুল ওদুদ অসাম্প্রদায়িক, মুক্তচিন্তা-শ্রয়ী ভাবুক হিসাবে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এক নাম। খোন্দকার সিরাজুল হক নাতিদীর্ঘ পরিসরে কাজী আবদুল ওদুদের কর্মময় জীবন ও সাহিত্যসাধনার সম্যক পরিচয় তুলে ধরেছেন।

নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী / রশীদ আল ফারুকী
(১৮৯৪-১৯৭৫)

উনিশ শতকের শেষ দশকে মুর্শিদাবাদের সালার অঞ্চলে এক অভিজাত ও রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারে নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী জন্মগ্রহণ করেন। কঠিন অবরোধ প্রথার দরুণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তিনি লাভ করেন নি। তবে, পারিবারিক গন্ডীর ভেতরেই লেখাপড়া শিখেছিলেন। আইনজীবী কাজী গোলাম আহমদের সঙ্গে পরিণয়ের পর তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণের সুযোগ পান। নূরন্নেছা খাতুন দেশ পর্যটনের এই অভিজ্ঞতাকেই তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রেরণা বলে উল্লেখ করেছেন। গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বনে একাধিক উপ-ন্যাস ছাড়াও তিনি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। ডক্টর রশীদ আল ফারুকী বর্তমান গ্রন্থে এই বিস্মৃত প্রায় লেখিকার জীবনকাহিনী পুনর্নিমাণ করেছেন।

আকবরউদ্দীন / মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
(১৮৯৫-১৯৭৮)

১৮৯৫ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের এক বিশিষ্ট মুসলিম পরিবারে আকবরউদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনেই তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত এবং কর্মজীবনে প্রবেশের পরেও তাঁর সাধনায় যতি পড়ে নি। প্রথমত এবং প্রধানত নাট্যকার হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করলেও আকবরউদ্দীন অনুবাদে ও কথাসাহিত্যেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বেশ কিছুকাল সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। সময় ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব বোধ থেকেই তিনি সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিলেন। জনাব মোহাম্মদ আবদুল মজিদ বর্তমান গ্রন্থে লেখকের জীবনকাহিনী বিবৃত করেছেন।

গোলাম মোস্তফা / মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্
(১৮৯৭-১৯৬৪)

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের অন্তর্গত হ'লেও পরবর্তীকালে গোলাম মোস্তফা কাব্যের উপকরণ ও প্রকরণ উভয় ক্ষেত্রেই কাজী নজরুল ইসলামের দ্বারা লক্ষণীয়ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ইসলামের আদর্শ ও ঐতিহ্য, বিশেষ করে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে তাঁর কাব্যসাধনার প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে। গদ্যে ও পদ্যে স্বচ্ছন্দচারী গোলাম মোস্তফা রচিত 'বিশ্বনবী' অতিশয় সুললিত গদ্যের জন্যে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছিলো। জনাব মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ বর্তমান গ্রন্থে গোলাম মোস্তফার জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক নানা তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন / ভূঁইয়া ইকবাল
(১৮৯৭-১৯৭৮)

আবুল কালাম শামসুদ্দীন মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে সাংবাদিকতায় আত্ম-নিয়োগ করেন এবং পরবর্তী অর্ধশতাব্দী এই পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব পালন করেও প্রধানত ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুবাদে ও বিশ্লেষণধর্মী সমালোচনায় তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দেন, তা সমকালীন পাঠকের কাছে সমাদৃত হয়েছিলো। দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা ও ঋজু প্রকাশ-ভঙ্গি ছিলো তাঁর সাহিত্য সমালোচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সততা ও তেজস্বিতার জন্যে কর্মজীবনে তিনি একাধিকবার বিপর্যয় বরণ করেছেন, কিন্তু অসত্যের সাথে আপোষ করেন নি। ডক্টর ভুঁইয়া ইকবাল বর্তমান গ্রন্থে এই খ্যাতনামা সাংবাদিক-সাহিত্যিকের কর্মময় জীবনের নানা তথ্য সঙ্কলন করেছেন।

আবুল মনসুর আহমদ / নুরুল আমিন
(১৮৯৮-১৯৭৯)

অবিভক্ত বঙ্গদেশে যে কয়জন সীমিত সংখ্যক মুসলমান গদ্য লেখক পাঠক ও সমালোচকের অভিনন্দনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন আবুল মনসুর আহমদ তাঁদের ভেতরে অন্যতম। একাধারে সাংবাদিক, রাজনীতিক ও সাহিত্যিক

আবুল মনসুর আহমদের সৃজনধর্মী ও মননশীল রচনাবলী বিষয়বৈচিত্র্যে যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি গদ্য শৈলীর বৈশিষ্ট্যেও স্বতন্ত্র। তাঁর তিক্তমধুর সামাজিক ও রাজনৈতিক স্যাটায়ারগুলির অনন্যতা অবিস্মরনীয়। উপন্যাস, ব্যঙ্গরচনা, আত্মজীবনী এবং অন্যান্য লেখা মিলিয়ে সতেরোটি গ্রন্থের রচয়িতা আবুল মনসুর আহমদ। বর্তমান গ্রন্থে জনাব নূরুল আমিন এই লেখকের জীবন ও সাহিত্য কর্মের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ / গোলাম সাক্‌লায়েন
(১৮৯৮-১৯৭৪)

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'পারস্য প্রতিভা'র স্নলিত গদ্য ও স্বচ্ছ চিন্তারীতির জন্যে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ অতি সহজেই সমকালীন পাঠক-সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কর্মজীবনে প্রশাসন বিভাগে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করলেও তাঁর সাহিত্য সাধনা অব্যাহত ছিলো। বাংলা একাডেমীর সাংগঠনিক রূপরেখা প্রণয়ন করার জন্যে এই প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্নে তাঁকে বিশেষ কর্মকর্তার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। অবসর গ্রহণের পরে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ আরো চারটি গ্রন্থ রচনা করেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা মুসলিম গদ্য লেখকদের মধ্যে অন্যতম মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র জীবনী প্রণয়ন করেছেন অধ্যাপক গোলাম সাক্‌লায়েন।

মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা / তপন চক্রবর্তী
(১৯০০-১৯৭৭)

ডক্টর মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা ছিলেন বিজ্ঞান-বিমুখ বাঙালী মুসলমান সমাজে বিরল সংখ্যক বিজ্ঞানীদের অন্যতম। প্রশাসক ও সংগঠক হিসাবে তিনি বাংলাদেশে জনশিক্ষা ও বিজ্ঞানের বিস্তারে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর কালে নবগঠিত শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের গুরুদায়িত্বও মুহাম্মদ-কুদরাত-এ-খুদার উপরে অর্পিত হয়। এসব সত্ত্বেও জাতীয় জীবনের বস্তুগত প্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে নানা বিষয়ে নিজে যেমন গবেষণা করেছেন, তেমনি উৎসাহিত করেছেন নবীন প্রজন্মকে। বিজ্ঞান চর্চায় বাংলাভাষা প্রবর্তনের উদ্যোগেও তিনি

ছিলেন পথিকৃৎ। বর্তমান গ্রন্থে শ্রী তপন চক্রবর্তী এই মনীষীর জ্ঞান সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন।

মুহম্মদ এনামুল হক / মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
(১৯০২-১৯৮২)

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় নিবেদিত প্রাণ মুহম্মদ এনামুল হকের পাণ্ডিত্য ও সত্যানুসন্ধিৎসা ছিলো অবিসংবাদিত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের প্রতি যাঁরা প্রথম কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি তাঁদের ভেতরে অন্যতম। কর্মজীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থেকেও আমৃত্যু জ্ঞান সাধনায় তিনি ছিলেন নিরলস। তাঁর কর্ম-বহুল জীবনের নানা তথ্য সমন্বয়ে বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করেছেন ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল কাইউম।

আবুল ফজল / সারোয়ার জাহান
(১৯০৩-১৯৮৩)

কথাশিল্পী আবুল ফজল তাঁর সাহিত্য সাধনার পরিণত পর্যায়ে সমাজ ও সমকাল সচেতন প্রাবন্ধিক হিসাবে ব্যাপক স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভ্রান্ত সামাজিকের শুভবুদ্ধির উদ্বোধনে তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকা অবিস্মরণীয়। সত্য প্রকাশের অসঙ্কোচ সাহসে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশেও তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বর্তমান গ্রন্থে ডক্টর সারোয়ার জাহান স্বল্পপরিসরে আবুল ফজলের জীবন ও সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে যে-আলোক পাত করেছেন, আশা করি, অনুসন্ধিৎসু গবেষক ও পাঠকের কাছে তা মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ / আজহার ইসলাম
(১৯০৭-১৯৭৮)

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, দুঃখের বিষয়, এদেশে সর্বজ্ঞাত নাম নন। পূর্বগামী প্রজন্মে এ-দেশ এমন কিছু ব্যক্তিত্বকে জন্ম দিয়েছিলো তাঁদের মধ্যে চরিত্রের দৃঢ়তা, কর্মপ্রণোদনার ব্যাপ্তি ও দেশপ্রেমের এক বিরল সমাহার ঘটেছিলো। মুখ্যত সাংবাদিক বলে পরিচিত, অথচ রাজনীতিজ্ঞ ও সাহিত্যসেবী তো

বটেই, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ লিখেছেন কম, অথচ যাই লিখেছেন তাই সাহিত্যবোধ ও জীবন-অভিজ্ঞতায় জারিত। বর্তমান গ্রন্থে আজহার ইসলাম আনুপাতিকভাবে স্বল্পপরিচিত এই সাহিত্যিকের জীবন-কথা পাঠক সমাজে সংক্ষেপে উপহার দিয়েছেন।

সৈয়দ মুজতবা আলী / নূরুর রহমান খান
(১৯০৪-১৯৭৪)

সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর বিশিষ্ট গদ্যশৈলীর গুণে অতি অল্প সময়েই সমকালীন পাঠকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিশ্ব সাহিত্যে নিঃসংশয় অধিকার ও তীক্ষ্ণ রসবোধের সমন্বয়ে প্রমথ চৌধুরীর পরে বাংলা গদ্যে তিনি যে-মজলিসী কথকতাব প্রবর্তন করেন তা এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় রহিত। ভ্রমণ কাহিনী, উপন্যাস, সাহিত্য সমালোচনা ও মননশীল প্রবন্ধ মিলিয়ে তাঁর বিপুল সংখ্যক রচনায় পাণ্ডিত্য ও সৃজন ক্ষমতার বিচিত্র অভিব্যক্তি লক্ষণীয়। জনাব নূরুর রহমান খান বর্তমান গ্রন্থে এই বিশিষ্ট গদ্য লেখকের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের বিভিন্ন তথ্য সঙ্কলন করেছেন।

হবীবুল্লাহ্ বাহার / আবু জাফর শামসুদ্দীন
(১৯০৬-১৯৬৬)

জীবনে ও সাহিত্যে হবীবুল্লাহ্ বাহার বিচিত্রের সাধনা করেছেন। রাজনীতি, সাংবাদিকতা. খেলাধুলা, সাহিত্য—সর্বত্রই তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের নির্ভুল পরিচয় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামের 'ভক্ত শিষ্য' হবীবুল্লাহ্ বাহার চিন্তায় ও কর্মে ছিলেন নির্ভেজাল মানবতাবাদী। স্বসমাজ ও স্বদেশের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ এই লেখকের অজস্র রচনায় তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য মেলে। জনাব আবু জাফর শামসুদ্দীন বর্তমান গ্রন্থে হবীবুল্লাহ্ বাহারের বৈচিত্র্যময় জীবনের নানা তথ্য সঙ্কলন করেছেন।

আবদুল কাদির / রফিকুল ইসলাম
(১৯০৬-১৯৮৪)

কবি. ছান্দসিক, সম্পাদক ও গবেষক আবদুল কাদির ছাত্র জীবনে কাজী আবদুল ওদুদের সংস্পর্শে আসেন এবং মুসলিম সাহিত্য সমাজের 'বুদ্ধির মুক্তি'

আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর কাব্যপ্রয়াসে মোহিতলালের ধ্রুপদী সংগঠন ও নজরুলের উদাত্ত আবেগের চমৎকার সমন্বয় সহজেই লক্ষনীয়। বাংলা কবিতার ছন্দ সম্পর্কে আবদুল কাদিরের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি সম্পূর্ণতই নজরুল-গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বর্তমান গ্রন্থে আবদুল কাদিরের জীবন ও সাহিত্য সাধনার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন।

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা / বেগম আকতার কামাল
(১৯০৬-১৯৭৭)

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মধ্যবিত্তের সংগঠিত আত্মপ্রকাশের প্রথম পর্যায়েই মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার কাব্যসাধনার উন্মেষ। ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর গীতি কবিতার প্রথম সংকলন 'পশারিনী'। জীবদ্দশায় অতঃপর তাঁর আরো দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো। মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা কবি হিসাবে অসাধারণ ছিলেন না, উচচাভিলাষীও ছিলেন না। কিন্তু রক্ষণশীলতার অর্গল ভেঙে যেসব মহিলা সাহিত্যসেবী বাঙালী মুসলিম সমাজে নতুন চেতনার সঞ্চার করেন তিনি তাঁদেরই একজন। বর্তমান গ্রন্থে বেগম আকতার কামাল এই কবির জীবন ও সাহিত্য সাধনার ইতিহাস সংকলন করেছেন।

সত্যেন সেন / অজয় রায়
(১৯০৭-১৯৮১)

প্রধানত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত সত্যেন সেনের সাহিত্য-কৃতির উল্লেখযোগ্যতা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। তাঁর সাহিত্যসাধনার শুরু যখন তিনি পঞ্চাশ-অতিক্রান্ত। পরবর্তী দু'দশক লিখেছেন অজস্র, প্রধানত উপন্যাস। তার বিষয় সমাজ, রাজনীতি, সমকালীন ও অতীত ইতিহাস। প্রবন্ধ লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন। জীবনব্যাপী এই কর্মবৈচিত্র্য ও সৃষ্টি-শীলতার পিছনে চালিকাশক্তি ছিলো তাঁর দেশপ্রেম ও সমাজবোধ। বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মানুষটির সংক্ষিপ্ত অথচ সার্বিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন অধ্যাপক অজয় রায়।

শামসুননাহার মাহমুদ / আনোয়ারা বাহার চৌধুরী
(১৯০৮-১৯৬৪)

নোয়াখালী জেলার এক সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতিবান মুসলমান পরিবারে শামসুননাহার মাহমুদ জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ছয় মাস বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। অতঃপর মাতামহ খান বাহাদুর আব্দুল আজিজের পরিবারেই তাঁর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। প্রথমে মাতামহ ও পরে বিবাহোত্তর জীবনে স্বামী ডাক্তার ওয়াহিউদ্দিন মাহমুদের প্রেরণায় তিনি সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ সেবার প্রতি আকৃষ্ট হন। শামসুননাহার মাহমুদের প্রবন্ধাবলীতে সমাজ মনস্কতা ও দেশ-প্রেমের অকপট পরিচয় মেলে। বেগম আনোয়ারা বাহার চৌধুরী বর্তমান গ্রন্থে শামসুননাহার মাহমুদেব জীবন ও সাহিত্য সাধনার নানা দিকের ওপরে আলোকপাত করছেন।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ / শান্তনু কায়সার
(১৯১৪-১৯৫১)

কেবল একটি উপন্যাস রচনা করেই শ্রী অদ্বৈত মল্লবর্মণ বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত গোকর্ন গ্রামের ধীবর সম্প্রদায়ের জীবনচর্যা তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' গ্রন্থে যে-আন্তরিক মমতায় রূপায়িত হয়েছে তার তুলনা বাংলা কথা সাহিত্যে খুব বেশী নেই। দরিদ্র ধীবর পরিবারের সন্তান অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সুগভীর অন্ত-র্দৃষ্টির বলে এক উপেক্ষিত সমাজের জীবন সংগ্রামের কাহিনীকে দিয়েছেন অবিনশ্বরতা। জনাব শান্তনু কায়সার বর্তমান গ্রন্থে এই কথাশিল্পী সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য উপহার দিয়েছেন।

সোমেন চন্দ / হায়াৎ মামুদ
(১৯২০-১৯৪২)

বাংলা সাহিত্যে সোমেন চন্দ তাঁর গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে অল্পপঠিত সাহিত্যিক। বাইশ বৎসর বয়সে রাজনৈতিক মতদ্বৈধের পরিণামে তিনি নিহত হন। মাত্র পাঁচ বৎসর সময় সীমার মধ্যে সাহিত্য প্রতিভা এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক-সাংগঠনিক ক্ষেত্রে তিনি দুর্লভ শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন।

হায়াৎ মামুদ সাহিত্য ও সমাজকর্মী সোমেন চন্দের সমকাল ও সাহিত্য নিয়ে বর্তমান গ্রন্থ রচনা করে প্রায়-বিস্মৃত এক তরুণ প্রতিভাকে বিভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত করেছেন।

মুনীর চৌধুরী / কবীর চৌধুরী
(১৯২৫-১৯৭১)

বাংলাদেশের সাহিত্যে আধুনিকতার অন্যতম স্থপতি মুনীর চৌধুরী ছিলেন একাধারে সফল শিক্ষক, ব্যতিক্রমী নাট্যকার, তীক্ষ্ণধী সমালোচক ও দক্ষ অনুবাদক। সাহিত্য ও ধ্বনিতত্ত্বের গবেষণায় তাঁর নিঃসংশয় পাণ্ডিত্য ব্যাপক-ভাবে অভিনন্দিত হয়েছিলো। বস্তুত পাকিস্তানী আমলের বাংলাদেশে সৃজনে ও মননে এমন যৌগপত্য অন্য কোনো শিল্পীর প্রতিভায় ঘটে নি। ১৯৭১ সালে, মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে, ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে এই সৃষ্টিশীল প্রতিভার অকালমৃত্যু ঘটে। শহীদ মুনীর চৌধুরীর জীবন ও সাহিত্য-সাধনা ভিত্তিক বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করেছেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী / সিদ্দিকা মাহমুদা
(১৯২৬-১৯৭১)

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তাঁর সংক্ষিপ্ত কর্মজীবনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে যশস্বী হয়েছিলেন। আমাদের সাংস্কৃতিক জগতে অপরিহার্য এই নাম স্বদেশে ও বিদেশে মনস্বিতা ও সুরুচির জন্য খ্যাতি ও পরিচিতি লাভ করেছিলো। জাতির দুর্ভাগ্য যে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে দেশের শত্রু এক প্রতি-বিপ্লবী চক্রের হাতে তাঁর জীবন অকালে ঝরে গেলো। সিদ্দিকা মাহমুদা বর্তমান গ্রন্থে অকালপ্রয়াত দেশপ্রেমী এই অধ্যাপকের জীবনী লিপিবদ্ধ করে বিদ্বৎসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

এই গ্রন্থমালার তিরিশটি বই দশটি খণ্ডে বিন্যস্ত হয়েছে। খণ্ডগুলো নিম্নরূপ:

প্রথম খণ্ড

গোবিন্দচন্দ্র দাস
মোহাম্মদ আকরম খাঁ
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

দ্বিতীয় খণ্ড

কেদারনাথ মজুমদার
রমেশ শীল
মুকুন্দদাস

তৃতীয় খণ্ড

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
এস. ওয়াজেদ আলি
শাহাদাৎ হোসেন

চতুর্থ খণ্ড

কাজী আবদুল ওদুদ
নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী
আকবরউদ্দীন

পঞ্চম খণ্ড

গোলাম মোস্তফা
আবুল কালাম শামসুদ্দীন
আবুল মনসুর আহমদ

ষষ্ঠ খণ্ড

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্
মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা
মুহম্মদ এনামুল হক

সপ্তম খণ্ড

আবুল ফজল
মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ
সৈয়দ মুজতবা আলী

অষ্টম খণ্ড

হবীবুল্লাহ্ বাহার
আবদুল কাদির
মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা

নবম খণ্ড

সত্যেন সেন
শামসুননাহার মাহমুদ
অদ্বৈত মল্লবর্মণ

দশম খণ্ড

সোমেন চন্দ
মুনীর চৌধুরী
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

প্রতি খণ্ডের মূল্য : পঁয়তাল্লিশ টাকা।
পৃথকভাবে প্রতিটি বইয়ের মূল্য : পনের টাকা

অমর একুশে সাতাশি উপলক্ষে প্রকাশিত কয়েকটি বইয়ের আলোচনা

বিংশ শতাব্দীর নীতিদর্শন

দি মিউজিয়ামস ইন বাংলাদেশ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী (২য় খণ্ড)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)

জীবনী গ্রন্থমালা

বিংশ শতাব্দীর নীতিদর্শন / ডঃ শেখ আবদুল ওয়াহাব

আমিনুল ইসলাম

বিংশ শতাব্দীর নীতিদর্শন সম্পর্কে কিছু বলার আগে এ শতাব্দীর দর্শনের স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে কিছু বলে রাখা ভালো। কি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, কি শিল্পকলা, কি দর্শন—এ-সব দিক থেকেই বর্তমান শতকটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তার অধিকারী। দর্শনের ভুবনে, বিশেষত দর্শনের গতানুগতিক ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এ শতাব্দীর শুরুর দিকে সূচিত হয় এক মৌলিক পরিবর্তন, পরম্পরাগত দর্শনের স্থলে অভ্যুদয় ঘটে বিশ্লেষণী দর্শন, যৌক্তিক দৃষ্টবাদ, প্রয়োজনবাদ, অস্তিত্ববাদ প্রভৃতি নতুন নতুন দার্শনিক আন্দোলনের।

দার্শনিক ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এই যে পরিবর্তন, নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রেও তার প্রভাব সুস্পষ্ট। সক্রেটিস-প্লেটোর যুগ থেকে হোয়াইটহেড পর্যন্ত পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার যে প্রবহমান ধারা তাতে সত্য, সুন্দর, শুভ প্রভৃতি মূল্যমান ও মূল্যবোধ নিছক মনস্তাত্ত্বিক বিমূর্ত ধারণা নয়, বরং এগুলোই নীতিবোধ ও মূল্যবোধের, ন্যায় ও সত্যের বাস্তব ভিত্তি। যেমন প্লেটোর মতে, ন্যায় বলি আর সত্য বলি, সুন্দর বলি আর কল্যাণ বলি, এদের প্রত্যেকটির মূলেই রয়েছে এক একটি করে প্যাটার্ন—এগুলোই ন্যায় ও সত্যের মানদণ্ড, এরাই নৈতিক ও নান্দনিক আদর্শ স্বরূপ। এসব আদর্শ বা প্যাটার্নের আলোকেই গতানুগতিক নীতিদর্শনে (উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত) আলোচিত হতো নৈতিক আদর্শের স্বরূপ কী? মানুষের নৈতিক স্বাধীনতা আছে কি-না?—প্রভৃতি নৈতিক প্রশ্ন। কিন্তু বিশ শতকের শুরু থেকে এ ধরনের তত্ত্বমূলক আলোচনার স্থলাভিষিক্ত হয় এক ধরনের বিশ্লেষণধর্মী ও নৈয়ায়িক আলোচনার ধারা। তথ্যের সঙ্গে মূল্যের সম্বন্ধ, নৈতিক আদর্শ সনাক্তীকরণের পদ্ধতি এবং নৈতিক বচন সত্যায়নের প্রক্রিয়া প্রভৃতি নতুন নতুন বিষয় এসে গেলো আলোচনার কেন্দ্রস্থলে। অতীতের নিয়ন্ত্রণবাদ, পূর্ণতাবাদ প্রভৃতি মতের স্থলে গুরুত্ব লাভ করলো আবেগবাদ, বর্ণনাবাদ, সংজ্ঞাবাদ প্রভৃতি এমন কিছু নৈতিক মতবাদ উনিশ শতক পর্যন্ত যা চোখেই পড়ে না বলা চলে।

এ ধরনের প্রেক্ষাপটেই রচিত হয়েছে মূর ও রাসেলের দর্শন, তাঁদের নৈতিক মতবাদ এবং এ প্রক্রিয়ায়ই আবির্ভূত হয়েছে যৌক্তিক দৃষ্টবাদ নামক নতুন মতবাদটির। যৌক্তিক দৃষ্টবাদীদের মতে, সত্য, সুন্দর, শুভ প্রভৃতি মূল্য (value) বলে বাস্তবিকপক্ষে কিছু নেই— এ সবই আবেগপূর্ণ শূন্য উক্তি বিশেষ। নৈতিক আদর্শ বলে সনাক্ত ও প্রতিপালনযোগ্যও কিছু নেই। আসলে কোনো উন্নত আদর্শের প্রতি অনুরাগ নয়, বর্তমান সুখ-শান্তির চিন্তাই নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের সব চিন্তা ও কর্মকে। সৎ, মহৎ, শুভ প্রভৃতি যেসব শব্দ নীতিবিদ্যায় ব্যবহার করা হয়, প্রায়োগিক (empirical) পর্য-বেক্ষণে তাদের ধরা-ছোঁয়া যায় না, সত্য বা মিথ্যা বলেও তাদের সনাক্ত করা সম্ভব নয়। এ সবই আবেগের প্রকাশ, বাস্তব নয়।

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল যৌক্তিক দৃষ্টবাদী নন, অধিবিদ্যার সম্ভবপরতাকেও তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু তবু বিশেষত তাঁর পরবর্তী চিন্তায় ও রচনায় তিনি গতানুগতিক নীতিবোধের বিরোধিতা করে-ছেন। তাঁর এই পরবর্তী মতে, যথার্থ জ্ঞান মাত্রই বিজ্ঞানের আওতায় সীমিত। মূল্য বা মূল্যবোধ এমনই একটা জিনিস যার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বলতে পারে না। বিজ্ঞান আমাদের কেবল বাসনা চরিতার্থ করার, উদ্দেশ্য সাধনের উপায় বলে দেয়। কিন্তু কোন্ বাসনার চেয়ে কোন্ বাসনাটি উৎকৃষ্ট, এ প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞান দেয় না, দিতে পারেও না। আসলে মানুষের কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে বা অন্তরালে নৈতিক মানদণ্ড বলে কিছুই নেই। নীতিবিদ্যার কাজ মানুষের মতামত বা অভিরুচি নিয়ে আলো-চনা করা। কিন্তু সেই রুচি মূল্যায়নের সঠিক মানদণ্ড যেহেতু নেই, সুতরাং সিদ্ধান্তমূলক নৈতিক উক্তি, কোনো নৈতিক নির্দেশ, এমন কিছুই আসলে নেই।

সমকালীন দর্শনে অস্তিত্ববাদ (existentialisms) বলে যে মতবাদটি সাহিত্য ও দর্শন উভয় অঙ্গনেই গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে তার নৈতিক ভিত্তি এবং বৈশিষ্ট্যও এক কৌতূহলের ব্যাপার, বিশেষত বিশ শতকের নীতিদর্শনের প্রসঙ্গে। অস্তিত্ববাদ মানুষের ব্যক্তিসত্তার অপার সম্ভাবনা ও নিয়ত পরিবর্তনশীলতায় বিশ্বাসী। সুতরাং এমতে, দেশ-কাল-পরিস্থিতি নিরপেক্ষ কোনো নৈতিক বিধান নেই। ব্যক্তি নিজেই তার ভাগ্যবিধাতা, তার পছন্দ-অপছন্দ, নির্বাচন-নিয়ন্ত্রণের নিয়ামক শক্তি। মানবমন ও মানব-সমাজের পরিবর্তনশীল নিত্য নতুন অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে সময়োপযোগী

নির্দেশ প্রদানই হওয়া উচিত যেকোনো নৈতিক অনুশাসনের লক্ষ্য। নীতিবিদ্যার পরিভাষায় এ মতেরই নাম সৃজনী নৈতিকতা (creative morality)।

এ পর্যন্ত আমরা যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম তাতে বর্তমান শতকের কিছু (সব নয়) গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ব্যক্তিত্ব ও দার্শনিক আন্দোলনের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এবং এ ধরনের ইঙ্গিতেরই বিস্তারিত আলোচনা আমাদের প্রত্যাশা করার কথা 'বিংশ শতাব্দীর নীতিদর্শন' নামক যে কোনো গ্রন্থ থেকে। ডঃ শেখ আবদুল ওয়াহাব বিরচিত আলোচ্য শিরোনামের গ্রন্থটি থেকেও আমি আশা করেছিলাম এসব বিষয়ের অল্প-বিস্তর আলোচনা। কিন্তু গ্রন্থ পাঠে আমার সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে বলে আমার মনে হয় নি। লেখক এ গ্রন্থে বিংশ শতাব্দীর নৈতিক আন্দোলন ও দর্শনের যে চিত্র পরিবেশন করেছেন তা পূর্বাপব গতানুগতিক এবং নিতান্তই আংশিক, অসম ও খণ্ডিত। এজন্যই একদিকে যেমন আমরা তাতে পাই না অস্তিত্ববাদ কিংবা প্রয়োজনবাদের মতো এ শতকের কিছু বিখ্যাত দার্শনিক আন্দোলনের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা, তেমনি তাতে লক্ষ্য করি না বার্ট্রান্ড রাসেল ও ভিটগেনস্টাইনের মতো এ শতাব্দীর কিছু কিছু বরেণ্য দার্শনিকের নৈতিক মতের উল্লেখ। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লেখক বিশ শতকের প্রধান প্রধান নৈতিক মতের যে বিবরণ দিয়েছেন তা-ও গতানুগতিক কিছু ইংরেজী গ্রন্থের অনুকরণে রচিত এবং তাতেও অনুপস্থিত উল্লিখিত নৈতিক মতাবলীর আলোচনা। লেখক তাঁর গ্রন্থে মূর, এয়ার, স্টিভেনসন ও হেয়ার প্রমুখ বিশিষ্ট নীতিবিদদের মতের দীর্ঘ আলোচনা কবেছেন, সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন আরো কিছু অপেক্ষাকৃত কম খ্যাতিমান নীতিবিদের মত। এসব আলোচনাকে আরো কিছু সংক্ষিপ্ত করে একই পরিসরে তিনি যদি সাম্প্রতিক ও সমকালীন অবশিষ্ট আন্দোলন ও ব্যক্তিত্বের (যাদের নাম আমরা একটু আগে উল্লেখ করেছি) আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করতেন, কিংবা একটি পৃথক অধ্যায়ে এ-নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করতেন, তাহলেও পূর্ণাঙ্গ বলা যেতো গ্রন্থের সামগ্রিক আলোচনাকে, তাহলেই সমানুপাতিক বলা যেতো বিংশ শতকের সব নৈতিক মতের আলোচনাকে এবং তাহলেই বোধ করি আরো সার্থক হতো 'বিংশ শতাব্দীর নীতিদর্শন'-বর্তমান গ্রন্থের এই শিরোনামটি।

এখানে উল্লেখ্য যে, পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশযোগ্য কিনা এ বিষয়ে আগেই বাংলা একাডেমী আমার অভিমত চেয়েছিলেন এবং আমি অভিমতও দিয়েছিলাম এর মুদ্রণের পক্ষে, কিছু সংশোধন সাপেক্ষে। আমার অভিমতের অংশ বিশেষ ছিল এরকম: "পাণ্ডুলিপিতে কিছু কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা গিয়েছে . . . একটি ভ্রান্তি খুবই মারাত্মক এবং এ সম্পর্কে লেখক সচেতন নন বলে মনে হয়। তিনি নিজ হাতে বহুবার ইংরেজী fallacy শব্দটির বাংলা লিখেছেন 'অনুৎপত্তি'। সঠিক পারিভাষিক শব্দটি হবে অনুপপত্তি'। আশা করি মুদ্রণের সময় এ ত্রুটি সংশোধন করা হবে।" আমার এ পরামর্শ গ্রহণ করা হয় নি, আর তা নয় বলেই এ মারাত্মক ভুলটি এখনো মুদ্রিত হরফে টিকে আছে গ্রন্থের সূচীপত্রে এবং ৬০ পৃষ্ঠা থেকে ৬৮ পৃষ্ঠার মধ্যবর্তী বিভিন্ন স্থানে। এই ভুল শিক্ষা থেকে পাঠকদের বাঁচানো যাবে কি করে তা-ই ভাবছি।

যাই হোক, লেখক তাঁর আলোচনা থেকে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়েছেন বলে যেমন তাঁকে যথার্থই সমালোচনা করা যায় তেমনি আবার তিনি যা আলোচনা করেছেন তার জন্য তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবীদার। তাঁর ভাষা সহজ, সাবলীল ও গতিশীল। বহুদিন থেকে বাংলা ভাষা উচ্চতর জ্ঞানের বাহন হিসেবে স্বীকৃত, কিন্তু তবু এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রন্থের যেখানে এত অভাব, সেখানে 'বিংশ শতাব্দীর নীতিদর্শন' গ্রন্থটি পাঠকদের উপহার দেওয়ার জন্য ডঃ ওয়াহাব আন্তরিক ধন্যবাদের এবং এ সুন্দর গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহে ধন্যবাদের দাবীদার।

৮. ২. ৮৭ তারিখে আলোচনা অনুষ্ঠানে পঠিত

দি মিউজিয়ামস ইন বাংলাদেশ / ফিরোজ মাহমুদ ও হাবিবুর রহমান

ডক্টর মুখলেসুর রহমান

আলোচ্য গ্রন্থখানি কুড়িটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। তা ছাড়াও এতে রয়েছে একটি Epilogue বা উপসংহার, ম্যুজিঅম সমূহের তালিকা ও নির্ঘণ্ট এবং একটি সাধারণ নির্ঘণ্ট।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন ম্যুজিঅম। বিশেষতঃ বাংলাদেশের ম্যুজিঅম সম্পর্কে এত বিশাল এবং ব্যাপক গ্রন্থ ইতিপূর্বে কেউ রচনা করেন নি। ডঃ এনামুল হক প্রণীত Survey of Museums & Archaeological Education & Training in East pakistan (Dacca 1970) পুস্তকখানির বিষয়-বস্তু ১৯৭০ সালে পূর্বপাকিস্তানে বিদ্যমান ম্যুজিঅমগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আলোচ্য গ্রন্থের অনুরূপ এত ব্যাপক বিষয়ভিত্তিকও ছিল না সেখানে। আলোচ্য গ্রন্থে ম্যুজিঅমের ইতিহাসকে নিয়ে আসা হয়েছে বর্তমান কাল বা ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত। দেশ এবং জাতির জীবনে, বিশেষতঃ আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে ম্যুজিঅমের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পরিপ্রক্ষিতে। প্রচুর তথ্যভিত্তিক এই গ্রন্থখানি আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারে একটি মূল্যবান সংযোজন। এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থটি রচনার জন্য আমি গ্রন্থকারদ্বয়কে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

আলোচ্য গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয় কারণ তা সময় সাপেক্ষ। তাই বাংলাদেশের বর্তমান ৭৮টি ম্যুজিঅমকে সামনে রেখে লেখকদ্বয় আমাদের অবগতির জন্য যেসব বিষয়ের অবতারণা এবং বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন, তার সারসংক্ষেপ প্রথমে নীচে দিচ্ছি :

১. *দেশের ছোট বড় সকল ম্যুজিঅম এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিভাগীয় ম্যুজিঅমগুলির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব।*

২. *বাংলাদেশের প্রাকৃতিক উত্তরাধিকার; সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো; বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী সম্পদের প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য, ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব।*

৩. প্রাধান্যমূলক সংগ্রহভিত্তিক, স্থাপনার উদ্দেশ্যভিত্তিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদাভিত্তিক ম্যুজিঅমসমূহের শ্রেণীবিভাগ।

৪. বৃহত্তর জগৎ এবং উপমহাদেশীয় প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ম্যুজিঅমের উদ্ভবের ইতিহাস, তার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়, উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকাব প্রবণতা ; ম্যুজিঅম প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে পূর্বপকিস্তান সরকারের ব্যর্থতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনীহা।

৫. অতীতে এবং বর্তমানে বাংলাদেশে বিরাজমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ম্যুজি-অম ব্যবস্থাপনার মৌলিক দিকসমূহ এবং আর্থিক সংস্থান।

৬. বাংলাদেশেব ম্যুজিঅমগুলির সংগৃহীত প্রত্নসম্পদের বিবরণ ও তাৎপর্য ; ভবিষ্যতে সংগ্রহের সম্ভাব্যতা ; কৃষি, নৃতত্ব, জীববিদ্যা, সমকালীন ইতিহাস, শিল্পকলা ও কারুকর্ম, পরিবহন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কারিগরি-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ভিত্তিক ম্যুজিঅম স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এবং সেগুলির গুরুত্ব।

৭. বাংলাদেশের বর্তমান ম্যুজিঅম ভবনসমূহ, সেগুলির স্থাপত্যগত ত্রুটি, স্থানাভাব এবং সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা ; বাংলাদেশ জাতীয় ম্যুজিঅম ভবনের বিশদ বিবরণ।

৮. বাংলাদেশের ম্যুজিঅমগুলির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিবরণ, সেগুলির ত্রুটি এবং দুর্বলতা।

৯. বাংলাদেশের ম্যুজিঅম কর্মীদের পেশাগত যোগ্যতা ; এ প্রসঙ্গে museology, museography এবং সংরক্ষণ বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব।

১০. বাংলাদেশে ম্যুজিঅম প্রযুক্তির বিশদ বিবরণ এবং তার উন্নতির উপায়।

১১. বাংলাদেশে ম্যুজিঅম প্রশাসনের নৈতিকতা ও তার মান ; ম্যুজিঅম পেশায় নিয়োজিত কর্মীদের নৈতিক সততার প্রয়োজনীয়তা।

১২. ব্রিটিশ আমল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত দেশের প্রত্নসম্পদ রক্ষা এবং সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন ও তার দুর্বলতা।

১৩. ICOM এর উদ্দেশ্য, ICOM এবং তার বাংলাদেশ জাতীয় কমিটির মধ্যকার সম্পর্ক ; শেষোক্ত সংস্থার কার্যকলাপের বিবরণ এবং সাং-গঠনিক দুর্বলতা ; ICOM-এর সহযোগিতায় UNESCO কর্তৃক

বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ অন্যদেশ থেকে ফিরিয়ে আনার প্রশংসনীয় উদ্যোগ; বিদেশের বিভিন্ন ম্যুজিঅমে বর্তমানে সংরক্ষিত বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদের বিবরণ।

১৪. বাংলাদেশের কতিপয় ম্যুজিঅম প্রকল্প এবং বাংলাদেশ জাতীয় ম্যুজিঅম প্রকল্প।

১৫. বাংলাদেশে ম্যুজিঅম উন্নয়নের সমস্যাবলী; ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলার মাধ্যমে এদেশে ম্যুজিঅম উন্নয়নের জন্য বিবিধ সুপারিশ মালা।

পূর্বেই বলেছি, এই বিশাল গ্রন্থটির বিশদ আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবু আমি এই গ্রন্থে উপস্থাপিত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলবার চেষ্টা করব।

এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য এবং যৌক্তিকতা ব্যক্ত হয়েছে ১ থেকে ৪ পৃষ্ঠায়। গ্রন্থরচনার পদ্ধতির ব্যাখ্যা রয়েছে ৫ম পৃষ্ঠায়। ৫ম থেকে ১৪ পৃষ্ঠায় আছে যেসব তথ্য, অর্থাৎ পুস্তক পত্রিকা, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন প্রকল্প ইত্যাদির ভিত্তিতে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলির তালিকা, এবং তার মধ্যে কোন কোনটির বিশদ আলোচনা ও মূল্যায়ন। ডঃ এনামুল হক প্রণীত Survey of Museums & Archaeological Education and Training in East Pakistan (1970) বিশেষ প্রাসঙ্গিক বিধায় সেখানির প্রচুর সদ্ব্যবহার করেছেন লেখকদ্বয়।

ম্যুজিঅমে প্রত্ন ও অন্যান্য নিদর্শন সংগ্রহের পশ্চাতে বিদ্যমান কারণ সমূহের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা, ম্যুজিঅমের সংজ্ঞা ও তার যৌক্তিকতা, সংগ্রহের প্রাধান্য ভিত্তিক ম্যুজিঅমের শ্রেণী বিভাগ, প্রতিটি বিষয় ভিত্তিক ম্যুজিঅমের বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশের বিষয় ভিত্তিক বর্তমান ম্যুজিঅমগুলির নাম ও ঠিকানা সন্নিবিষ্ট হয়েছে ৫০ থেকে ৭১ পৃষ্ঠায়। কার্যক্রম এবং উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে স্থাপিত এবং মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র অনুযায়ী ম্যুজিঅমগুলির অতিরিক্ত শ্রেণীবিন্যাস এবং সেগুলির বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে ৭২ থেকে ৭৭ পৃষ্ঠায়। এ বিষয়গুলি দক্ষতার সঙ্গে আলোচিত এবং বিশ্লেষিত।

১৫৬ পৃষ্ঠাব্যাপী ৪র্থ পরিচ্ছেদে লেখকদ্বয় উপস্থাপিত করেছেন উপ-মহাদেশে এবং য়ুরোপের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ম্যুজিঅমের তথ্যবহুল ইতি-হাস। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে ম্যুজিঅমের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে

তাঁরা বিভক্ত করেছেন তিনটি ভাগে: ব্রিটিশ আমল (১৭৯৬-১৯৪৭), পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১) এবং বাংলাদেশ আমল (১৯৭১-১৯৮৬)। ব্রিটিশ আমলকে তাঁরা বিবেচনা করেছেন তিনটি পর্যায়ে যথা, ১৭৯৬—১৮৫৭, ১৮৫৭-১৮৯৯ এবং ১৮৯৯-১৯৪৭, এবং প্রতিটি পর্যায়ের মূল্যায়নও করেছেন তাঁরা। দেখা যায়, ব্রিটিশ আমলের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে কোন ম্যুজিঅম স্থাপিত হয় নি বাংলাদেশ নামে বর্তমানে পরিচিত ভূখণ্ডে। এই আমলের তৃতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে উপ-মহাদেশের প্রত্নসম্পদ রক্ষায় লর্ড কার্জনের সকর্মক ভূমিকার, তাঁর সমর্থন-পুষ্ট প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রশংসনীয় কাজকর্মের, সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে ম্যুজিঅম প্রতিষ্ঠার। এই পরিচ্ছেদেই লিপিবদ্ধ হয়েছে ম্যুজিঅম প্রতিষ্ঠার সামন্ত রাজন্যবর্গ, বিদ্বজ্জন সমবায়ে গঠিত সভা-সমিতি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ভূমিকা। এই পর্যায়েই বাংলাদেশে স্থাপিত হয় রাজশাহীতে বরেন্দ্র রিসার্চ ম্যুজিঅম (১৯১০), ঢাকায় ঢাকা এবং বলধা ম্যুজিঅম (১৯১৩ এবং ১৯২৫) এবং কুমিল্লায় রামমালা ম্যুজিঅম। রংপুর, ঢাকা এবং সিলেটে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখাগুলিতে একটি করে ম্যুজিঅমও স্থাপিত হয় এই পর্যায়ে। উপরোক্ত ম্যুজিঅমগুলির মধ্যে একমাত্র ঢাকা ম্যুজিঅম ছিল সরকারী সাহায্যপুষ্ট, অন্যান্যগুলির প্রতিষ্ঠা হয় সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগ এবং অর্থে।

বিভাগপূর্ব ভারতবর্ষে ছিল ১৬০টি ম্যুজিঅম, যার ১৮টি পড়ে পাকিস্তানে দেশ বিভাগের পর। এই ১৮টির মধ্যে মাত্র ৭টি ছিল পূর্বপাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশে। পাকিস্তানের জন্মের অব্যবহিত পরেই অবলুপ্তি ঘটে ঢাকা, রংপুর আর শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালাগুলির এবং দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে যেতে থাকে কুমিল্লার রামমালা ম্যুজিঅম।

দেশ বিভাগের পর এখানকার ধনী, শিক্ষিত ও অভিজাত হিন্দুদের অনেকে ভারতে চলে যায়। যার দরুন সাবেক ম্যুজিঅমগুলি হয়ে পড়ে সাংগঠনিক দুর্বলতা, অর্থাভাব এবং পৃষ্টপোষকতার অভাবের শিকার। সরকারের ঔদা-সীন্যও ছিল সেগুলির দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকারদ্বয় উল্লেখ করেছেন বরেন্দ্র ম্যুজিঅম এবং ঢাকা ম্যুজিঅমের কথা। ১৯৬৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হস্তান্তরিত হবার ফলে নিশ্চিত অপমৃত্যুর

হাত থেকে বেঁচে যায় বরেন্দ্র রিসার্চ ম্যুজিঅম। প্রাথমিক অসুবিধা সত্ত্বেও ঢাকা ম্যুজিঅম শুধু যে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয় তাই নয়, তার উল্লেখযোগ্য উন্নতিও হয় পাকিস্তান আমলে। ঢাকার শিক্ষিত এবং প্রভাবশালী সম্প্রদায়, বিশেষ করে এর পরিচালক ও কর্মী এবং ব্যবস্থাপনা পরিষদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পূর্বপাকিস্তান সরকার এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে বাধ্য হন। সরকার এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত অনুদানে এর সাবেক ভবনটি সুসংস্কৃত ও সম্প্রসারিত হয়, এর সংগ্রহ সমৃদ্ধ এবং গড়ে উঠে একটি গ্রন্থাগার। জাতীয় জীবনে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ম্যুজিঅমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং দেশের অতীত ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন, আগ্রহী ও উদ্বুদ্ধ করবার কাজে প্রশংসনীয় অবদান রাখেন এই প্রতিষ্ঠান এবং এর কর্মীরা। কিন্তু ঢাকা ম্যুজিঅমকে কেন্দ্রীয় অংশ করে একটি প্রাদেশিক ম্যুজিঅম স্থাপনের প্রকল্প অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও তা বাস্তবায়িত হয় নি পূর্বপাকিস্তান সরকারের ইচ্ছাকৃত গড়িমসির দরুন।

পাকিস্তান আমলের মূল্যায়নে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বাংলাদেশে স্থাপন করে পাহাড়পুর, মহাস্থান ও ময়নামতিতে একটি করে 'সাইট' ম্যুজিঅম। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত শিলাইদহ কুঠিবাড়ীর সংরক্ষণ এবং সেখানে একটি ম্যুজিঅম প্রতিষ্ঠার প্রকল্পও প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু তার বাস্তবায়ন হয় নি।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ঢাকা ম্যুজিঅম ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীন, কিন্তু এই সুদীর্ঘ ২৩ বৎসরেও এই ম্যুজিঅমটির উন্নতির জন্য কিছুই করেন নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অথচ, সদিচ্ছা এবং চেষ্টা থাকলে তাঁরা এই ম্যুজিঅমকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ম্যুজিঅম অব ইণ্ডিয়ান আর্টের অনুরূপ একটি সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করতে পারতেন। তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হত প্রভূত উপকার। নিজস্ব একটি ম্যুজিঅম রাখার ব্যাপারে এদেশের উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার প্রাচীনতম পীঠস্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনীহা প্রকৃতই দুর্বোধ্য এবং আদৌ সমর্থনযোগ্য নয় এ বিষয়ে আমি লেখকদ্বয়ের সঙ্গে (১৬৯-৭০ পৃ:) একমত। অপরদিকে, এই আমলেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন বরেন্দ্র রিসার্চ ম্যুজিঅমের, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সূত্রপাত হয় একটি প্রত্নতাত্ত্বিক ম্যুজিঅম স্থাপনের এবং ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত হয় একাধিক বিভাগীয় ম্যুজিঅম। এই সময়ে লোকশিল্পের নিদর্শন

সমৃদ্ধ একটি মু্যজিঅম প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমীতে। এগুলি ছাড়াও পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে স্থাপিত অন্যান্য মু্যজিঅমের বিশদ অথচ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে গ্রন্থের ১৭৫ থেকে ১৮৫ পৃষ্ঠায়।

বাংলাদেশ আমলে প্রতিষ্ঠিত মু্যজিঅমগুলির প্রকৃতি ও চরিত্র, উদ্দেশ্য ও বিধেয় এবং প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও সংগ্রহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে গ্রন্থের ১৯৩ থেকে ২৩২ পৃষ্ঠায়। এ আমলে সরকারী ব্যয়ে স্থাপিত বাংলাদেশ জাতীয় মু্যজিঅম অন্যান্যগুলির তুলনায় সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের জন্মলগ্নে এখানে ছিল ৫০টি মু্যজিঅম, যার মধ্যে ৩টি স্থাপিত ব্রিটিশযুগে এবং ৪৭টি পাকিস্তান আমলে। বাংলাদেশ আমলে প্রতিষ্ঠিত নতুন মু্যজিঅমের সংখ্যা ৩৩টি। শেষোক্তগুলির অন্তত ১২টি সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত এবং সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলের ২১টি মু্যজিঅম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বায়ত্তশাসিত প্রতি-ষ্ঠান, যেমন বিশ্ববিদ্যালয় ও জেলা পরিষদগুলির উদ্যোগে এবং সরকারী কর্মচারীদের উদ্যোগ আর স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায়। দু'টি মু্যজিঅম স্থাপিত হয়েছে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। খুবই দুঃখের বিষয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে হবিগঞ্জে স্থাপিত কবি মূর্তজার আহরণী মু্যজিঅম আজ অবলুপ্ত এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে দিনাজপুর শহরে ফাদার জন বার্বের ট্যাক্সিডারমি মু্যজিঅম, যা বাংলাদেশে অদ্বিতীয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষে লেখকদ্বয় যোগ করেছেন আটটি অতিরিক্ত অংশ (appendix), যেগুলিতে আমাদের চটজলদি অনুধাবনের জন্য সন্নিবিষ্ট করেছেন বিভিন্ন আমলের মু্যজিঅমের তালিকা, অধুনা অবলুপ্ত মু্যজিঅমের তালিকা, ১৭৯৬ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত বিভিন্ন আমলে প্রতিষ্ঠিত মু্যজিঅমের বিভাগ ও জেলাওয়ারী সারণি, শহরওয়ারী সারণি এবং শহর বহির্ভূত এলাকায় মু্যজিঅমের তালিকা। এর জন্য গ্রন্থকারদ্বয়কে আমি ধন্যবাদ জানাই।

তথ্যসমৃদ্ধ এবং ইতিহাসধর্মী মু্যজিঅম ব্যবস্থাপনা, ও আর্থিক সংস্থান সংক্রান্ত ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদটি সুলিখিত।

বাংলাদেশের বিভিন্ন মু্যজিঅম সংগ্রহের বিবরণগুলি (২৯১-৩৬২ পৃঃ) বিস্তারিত হলেও বেশ শিক্ষামূলক এবং চিত্তাকর্ষক। এ প্রসঙ্গে আমরা জানতে পারছি বরেন্দ্র রিসার্চ মু্যজিঅমের ভাস্কর্যসংগ্রহ সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ, কিন্তু বৈচিত্র্য ও সংখ্যাবিপুলতায় ঢাকা মু্যজিঅমের সংগ্রহ অদ্বিতীয়।

প্রাচীন প্রস্তরযুগের সামান্য কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে বাংলাদেশে, নবপ্রস্তর যুগের সন্ধান পাওয়া গেলেও তার কোন নিদর্শন এ দেশে এখন নেই। বাংলাদেশের সবক'টি ম্যুজিঅমের সংগ্রহ মূলতঃ ঐতিহাসিক যুগের (খৃঃ পূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত) এবং প্রত্নতাত্ত্বিক।

দ্রুত পরিবর্তনশীল বর্তমান জগতে জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের সাথে সাথে ম্যুজিঅমের নিকট মানব সমাজ এখন অনেক কিছু প্রত্যাশা করে এবং তার চাহিদাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এখন ম্যুজিঅমের সকল কর্মকাণ্ডে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি। এই প্রসঙ্গে ম্যুজিঅমকে প্রকৃত অর্থবহ এবং সার্থকনামা করে তোলার জন্য বর্তমানে ম্যুজিঅম বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ এবং তার সম্পদ সংরক্ষণকারীদের (৩৭২-৩৭৫ পৃঃ)। বাংলাদেশে ম্যুজিঅম কর্মীদের প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। তার কথা উল্লেখ করে গ্রন্থকারদ্বয় বলেছেন, এ ব্যাপারে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় যে ক'জন আছেন তাঁদের প্রায় সকলেই রয়েছেন জাতীয় ম্যুজিঅম-এ। ঢাকা তথা জাতীয় ম্যুজিঅম বিদেশে প্রশিক্ষণের যে সুযোগ সুবিধা পেয়েছে এবং এখনও পাচ্ছে, তা থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে দেশের অন্যান্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠান। দেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ম্যুজিয়ম কর্মীর অভাব মোচনের জন্য গ্রন্থকারদ্বয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খোলার পরামর্শ দিয়েছেন, এবং কতকগুলি বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে musealogy, museography এবং conservation এ প্রাথমিক এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের সৃষ্টি যাতে করা হয়, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সরকার এবং ম্যুজিয়ম কর্তৃপক্ষদের। তাছাড়া, বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য আরও অধিক সংখ্যক বৃত্তি এবং সেগুলির সুষম বণ্টনের প্রস্তাবও রেখেছেন তাঁরা।

Museum Technique এবং Museum Activities শীর্ষক পরিচ্ছেদ দু'টি (১৩শ ও ১৪শ) লেখকদ্বয়ের অনেক চিন্তা ভাবনা, পড়াশোনা, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ফসল। ম্যুজিঅম কর্মী ও কর্তৃপক্ষের জন্য অনেক অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য এবং অবশ্য করণীয় বিষয় রয়েছে এ দু'টিতে।

বিংশ বা শেষ পরিচ্ছেদে লেখকদ্বয় বাংলাদেশে ম্যুজিঅম উন্নয়নের একটি অল্পমূর্তি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। ম্যুজিঅমের কাজে তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি এই পরিচ্ছেদ সুপারিশে আকীর্ণ।

সুপারিশগুলি নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হবে। অনেকে হয়ত একমত হবেন না তাঁদের মতে; কিন্তু নিতান্ত অসার বলে বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপের পূর্বে বিবেচনার দাবী রাখেন সেগুলি। কারণ বাংলাদেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ম্যুজিঅম উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক এই সুপারিশগুলি।

প্রারম্ভেই বলেছি, ম্যুজিঅম বিষয়ক এমন একখানি গ্রন্থ ইতিপূর্বে আমাদের দেশে লেখা হয় নি। বর্তমান যুগে জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের সাথে সাথে ম্যুজিঅমের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এমন একখানি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ম্যুজিঅমের ইতিহাস, তার উদ্ভব ও বিকাশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, পণ্ডিত সমাজ, বিশ্ববিদ্যা-লয়, অভিজাত সম্প্রদায়ের ভূমিকা; ম্যুজিঅম বিজ্ঞান কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, ম্যুজিঅম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ম্যুজিঅম সংগ্রহের বিচিত্র ও তাৎপর্য, ম্যুজিঅমের শ্রেণী বিভাগ এগুলির অধিকাংশ আমাদের, বিশেষ করে ম্যুজিঅম কর্মীদের অজানা থেকে যেত এই গ্রন্থখানি রচিত না হলে। তাই, শিক্ষানুরাগী, ম্যুজিঅম প্রেমী ও ম্যুজিঅম কর্মীদের বহু-দিনের একটি গুরুতর অভাব মোচন করবে এই গ্রন্থখানি এবং তাঁরা নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন এর দ্বারা।

জনাব ফিরোজ মাহমুদ এবং হাবিবুর রহমান উভয়েই একদা ছিলেন বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিবেদিত প্রাণ ম্যুজিঅম কর্মী। প্রথমোক্তজন চৌদ্দ বছর যাবৎ ঢাকা ম্যুজিঅমে কাজ করেছেন বিভিন্ন পদে। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ এর নভেম্বর পর্যন্ত এই ম্যুজিঅমের ভারপ্রাপ্ত পরিচালকও ছিলেন তিনি। সাবেক ঢাকা ম্যুজিঅমের অভূতপূর্ব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে তিনি জড়িত ছিলেন। উক্ত ম্যুজিঅমের প্রশাসনিক ও 'একাডেমিক,' সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন ও বিবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনাব ফিরোজ মাহমুদ উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের দক্ষিণহস্ত ছিলেন বললে অত্যুক্তি করা হবে না মোটেই। ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং য়্যুরোপের অনেক ম্যুজিঅমে তিনি শিক্ষাসফরও করেছেন। সে সময় একাধিক বিদেশী ম্যুজিঅমের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, নিদর্শন সংগ্রহ ও শ্রেণী বিন্যাস পদ্ধতি, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, শিক্ষা ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনি। তাঁর এবং হাবিবুর রহমানের দেশে এবং

বিদেশে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে এই গ্রন্থের পরিচালনা ও রচনায়, তথ্যের সমাবেশে এবং সেগুলির ইতিহাসধর্মী এবং বিশ্লেষণমূলক আলোচনায়।

প্রয়োজনীয় এবং জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ এই সুলিখিত ও সুপরিকল্পিত পুস্তকখানি ম্যুজিঅম কর্মীদের অবশ্যপাঠ্য এবং সার্বক্ষণিক সহচররূপে গণ্য হবার জন্য সর্বাংশে উপযুক্ত বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ জাতীয় ম্যুজিঅম এখন দেশের সর্বপ্রধান এবং বৃহত্তম একটি প্রতিষ্ঠান। আলোচ্যগ্রন্থ থেকে জানা যায় অনেক বাধা বিপত্তি এবং লাল ফিতার পীড়াদায়ক দৌরাত্ম্য অতিক্রম করে অবশেষে সরকারের বদান্যতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের জাতীয় ম্যুজিঅম। এ জন্য সরকার আমাদের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু অন্যান্য ম্যুজিঅম প্রসঙ্গে তাঁদের ব্যয়কুণ্ঠ নীতি এবং অনুদার মনোভাব আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। অত্যন্ত দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় ১৯৪৭ থেকে ১৯৮৭, এই ৪১ বৎসরের মধ্যেও জাতীয় বিজ্ঞান ম্যুজিঅম প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং এই প্রকল্পের অগ্রগতি অতি মন্থর এবং এর বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ খুবই অপ্রতুল। সরকারের অবহেলার আর দু'টি শিকার হল বরেন্দ্র রিসার্চ ম্যুজিঅম এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ম্যুজিঅম। শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বঞ্চিত করে কেবল মুখে রক্ত সঞ্চার করলে তাকে যেমন স্বাস্থ্য বলা যাবে না, তেমনি সরকারের উদ্যোগ এবং বদান্যতা রাজধানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে দেশের অন্যান্য ম্যুজিঅম গুলিকে উন্নয়নের পরিবর্তে বিলুপ্তির দিকেই ঠেলে দেওয়া হবে, নতুন কোন ম্যুজিঅম স্থাপিত হবে না।

তথ্য সমৃদ্ধ আলোচ্য গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। তাঁদের আলোচনা কয়েকটি স্থানে কঠোর সমালোচনায় পর্যবসিত হয়েছে। গ্রন্থের 'References' বা bibliography তে (৫৬১-৫৭১ পৃঃ) নিম্নোক্ত তিনটি গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল:

১. Alma S. Wittlin ph. D : **The Museum, its History and its Tasks in Education,** London, 1949.

২. **Archaeology in India,** Bureau of Education publication no. 66, Delhi, 1950.

৩. **Encyclopaedia Britannica,** vol, 15, 1866, M. 1033-1053.

বেশ কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদও রয়েছে আলোচ্যগ্রন্থে। আমি মাত্র একটির কথা উল্লেখ করব, কারণ এটি দৃষ্টিকটু গ্রন্থের সূচীপত্রে ১১ পরিচ্ছেদের নামের প্রথম শব্দ TRAINING এর বানান ভুল হয়েছে।

বাংলা একাডেমী এই পুস্তকের মূল্য ধার্য করেছেন ৩০০.০০ টাকা কিংবা ২৫ যুক্তরাষ্ট্রীয় ডলার, কিন্তু এর কাগজ এবং মুদ্রণের মান এই উচ্চমূল্য আদৌ সমর্থন করে না। পুস্তকে সন্নিবিষ্ট চিত্রগুলি এবং প্রচ্ছদ সর্ম্পকে আমি আমার মন্তব্য সংরক্ষিত রাখলাম।

গ্রন্থকারদ্বয় একটি তথ্য পরিবেশন করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এই পুস্তকেই আমি সন্ধান পেয়েছি পৃথিবীর প্রাচীনতম ম্যুজিঅম এবং তার প্রতিষ্ঠাতার যিনি সর্বপ্রথম প্রত্নতত্ত্ববিদও। প্রত্নতত্ত্ব ও ম্যুজিঅমের এই জনক ছিলেন খৃস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর. ব্যাবিলনের শেষ নৃপতি নেবো-নিডাস (৫৫৫-৪৩৮ খৃঃ পূঃ)। রাজধানী ব্যাবিলনে স্থাপিত ম্যুজিঅমটি এই নৃপতির ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং পরিশ্রমে উৎখনিত প্রত্নসমাজে পরিপূর্ণ ছিল একদা।

দীর্ঘ এবং একঘেয়ে আলোচনা শেষ করবার আগে এই সভায় উপস্থিত সুধীবৃন্দ এবং গ্রন্থের ভবিষ্যৎ পাঠককুলের নিকট সামান্য কিছু নিবেদন করতে চাই। তাহল, যে প্রতিষ্ঠানে অতীত আমাদের সঙ্গে কথা বলে, যেখানে সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত প্রত্নসম্পদ, শিল্পকলা ও কারুকার্যের নিদর্শন আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে, উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার উপকরণে যে প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধ, তাকে কোন নামে ডাকা হবে বা উচিত—যাদুঘর না ম্যুজিঅম? ব্রিটিশ আমলের আরম্ভ থেকে পাকিস্তান আমলের শেষ পর্যন্ত এ জাতীয় ২/৩টি প্রতিষ্ঠান 'সংগ্রহশালা' নামে অভি-হিত হলেও বাকী সবগুলিকে বলা হত ম্যুজিঅম। 'ম্যুজিঅম' শব্দটি মূলতঃ গ্রীক এবং প্রাচীনকালে এর দ্বারা বোঝাত এমন একটি মন্দির, ভবন বা প্রতিষ্ঠান, যেখানে ছিল 'মিউজ' নামে সুবিদিত এবং কবিতা, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, ইতিহাস, শিল্পকলা ও অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের অধিষ্ঠাত্রী ন'জন দেবীর পীঠস্থান। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে স্থাপিত আলেক-জান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারটি ছিল ম্যুজিঅম নামে পরিচিত এবং সে যুগে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এখানকার সংগ্রহে শিল্পকলা জীববিদ্যা এবং প্রচুর পাণ্ডুলিপি ছিল, কিন্তু অধ্যয়ন, শিক্ষাদান এবং গবেষণা ছিল, এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ও

বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত য়্যুরোপের ম্যুজিঅম এবং কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ম্যুজিঅমের আদর্শ ছিল আলেকজান্দ্রিয়াব এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশে বিদ্যমান অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'ম্যুজিঅম' না বলে 'সংগ্রহশালা' অথবা 'যাদুঘর' নামে অভিহিত করার সপক্ষে কোন জোরালো যুক্তি নেই। আমার মাতৃভাষা বাংলাকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করেই আমি বলতে চাই, বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে প্রচুব বিদেশী শব্দ রয়েছে, যা তার দুর্বলতার পরিচায়ক না হয়ে তাকে করেছে প্রকৃত পক্ষে সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী। বিদেশী বিধায় 'ম্যুজিঅম' শব্দটি যদি গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত না হয়, তাহলে, আমি বলব, বাংলা একাডেমীর নামের শেষাংশ 'একাডেমী' উঠিয়ে দিয়ে সেখানে একটি যুতসই বাংলা প্রতিশব্দ বসানো হোক। তা এতদিন করা হয় নি এবং সম্ভবও নয়, কারণ 'একাডেমী' শব্দটির অর্থবহতা কোন বাংলা শব্দে নেই, যেমন নেই 'রেললাইন', 'স্টুডিও', 'ক্যামেরা',। 'ব্যাঙ্ক', 'টেবল', 'চেয়ার', 'কাগজ', 'দোয়াত', 'বাস', 'ট্যাক্সি', 'বিল', 'ফুটবল', 'স্টেডিঅম' প্রভৃতির কোন বাংলা প্রতিশব্দে। 'রেডিও', 'টেলিভিশনের' বাংলা প্রতিশব্দ থাকলেও তা আমরা ব্যবহার করি না, 'বিল'কে বলি না 'আদেয়ক পত্র', কিংবা 'স্টীমার'কে 'অর্নবপোত' তা 'জলযান'; আবার 'জাহাজ' শব্দটি আদৌ বাংলা নয়। অথচ, এসব এবং আরো অনেক বিদেশী শব্দ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শুধু ডালভাতের সামিল হয় নি, স্থান পেয়েছে আমাদের সাহিত্যেও।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ বিশিষ্ট কয়েকটি ম্যুজিঅমকে বলা হত 'সংগ্রহশালা', তারও পূর্বে ইণ্ডিয়ান ম্যুজিঅমের স্থানীয় নাম ছিল এশিয়াটিক সোসাইটি বা শুধুমাত্র 'সোসাইটি'র 'যাদুঘর'। কিন্তু 'যাদুঘর' শব্দটির ব্যবহার তখন সীমাবদ্ধ ছিল কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে। ইণ্ডিয়ান ম্যুজিঅমে প্রদর্শিত অলংকরণ বহুল স্থাপত্যের বিশালাকার নিদর্শন, নানাবিধ প্রাচীন শিল্পকর্ম বা অন্যান্য নিদর্শন যেমন, প্রস্তরীভূত বৃক্ষকাণ্ড, আমি প্রভৃতির পরিচয় ছিল এই শ্রেণীর লোকের নিকট অজ্ঞাত এবং সেগুলির তাৎপর্য ছিল তাদের বোধাতীত। এই নিদর্শনগুলি তাদের মধ্যে যে কৌতূহল ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে, তা ছিল ভয় মিশ্রিতও। কুসংস্কারাচ্ছন্ন,

উপমহাদেশের অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেয়, ইণ্ডিয়ান ম্যুজিঅম বা 'মরাজন্তুর সোসাইটি'তে রক্ষিত দ্রষ্টব্যগুলি দেবতা বা দৈত্যের মায়া অর্থাৎ যাদু প্রসূত, মানুষ বা প্রকৃতির সৃষ্ট নয়। তাই ইণ্ডিয়ান ম্যুজিঅম ছিল তাদের দৃষ্টিতে ও বিবেচনায় 'যাদুঘর'। কিন্তু এই শব্দটি শিক্ষিত সমাজেও কতদূর প্রচলিত কিংবা আদরনীয় ছিল তা প্রমাণ সাপেক্ষ।

'ম্যুজিঅম' এর অর্থবহতা 'যাদুঘর' বা 'সংগ্রহশালা' শব্দ দু'টিতে অনুপস্থিত। ১৯৭৪ সালে ICOM কর্তৃক অনুমোদিত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ম্যুজিঅম একটি 'non profit makings, pernanent institution in the service of society and of its Development, and open to the public. which acquives, conserves, researches, Communicates and exhibits for purposes of Study education and enjoyment material evidences of man and his environment' (আলোচ্য গ্রন্থের ৫৭ পৃঃ)। এই সংজ্ঞার শেষ অংশে উল্লিখিত material evidences of man and his enviroment, অর্থাৎ 'মানুষ এবং তার পরিবেশের বস্তুগত প্রমাণ' যে যাদুর মাধ্যমে সৃষ্টি করা সম্ভব নয় এবং এ সব প্রমাণ যে প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত, তাকে 'যাদুঘর' বলে অভিহিত করা কেবল অসমীচীন নয়, প্রকাণ্ড ভুলও বটে। ম্যুজিঅমের অর্থবহতা 'যাদুঘরে' নেই, তা শেষোক্ত শব্দটির বানানে অন্তঃস্থ 'য' থাকুক বা বর্গীয় 'জ' ই থাকুক। তাছাড়া, ম্যুজিঅম' শব্দটিতে যে আভিজাত্য আর ঐতিহ্য আছে তা 'যাদুঘর' শব্দে নেই। অতএব, আমি মনে, করি, অন্যান্য বিদেশী শব্দের সঙ্গে অর্থবহ 'ম্যুজিঅম'-কেও বাংলা ভাষায় পরিগ্রহণ করা হোক এবং যথাস্থানে তাকে প্রয়োগ করা হোক।

পরিশেষে এই তথ্য বহুল, সুলিখিত গ্রন্থখানির প্রণেতা দু'জনকে পুনর্বার ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানিয়ে, এর প্রকাশক বাংলা একাডেমী এবং উপস্থিত বিদ্বজ্জনকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শেষ করছি।

৯.২.৮৭ তারিখের আলোচনা অনুষ্ঠানে পঠিত।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী : ২য় খণ্ড, সৈয়দ আকরম হোসেন কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে গবেষক-সমালোচকদের যে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, তা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ১৯৭১-এ প্যারিসে তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এদেশে নতুনভাবে আবিষ্কৃত হতে থাকেন, এবং তাঁর এই নতুন উন্মোচনের সাথে আমাদের স্বাধীনতা লাভের ঘটনাটিও পরোক্ষভাবে জড়িত। একটি জাতির আত্মআবিষ্কারের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় তার সাহিত্য সংস্কৃতির বিভিন্ন পরিচয়কে খুঁটিয়ে দেখা হবে এটাই স্বাভাবিক, 'লাল সালু' ও 'বহিপীর' রচয়িতা হিসেবে একদা খ্যাত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পর্যায়ক্রমে প্রচুর ছোটগল্প নাটক এবং অন্যান্য রচনার রচয়িতা হিসেবেও স্বীকৃতি লাভ করলেন। বর্তমানে তাঁকে নিয়ে অনেক প্রবন্ধ নিবন্ধ লেখা হয়েছে, বইও বেরিয়েছে তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মের উপর, বাংলা একাডেমী প্রকাশিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলীর দুটি খণ্ড এই ধারার সাম্প্রতিকতম ফসল, প্রথম খণ্ডটি তাঁর তিনটি উপন্যাস সমেত গত বছর একুশে ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় ও শেষ খণ্ডটি তাঁর গল্প নাটক ও বিবিধ রচনা নিয়ে এবছর অমর একুশে বাংলা একাডেমীর নিবেদন হিসেবে বেরিয়েছে, দুটি খণ্ডের সম্পাদক ডঃ সৈয়দ আকরম হোসেন, যার পরিশ্রমী ও দক্ষ সম্পাদনায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের সামগ্রিক ও পূর্বাপর পরিচয়টি সকল পাঠকের সামনে উন্মোচিত হয়েছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর যে কোনো রচনায় প্রধান উপজীব্য মানুষ ও তার জীবন : সার্বিকভাবে এই সত্যটি হয়তো অন্যান্য অনেক ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্র ক্ষেত্রে এরূপ একটি বিচার প্রধানত তাঁর-সমাজ-সচেতনতারই পরিচায়ক। যার সাথে তাঁর শিল্প দৃষ্টির অপূর্ব সংযোগে সৃষ্টি হয়েছে কিছু অসামান্য জীবন চিত্রের। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র ঘনিষ্ঠ জীবন দৃষ্টি-কোনো সমালোচকের পক্ষেতো নয়ই সাধারণ পাঠকের পক্ষেও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। উপন্যাসের মতো ছোটগল্পেও তিনি গভীর জীবন বোধের পরিচয় দিয়েছেন। খণ্ড খণ্ড পটে এসব ছোটগল্পে যে জীবন ও জীবনাভিজ্ঞতা বিধৃত, তার মাত্রা স্থানিক ও কালিক বিচারে সংকীর্ণ হলেও শিল্প বিচারে তা উভয়কে অতিক্রম করে যায়। প্রথম খণ্ডে "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-প্রসঙ্গে"

সৈয়দ আকরম হোসেন উল্লেখ করেছেন যে প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারায়' (১৯০৫) রূপায়িত হয়েছে একাধারে লেখকের সমকালের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের যন্ত্রণা, আর্তি ও বিষণ্নতা ('নয়নচারা' 'মৃত্যু-যাত্রা' ইত্যাদি), এবং পদ্মাতীরবর্তী পূর্ববাংলার মৃত্তিকাসংলগ্ন মানুষের সংগ্রামী জীবন: তাদের নৈরাশ্য, দ্বিধা, সন্দেহ ও ক্রোধ ('খুনী' 'পরাজয়' 'রক্ত' প্রভৃতি)।" (পৃঃ ৩৯২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একটি চলমান জনগোষ্ঠির সংগ্রামের ইতিহাসটি গভীর সহানুভূতি নিয়ে রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন এবং উপন্যাসের মাধ্যমে যে জীবন-রহস্যকে উন্মোচন করেছেন, যে সমাজ শ্রেণী ও ইতিহাস চেতনাকে ব্যক্ত করেছেন, বিভিন্ন ছোটগল্পের মাধ্যমে তাকেই একটি কোলাজের রূপে সংহত করেছেন। ছোটগল্পগুলিতে তাই বিষয়বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একটি আপাত: সাদৃশ্য চোখে পড়ে: মানুষের ব্যক্তিক ও সমষ্টিক উভয় রূপটি তুলে ধরতে গিয়ে শিল্পগত বিভিন্ন উপাদানের সমন্বিত ব্যবহার ছাড়াও তিনি কিছু অভিন্ন ভাবনার সঞ্চার করেছেন এসব ছোটগল্পে। পটভূমি অনেক গল্পে বাংলাদেশের নদী বা নদী অঞ্চল, এবং উপজীব্য নদীবাহিত, নদীলালিত চলিষ্ণু জীবন। উপন্যাসের মত ছোটগল্পও নদীর রূপক ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। নদীর মাধ্যমে জীবন ও মহাজীবনের একটি চিরায়ত প্রকাশকে রূপায়িত করাই ছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উদ্দিষ্ট। একজন সচেতন ও জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পী এবং নিরীক্ষাধর্মী প্রাগ্রসর কথাশিল্পী হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতিটি রচনাতেই বিধৃত। এই খণ্ডে 'নয়নচারা' ও 'দুইতীর ও অন্যান্য গল্প' সংকলন দুটি ছাড়াও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত বত্রিশটি গল্প সংকলিত হয়েছে। এছাড়া 'বহিপীর', 'তরঙ্গ-ভঙ্গ', 'সুড়ঙ্গ' ও 'উজানে মৃত্যু' চারটি নাটকও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর দুটি কবিতা, একটি প্রবন্ধ একটি চিত্র আলোচনা এবং একটি গ্রন্থ আলোচনাও স্থান পেয়েছে গ্রন্থটিতে। তবে গ্রন্থটির মূল্যবান অংশ হিসেবে অগ্রন্থিত গল্পগুচ্ছটি বিবেচিত হবে কারণ সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিভিন্ন সাময়িক পত্র ইত্যাদিতে প্রকাশিত এসব গল্প একত্র করে পড়া দু:সাধ্য হত, তেমনি, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রকৃত ও সামূহিক পরিচয়টি পাওয়ার জন্য এসব গল্প পাঠ করা এবং তাঁর অন্যান্য ছোটগল্প ও উপন্যাসের সাথে এদের সম্পর্কিত করা নিতান্ত আবশ্যক। সাধারণ বিবেচনায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গল্প সমূহকে একটি প্রধান ভাবনা কেন্দ্রিক বর্ণনা নির্ভর এবং মনস্তত্ত্বমূলক মনে হতে

পারে, তাঁর একটি বা দুটি গল্প বিচ্ছিন্নভাবে পড়লে এ ধারণা হওয়া অসঙ্গত নয়, কিন্তু তাঁর সবগুলি ছোটগল্প পরম্পরায় পড়লে একটি ভিন্ন বোধেরও সৃষ্টি হবে: যে ওয়ালীউল্লাহ তার ছোটগল্পসমূহে শুধু যে স্থানিক ও কালিক বাস্তবকে তুলে ধরেছেন, তাই নয়, তিনি বাস্তবের সারাৎসার সমূহ যে পরাবাস্তব তাকেও আয়ত্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন। জেমস জয়েসের বিখ্যাত ছোটগল্পসমূহের মত ওয়ালীউল্লাহও বাস্তবকে একটি খুঁটি বা plot হিসেবে ব্যবহার করেছেন, এবং প্রায়শই স্বপ্নের চমৎকারিত্ব এবং তাৎক্ষণিকতা নিয়ে যে জগৎ ঝলসে উঠে, আমাদের চেতনায় তার সন্নিকটবর্তী হয়েছেন ঐ প্রক্রিয়ায়। তিনি বর্ণনা এবং ঘটনা এ উভয় রাস্তায় অগ্রসর হয়েছেন পরাবাস্তবতার গভীর গহনে। "চাঁদের অমাবস্যা" উপন্যাসের শুরুতে এই পরাবাস্তব জীবন চিত্রায়নের যে প্রবণতা দেখা যায়, যা নানা কারণে ঐ উপন্যাসে রূপায়িত হতে পারেনি, তার বিস্তৃত প্রয়োগ ছোটগল্প সমূহে লক্ষ্য করা যায় রচনাকালের পূর্ব ও পর নির্বিশেষে। 'চাঁদের অমাবস্যার' শুরু এইভাবে

> শীতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাত, তখনো কুয়াশা নামে নাই, বাঁশঝাড়ে তাই অন্ধকারটা তেমন জমজমাট নয়, সেখানে আলো অন্ধকারের মধ্যে যুবক শিক্ষক একটি যুবতী নারীর অর্ধ-উলঙ্গ মৃতদেহ দেখতে পায়। অবশ্য কথাটা বুঝতে তার একটু দেরি লেগেছে, কারণ তা ঝট্ করে বোঝা সহজ নয়। পায়ের ওপর এক ঝলক চাঁদের আলো। শুয়েও শুয়ে নাই। তারপর কোথায় তীব্রভাবে বাঁশি বাজতে শুরু করে...অবশ্য বাঁশির আওয়াজ সে শুনে নাই।

ছোটগল্পের অনেক স্থানে যে আবহ নির্মিত হয়েছে তাতে পরাবাস্তবের একটি মাত্রা আপনা থেকে অর্পিত হয়েছে, এর কারণ হয়তো ওয়ালীউল্লাহর দূরাচারী দৃষ্টি। তাঁর প্রবৃত্তি বর্ণনার perspective সুবিস্তৃত রং ও বর্ণগন্ধ প্রায়শই অবিন্যস্ত অথচ সমন্বিত, মৃত্যু-যাত্রা গল্পটি-দুর্ভিক্ষের বাস্তবতার বর্ণনার পর হঠাৎ এভাবে শেষ হয়: "তারপর সন্ধ্যা হলেও, হাওয়া থামলো, ক্রমে ক্রমে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে উঠলো, এবং প্রান্তরের ধারে বৃহৎবৃক্ষের তলে তার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বুড়োর মৃতদেহ বসে রইলো অনন্ত তমিস্রার, দার্শনিকের মতো, সামান্য একটি ঘটনাও এই পরাবাস্তবতার স্বপ্নের কোনো গোপন উৎসবের মতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়, 'দ্বীপ' গল্পের সর্বত্র এর প্রকাশ, পশ্চিম দিগন্ত ছুঁয়ে লাল সূর্য, পূর্ব দিগন্ত ছুঁয়ে অতি অস্পষ্ট আলো, এরা উঠে পড়লো...সূর্য তাদের

কাছে পাঠিয়ে দিলো বহ্নিহীন সংযত আগুনের রক্তিমতা। সূর্য তখন আধখানা ডুবলো; তখন ওরাও উবু হয়ে মুখ ডুবালো সাগরের জলে। সাগরের জল এগিয়ে এসে তাদের মুখ তাদের চুল ছুঁয়ে পিছিয়ে গিয়ে আবার পরক্ষণেই এগিয়ে আসছে সাগরের ভাষাহীন অতল স্পর্শ নিয়ে" ইত্যাদি। ওয়ালীউল্লাহ প্রধানত বর্ণনার মাধ্যমেই তিনি এই পরাবাস্তবকে স্পর্শ করেছিলেন: তিনি ছিলেন অতি সচেতন এক ভাষা শিল্পী। আধুনিক ইউরোপীয় উপন্যাসের মত ভাষার মধ্য দিয়ে মনস্তত্ত্বের জটিল প্রকাশকেও তিনি বাঙময় করেছিলেন। এজন্য প্রাত্যহিকতার প্রতিটি অনুষঙ্গ তার ভাষায় অসামান্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নরনারীর জীবন জটিলতা, দ্বন্দ্ব, প্রেম, কাম আপাতদৃষ্টিতে যাদের অভ্যন্তরে অদেখা কোনো স্তর থাকার কথা নয়, যেহেতু সমাজের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার রাস্তা ধরেই তাদের আগমন, ওয়ালীউল্লাহ ভাষার গুণে বিশিষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর ভাষার কাঠামো এবং মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণকে পাশাপাশি রেখে পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে তিনিও তাঁর সমকালীন পশ্চিমা জীবন শিল্পীদের মত বিশ্বাস করতেন অবচেতনের সকল উন্মোচনই তার সচেতন ভাষা কাঠামোর মধ্যে নিহিত এবং ভাষাকে একাধিক মাত্রা বা স্তর দিতে পারলে অবচেতনের প্রকৃত রূপটি বেরিয়ে আসতে পারে। ওয়ালীউল্লাহর পাত্রপাত্রীরা শুধু ঘটনার আবর্তনেই প্রকাশিত হয়না তাদের ভাষাগত একটি প্রকাশও আছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও অন্যান্য ছোটগল্পকারের তুলনামূলক আলোচনা যা হয়েছে, তাতে রবীন্দ্রনাথের সাথে তার সম্পর্কটি নির্ণয়ের কোনো প্রচেষ্টা হয় নি। ওয়ালীউল্লাহ রবীন্দ্রনাথ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এটি ধরে নেয়ার যথেষ্ট কারণ আছে, যদিও এই প্রভাব তাঁর স্বকীয়তা বিকাশে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নি, বরং সহায়তা করেছে, তাছাড়া এই প্রভাবের ক্ষেত্রও বিস্তৃত নয়, কিন্তু চরিত্র সৃষ্টি ও বর্ণনায় উভয় ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সময়ে তাঁর একটি মিল চোখ এড়িয়ে যায়না। মাত্র দু'টি উদাহরণ 'ছায়া' গল্পটির নিসর্গ বর্ণনায়

> "ওপরের আকাশে ধূসরতা বিরাট নিঃসঙ্গতার নিবিড়তা, তাল তলার মেয়েটির চোখের জল ক্রমে ফুরিয়ে এলো, বেদনার ঢেউ শান্ত হয়ে এলো, আঁচলে চোখ মুছে সে নীরবে উঠে দাঁড়ালো: তখন দেখলে অদূরের একটি ছোট গাছে ফুল ধরেছে অজস্র, বিচিত্র সেগুলোর রঙ দেখে তার অধরের প্রান্তে হঠাৎ অতি মৃদু অতি উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠলো,

> নয়নে এলো চাঞ্চল্য, দ্রুতভঙ্গিতে মাথায় অবগুণ্ঠন টেনে দিয়ে পায়ে নূপুরের ঝঙ্কার তুলে লঘুপায়ে সে এগিয়ে গেলো সম্মুখ পানে, পেছনে আর তাকালে না।

অথবা 'স্বপ্নের অধ্যায়' গল্পে চরিত্র বর্ণনায়

> মুখে কথা থাকলেও মালেকার অন্তরে তখন খরস্রোতের মতো কথা বইছে। ঘরে তাদের বেশি কথা কওয়ার রেওয়াজ নেই, তাই অন্তরে হয়তো অনেক কথা জমে আছে বছরেব পর বছর স্তূপাকাব হয়ে, যার সামান্য আজ অকস্মাৎ বেরিয়ে এলো।

এমন আরো অসংখ্য উদাহবণ দেয়া যায়, যেখানে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি আভাসমাত্র দিয়ে হয়তো মিলিয়ে যায়; কিন্তু তাকে অবহেলা করা যায়না। ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্পে 'ছিন্নপত্রের' সহজ সরল অথচ জীবনাভিজ্ঞতায় পরিকীর্ণ ভাষার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং সেই সাথে রবীন্দ্রনাথের পদ্মা যমুনা আত্রাই নদীপথের অনবদ্য বর্ণনার কিছুটা ছায়া।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সাথে আরেকটি সাদৃশ্য আছে ওয়ালীউল্লাহর ছোটগল্পের। অনেক ক্ষেত্রেই ওয়ালীউল্লাহর গল্পের পরিণতি অভাবিত অথচ অবধারিত, এবং গল্প-শেষের "শেষ হয়ে হইলনা শেষ" অনুভূতিটি সুচিহ্নিত। ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর অনেক গল্পে গল্পকারের নিপুণ দক্ষতা নিয়ে কাহিনী নির্মাণ করেছেন, চরিত্রসমূহকে বিশ্বাসযোগ্য করেছেন। কিন্তু তার সকল গল্প পরম্পর পাঠ করলে বোঝা যাবে তিনি গল্পের পরিণতির জন্য একটি হঠাৎ মোড়কে আশ্রয় করেছেন বেশী, 'মতিনউদ্দিনের প্রেম' গল্পের সেই ফেরেশতা মশার মত একটি বাহ্যিক সহায়ক শক্তি, যাকে পশ্চিমা সাহিত্যে decux ex machina বলা হয়, তাঁর গল্পের সকল পরিণতির জন্য প্রায়শঃই দায়ী। ঐ গল্পের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি বাদ দিলেও, শুধু ঘটনা হিসেবেও এই Intervention বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়না কখনো, কারণ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পে প্রথম থেকেই প্রবলগতি সঞ্চারিত, যা গল্পের কাঠামোকে পাঠকের অভিজ্ঞতায় স্থাপন করে এবং একে গ্রহণযোগ্য করে তোলে অতি ক্ষিপ্রতার সাথে। ঐ ফেবেশতা-মাছিটি যে মতিনউদ্দিনের জটিল মনস্তত্ত্বের একটি স্তর-অতিক্রমের রূপক, তা সাধারণ পাঠকের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু না হলেও গল্পটিতে এই সংযোজন অর্থবহ। ওয়ালীউল্লাহর ছোটগল্পের সাফল্য

হল এই যে একটি ভাবনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও ঘটনাটি বা ঘটনাসমূহ কখনো অপ্রধান নয়, মনস্তাত্ত্বিক অনেক সূক্ষ্ম পাঠ সন্নিবেশিত হলেও সাধারণ পাঠকের রসগ্রহণে তাতে কখনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়না, এবং চরিত্রসমূহ একাধিক মাত্রায় উন্মোচিত হলেও তাদের প্রতি পাঠকের আকর্ষণ সব সময় বজায় থাকে। অর্থাৎ তিনি একই সাথে বিভিন্ন স্তরে বিচরণ করতে সক্ষম, যা ছোটগল্পকারের জন্য একটি ঈর্ষণীয় গুণ।

বাঙালী সমাজ ও বাঙালী মানসের সফল রূপকার হিসেবে সুপরিচিত হলেও ওয়ালীউল্লাহর সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের সামগ্রিক রূপটি এতদিন গরিষ্ঠ সংখ্যক পাঠকের অগোচরেই ছিল। তাঁর উপন্যাসের রূপ বা form সম্পর্কে কৌতুহল ছিল সমালোচক-পাঠকের, এবং তিনি যে তাঁর সময়ের চেয়ে অনেক বেশী প্রাগ্রসর ছিলেন, উপন্যাসের রূপ নির্মাণে সমকালীন সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, এ তথ্য হয়তো অনেকেই জানতেন। কিন্তু একজন ছোটগল্পকার হিসেবে তিনি যে সমপরিমাণ সকল ও কৃতবিদ ছিলেন যে সম্পর্কে তেমন ধারণা ছিলনা অনেকের। তাঁর 'নয়নচারা' 'দুইতীর' ইত্যাদি গল্প বিভিন্ন-ভাবে পাঠকের কাছে পৌঁছেছে কিন্তু অগ্রন্থিত অনেক গল্প ছিল লুপ্তপ্রায়। অথচ, আগেই বলা হয়েছে এসব গল্পের প্রতিটি সম্পর্কে ঘনিষ্ট পরিচয় থাকা প্রয়োজন সৈয়দ ওয়ালীল্লহকে জানতে হলে। তাঁর রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডটি আমাদের সেই প্রয়োজন মিটিয়েছে। নাটকেও ওয়ালীউল্লাহ যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এবং বিশেষ তাৎপর্যময় এবং নতুনত্বের দাবীদার ছিল তাঁর মঞ্চ ব্যবহার তা আমরা 'বহিপীর' নাটকে দেখেছি, কিন্তু নাটকেও যে পরাবাস্তবের সঞ্চার করা সম্ভব তা 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে, যা 'একটি বিচারকের কাহিনী' নামে 'সংলাপে' প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে আদালতের দৃশ্যটি বাস্তবতা ও fantasy-র অপূর্ব সংমিশ্রণ ফ্রানৎজ কাফকার বিখ্যাত উপন্যাস 'দি ট্রায়াল' এর আঁদ্রে জিদ কৃত নাট্যরূপটি স্মরণ করিয়ে দেয়। যে বিষয়টি বিচারা-ধীন তা বাস্তবের একটি অতি জটিল অচল আপাত সরল অনুষঙ্গ: কিন্তু ওয়ালীউল্লাহর হাতে তা একটি চিরায়ত প্রকাশ লাভ করেছে—সমস্ত সমাজ সেখানে কাঠগড়ায় উপনীত, জজ, উকিল, বাদী বিবাদী প্রত্যেকেই এক জটিল বিচার-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে যে চারটি নাটক সন্নিবেশিত, তা আমাদের একটি উপকার সাধন করে নাট্যকার হিসেবে তাঁর অবস্থানকে আমরা সনাক্ত করতে পারি এবং তাঁর উত্তরণকে

উপলব্ধি করতে পারি। দেখা যাবে 'বহিপীর' থেকে 'উজানে মৃত্যু' পর্যন্ত ক্রমশই তিনি যেন ক্রীড়ার নাটক বা drama of action থেকে ভাবনার নাটকে বা drama of ideas-এ বলে যাচ্ছেন, বাস্তবকে রূপক প্রতীকে বিন্যস্ত করে ক্রমশই তিনি তাকে অতিক্রম করতে উদ্যত হচ্ছেন, ক্রমশই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে তার প্রকাশভঙ্গী, মঞ্চ ব্যবহারে পারদর্শী ও সাহসী হয়ে উঠছেন তিনি।

অন্যত্র দেখি, বিশেষ করে 'বিবিধ' সংকটকে সংগৃহীত চিত্র-সমালোচনায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর রক্ষণশীলতার ছাপ। ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত এই আলোচনায় তিনি একাডেমী অফ ফাইন আর্টস প্রদর্শনীর কিছু ছবি সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। শিল্পী হেমেন মজুমদারের নারীচিত্র সম্পর্কে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ভয়ানক আপত্তি তাঁর সাকি, বাংলার সুন্দরী, সূর্যমুখী (সূর্যমুখীর চেয়ে নারীদেহ নামই বেশী সার্থক হতো) এমনি আরো অনেক ছবি চোখে ও মনে সত্যিই অসহ্য ঠেকে। এসব ছবি প্রদর্শনীতে না-পাঠিয়ে নারীদেহ লোভাতুর মারবার দেশীয় লোক অথবা স্থূলবুদ্ধি জমিদারের গৃহে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেই উত্তম হবে .." ইত্যাদি। তবে দীর্ঘকাল প্যারিসবাসী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পরবর্তীতে চিত্রশিল্প সম্পর্কে, বিশেষ করে নারী যেখানে উপজীব্য, কি মত পোষণ করতেন সে সম্বন্ধে জানার কোন উপায় নেই।

সৈয়দ আকরম হোসেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী সম্পাদনায় যে শ্রম নিয়োগ করেছেন এবং কুশলতা দেখিয়েছেন তা আমাদের দেশের প্রথা-গত গবেষণায় খুব একটা চোখে পড়ে না। তিনি যে পদ্ধতি বা methodology ব্যবহার করেছেন, তার প্রয়োগও আমাদের দেশে বিরল। ওয়ালীউল্লাহর মতো একজন প্রতিষ্ঠিত লেখকের রচনা সংগ্রহ আপাতঃদৃষ্টিতে দুরূহ নাও মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত লেখাগুলোর সন্ধানে গেলে বোঝা যাবে এ কতবড় দুঃসাধ্য কাজ। প্রথম খণ্ডের মতো দ্বিতীয় খণ্ডেও সম্পাদক যা করেছেন, তা হলো (ক) রচনাসমূহকে সংগ্রহ করা, (খ) বিভিন্ন সময়ে একই গল্প একাধিক স্থানে প্রকাশিত হলে তার পাঠান্তর উদ্ধার, (গ) লেখক-ব্যবহৃত শব্দের বানানকে একটি সুষম রূপে নিয়ে আসা —সম্পাদকের ভাষায় "ওয়ালীউল্লাহর বানান রীতির মৌলপ্রবণতা অনুধাবন করে সর্বত্র অভিধানসম্মত সর্বশেষ বানান-রীতির সমতা... রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছি।"

(পৃঃ ৫৫৯) এর ফলে 'নাবা' ও 'নামার' মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘুচেছে ক্রিয়াপদে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ব্যবহৃত 'চ' এবং 'ছ' উভয়ই রক্ষিত হয়েছে, এমনকি নামের ক্ষেত্রেও সাযুজ্য নির্ণীত হয়েছে, (ঘ) প্রতিটি গল্পগ্রন্থ নাটক ইত্যাদির প্রথম ও পরবর্তী সংস্করণের বিস্তারিত পরিচয়-সূত্র সন্নিবেশিত করা — যা উচ্চতর গবেষকদের জন্য একটি বিশেষ প্রাপ্তি রূপে বিবেচিত হবে। এছাড়া দ্বিতীয় খণ্ডে, সাময়িক পত্রে প্রকাশিত ওয়ালীউল্লাহর রচনাসমূহ প্রকাশের সন তারিখ সহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, এবং একটি গ্রন্থপঞ্জিও সন্নিবেশিত হয়েছে, ওয়ালীউল্লাহর জীবনী-চুম্বকটিও এই গ্রন্থের একটি বৈশিষ্ট্য।

প্রথম খণ্ডে ডঃ আকরম হোসেন যেভাবে তিনটি উপন্যাসের বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যকার পাঠবিকৃতি অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে তুলে ধরেছিলেন, এ খণ্ডেও অনেক গল্পের পাঠান্তর উপস্থাপিত করেছেন, এবং আমরা তাঁর ইংরেজী cargo গল্পের দু'টি বাংলা অনুবাদ পাই, 'তার প্রেম' গল্পটিই যে 'মতিন-উদ্দিনের প্রেম' নামে প্রকাশিত যে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। আগেই বলা হয়েছে এই উচ্চমানের পদ্ধতিগত কাজ বাংলাদেশে হয় নি বললেই চলে, একজন সম্পাদকের পক্ষে যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি, পরিশ্রমী অধ্যবসায় তুল্যমূল্য বিচারের ক্ষমতা এবং সর্বোপরি তাঁর বিষয়বস্তুর প্রতি অপার মমতা থাকা প্রয়োজন ডঃ সৈয়দ আকরম হোসেনের মধ্যে তার সবগুলিই বর্তমান, গ্রন্থটির সর্বত্র তার সযত্ন প্রয়াসের ছাপ পরিলক্ষিত। ছাপার ভুল, যার হাত থেকে এদেশের শ্রেষ্ঠ প্রকাশনাটিও মুক্ত নয় তুলনামূলকভাবে বিরল। শুধু একটি ক্ষেত্রে একটি সুষম প্রয়াসের প্রয়োজন ছিল এবং তা প্রথম খণ্ড সম্পর্কে বিশেষ করে প্রযোজ্য যদিও তার অভাবে সংকলনের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নি ; তথ্যনির্দেশ বা foot note-এর কোনো সুনির্দিষ্ট রীতি আমাদের সমালোচনা সাহিত্যে না থাকায় এ-গ্রন্থেও তা বিভিন্নভাবে সন্নিবেশিত, ফুটনোট লিপিবদ্ধ করার একটি সুষম রীতি উদ্ভাবন এক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় মনে হয়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে পূর্ণাঙ্গরূপে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করার জন্য ডঃ সৈয়দ আকরম হোসেন এবং বাংলা একাডেমী আমাদের সকলের কাছে ধন্যবাদার্হ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এ আমাদের একটি অত্যন্ত মূল্যবান উপহার।

১১.২, ১৯৮৭ তারিখে আলোচনা অনুষ্ঠানে পঠিত।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: প্রথম খণ্ড

প্রধান সম্পাদক আনিসুজ্জামান/সম্পাদনা পরিষদ: আহমদ শরীফ, কাজী দীন মুহম্মদ, মমতাজুর রহমান তরফদার, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

ইতিহাসের অসংখ্য সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু তবুও মনে হয় একজন ঐতিহাসিক যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলতে পারবেন না সুস্পষ্টভাবে ইতিহাস বলতে কি বোঝায়। অবশ্য আমি পেশাজীবী কোন ঐতিহাসিকের প্রতি কটাক্ষ করছি না। আসলে ইতিহাস মানবজীবন ও মানবপ্রকৃতি সংক্রান্ত একটি চর্চা বা গবেষণা ক্ষেত্র; এবং সে কারণেই ইতিহাস জটিল ও পরিবর্তনশীল। ইতিহাসের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা যত দুরূহ ব্যাপারই হোক না কেন এ কথাটি বর্তমানে বোধ হয় নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আর যাই হোক, সংঘটিত ঘটনার নিরেট আনুপূর্বিক বর্ণনা ইতিহাস নয়। এর কারণ হলো, মানবজীবন ও চারপাশের যে জগৎ এবং এ দুয়ের মধ্যে নিরন্তর দেয়া-নেয়ার পথ বেয়ে যে সমাজ বিবর্তন তা অত্যন্ত জটিল ও কার্যকারণ সম্পৃক্ত ব্যাখ্যার দাবিদার।

"বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে"র ওপর আলোচনা করতে গিয়ে এ কথাগুলো বলার কারণ একটিই; এবং তা হলো আলোচনার একটি প্রেক্ষাপট তৈরী করে নেয়া। আমাদের দেশের খ্যাতকীর্তি ইতিহাসবিদ ও সাহিত্য গবেষক সমন্বয়ে বইটি রচিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে খ্রীষ্টীয় চৌদ্দ শতক পর্যন্ত সময়ে বাংলার ইতিহাস ও বাংলা ভাষা/সাহিত্যের ইতিহাস নয়টি প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। কাজেই বইটি সাম্প্রতিককালে প্রচলিত বহুশাস্ত্রীয় (Multidisciplinary) গবেষণা পদ্ধতির একটি সার্থক ফসল। সাহিত্য অনুরাগীরা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করবেন; এবং একই সঙ্গে ইতিহাস পাঠক বাংলার ইতিহাস পড়বেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের ধারার পাশাপাশি। সুতরাং বইটি একাধারে প্রাচীন বাংলার সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাস ও বাংলা সাহিত্যের আদি পর্বের ইতিহাস। এমনি উদ্যোগ যে অভিনব তা বলছি না; তবে ব্যাপ্তিতে, কলেবরে ও গভীরতায় বর্তমান উদ্যোগটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

শুরুতে ইতিহাসের প্রকৃতি নিয়ে যে কথাগুলো বলেছিলাম, তার প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট সুস্পষ্ট হবে নীচের আলোচনার মূল অংশগুলোতে।

যে ভূ-খণ্ডের ইতিহাস ভাষা ও সাহিত্য বইটির বিষয়বস্তু তার ভৌগোলিক রূপরেখাটি প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরী। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত ব্যবহার করেছেন কুশলী গবেষকের দক্ষতা নিয়ে; এবং মূল্যায়ন করেছেন বিভিন্ন গবেষকের মতামতকে। আলোচনার শুরুতে ইতিহাস ও ভূগোল-এর পারস্পরিকতা নিয়ে তিনি তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরী করার চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে কান্ট-এর বক্তব্যকে টেনে এনেছেন নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর সপক্ষে। আমার মনে হয় প্রবন্ধের এমনি আকর্ষণীয় অংশটি আরো শক্তিশালী হতো যদি প্রবন্ধকার ফার্ণান্ড ব্রোদেলকে কিছুটা অনুসরণ করতেন। ইতিহাস ও ভূগোলের সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্রোদেল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ওপর যে গবেষণা করেছেন তা সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্যে প্রশংসিত হয়েছে এবং আলোচিত হচ্ছে। প্রশ্ন উঠতে পারে ব্রোদেলের গবেষণায় বিষয়টির ওপর নতুন কোন্ বক্তব্য কি বেরিয়ে এসেছে? উত্তরটি ব্রোদেল-এর ভাষাতেই দেয়া যাক, "...The history of man in relation to his surroundings It is a history which unfolds slowly and is slow to alter, after repeating itself and working itself out in cycles which are endlessly renewed. I did not wish to overlook this fact of history, which exists almost out of time and tells the story of man's contact with the inanimate, nor when dealing with it did I wish to make do with one of those traditional geographical introductions to history, which one finds placed to such little effect at the beginning of so many volumes..."

অধ্যাপিকা শাহানারা হোসেন বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক এবং বাইরের বিশ্বের সঙ্গে বাংলার সম্পর্কের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। সম্ভবত এতগুলো বিষয় স্বল্প পরিসরে আলোচনার কারণেই প্রবন্ধটি বর্ণনামূলক এবং কেন্দ্রীয় বক্তব্যহীন হয়েছে। এমনি ইতিহাসকে ফ্রাঁসোয়া সিমিয়াঁ বলেছিলেন The history of events; a surface disturbance, the waves stirred by the powerful movement of tides. যথার্থ ইতিহাসের উপজীব্য waves নয় বরং powerful tides. উপরন্তু ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতির নিরিখেও বর্তমানে এমনি ইতিহাসচর্চা অচল।

সম্পাদনা পরিষদ এই দক্ষ গবেষককে দিয়ে আরো উন্নতমানের প্রবন্ধ লিখিয়ে নিতে পারতেন যদি বিষয় নির্বাচনে সতর্ক হতেন। অবশ্য পদ্ধতিগত প্রশ্নটি বাদ দিলে বলতে হবে প্রবন্ধটি সাবলীল ও ঋজু ভঙ্গীতে উপস্থাপিত ; এবং তা পাঠককে কাছে টানবে।

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের ওপর তথ্যবহুল ও দীর্ঘ বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন অজয় রায়। বিভিন্ন তথ্য ও মতকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ও প্রয়োজনীয় পরিমিতিবোধ নিয়ে বিচার করে তিনি উপসংহারে পৌঁছেছেন।

মধ্যযুগে বাংলার ওপর অত্যন্ত দক্ষ গবেষক হিসেবে পরিচিত অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার লিখেছেন দু'টো প্রবন্ধ—শিল্পকলা ও ধর্মজীবন। প্রথম প্রবন্ধে যা লক্ষণীয় তা হলো, অধ্যাপক তরফদার শিল্পীর সামাজিক অবস্থান ও সমাজচেতনার প্রেক্ষাপটে শিল্পচর্চাকে বিশ্লেষণ করেছেন। এ কথা তো অনস্বীকার্য যে, আপন শ্রেণী চেতনার পরিমণ্ডলেই শিল্পীর সৃজনী প্রয়াসের বহিঃপ্রকাশ হয়। সেইটেই এই অভিজ্ঞ গবেষক দক্ষতার সঙ্গে বলেছেন।

বাংলার ধর্মজীবন আলোচনাতেও প্রেক্ষাপটে আছে সমাজজীবন ও সামাজিক পরিবেশ। প্রবন্ধটির শুরুতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে কথা বলা হয়েছে ; এবং শেষে আছে বৈদিক ও হিন্দু ধর্মের কথা। কিন্তু ইতিহাসের কালানুক্রমিকতার বিচারে হিন্দু ধর্মই প্রথমে থাকার কথা।

মনীন্দ্র নাথ-এর তথ্যবহুল প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে এমন প্রায় সত্তর জন বাঙালী পণ্ডিতের জীবন ও কর্ম যাঁরা বাংলা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় রচনা করেছেন।

অধ্যাপক কাজী দীন মুহম্মদ বাংলা ভাষা ও লিপির ইতিহাস আলোচনা করে চূড়ান্ত বক্তব্য রেখেছেন যে, অবহট্ঠ থেকে বাংলা ভাষা এসেছে ; সংস্কৃত থেকে নয়। বক্তব্যের সপক্ষে তথ্য ও যুক্তি প্রচুর আছে ; এবং যার সঙ্গে দ্বিমত করা যায় না। তবুও কিছু কথা থেকে যায়। কেউ কোনো সময়ে বলেন নি বাংলা ভাষা সরাসরি সংস্কৃত থেকে এসেছে। বরং যা বলা হয়েছে তা হলো, তৎসম, তদ্ভব, অবহট্ঠ ইত্যাদি বিবর্তনের মাধ্যমে সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষার সৃষ্টি। তাহলে কি যুক্তিবিদ্যার সাধারণ নিয়মেই এ কথা বলা যায় না যে, সংস্কৃত ভাষার মূল থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ?

প্রবীণ গবেষক অধ্যাপক আহমদ শরীফ বাংলা সাহিত্যের সূচনাপর্বে রচিত চর্যাপদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনায় এসেছে বিভিন্ন চর্যাকারদের আবির্ভাবকাল, তাদের পরিচিতি, চর্যার ভাষা, সাহিত্যমূল্য ও সমাজচিত্র।

শেষ প্রবন্ধটি লিখেছেন প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। তাঁর বক্তব্যবিষয় হলো বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য নিদর্শন। স্বল্প পরিসরে হলেও প্রবন্ধটিতে রয়েছে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর গভীরতা।

সম্পাদিত এই সংকলনে ভাষা ও বানান রীতি সম্পর্কে কিছুটা সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। যেমন চলতি ভাষায় "সপ্তদশ শতাব্দী" লেখা অনুচিত। এখানে অনায়াসে 'সতের শতক' হতে পারে। আলোচ্য বইয়ের একই প্রবন্ধের একস্থানে আছে "ষোড়শ শতাব্দী" এবং আর একস্থানে আছে "আঠার শতক"। উপরন্তু কোন কোন প্রবন্ধে বানানের আধুনিক রীতি অনুসরণ করা হয় নি। যেহেতু একুশের প্রেক্ষাপটে বাংলা একাডেমী থেকে বইটি প্রকাশিত হচ্ছে সেহেতু বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ করছি।

একটি সম্পাদকীয় ভূমিকা বইটির মান বাড়াতে অনেকটা সাহায্য করতো; কারণ এটি একটি সম্পাদিত সংকলন। অন্তত, পাঠক জানতো এমনি বই প্রকাশের পটভূমি, উদ্দেশ্য ইত্যাদি। যেমন বইটি পড়তে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই আমার কাছে মনে হয়েছে নীহার রঞ্জন রায় বা রমেশচন্দ্র মজুমদারকে অতিক্রম করে নতুন কি তথ্য/বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে? এমনি ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় বক্তব্য অনেক প্রশ্নের সমাধান দিতে পারতো।

অবশ্য এমনি কিছু প্রাসঙ্গিক দ্বিমতকে উপেক্ষা করে বইটি সম্পর্কে যে চূড়ান্ত বক্তব্যটি যুক্তিযুক্ত তা হলো, একটি তথ্যবহুল ও বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশের জন্যে সম্পাদনা পরিষদ, প্রবন্ধকার ও বাংলা একাডেমী কৃতিত্বের দাবিদার। সাধারণ পাঠক ও গবেষক উভয়েই বইটি থেকে উপকৃত হবেন।

১৪-২-৮৭ তারিখে আলোচনা অনুষ্ঠানে পঠিত।

জীবনী গ্রন্থমালা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রথম দু'টি মৌলিক রচনাই জীবনীগ্রন্থ: রামরাম বসু রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) এবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচিত 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫)।

তবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'ই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যসাধকদের জীবন ও সাধনা সংক্রান্ত তথ্য সংকলনের ক্ষেত্রে আদর্শ স্বরূপ। ৯৭ খণ্ডে ১৫৮ জন সাহিত্যসাধকের পরিচিতি ১৩৪৬ থেকে ১৩৬৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এর ১৪৭টিই রচনা করেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ১১টির মধ্যে ৭টি লেখেন যোগেশচন্দ্র বাগল, ২টি লেখেন সজনীকান্ত দাস, ১টি লেখেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস এবং ১টি লেখেন দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। এই রচনাগুলোর বৈশিষ্ট্য: একটি মোটামুটি সুনির্দিষ্ট ছকে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ।

ঢাকায়, পাকিস্তান আমলে, অনুরূপ প্রয়াসের সূত্রপাত ঘটে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে। ঐ কার্যক্রমে প্রকাশিত হয় চৌদ্দটি গ্রন্থ।

আনন্দের বিষয় এ বছর (১৩৯৩, ১৯৮৭) বাংলা একাডেমী প্রয়াত সাহিত্যসাধকদের জীবনী গ্রন্থ প্রকাশের ঐ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ পুনরায় গ্রহণ করেছে এবং এবারের একুশের 'নিবেদন' হিসেবে প্রকাশ করেছে তিরিশটি জীবনীগ্রন্থ। তিরিশ জন লেখক এই তিরিশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমার বিবেচনায় এই উদ্যোগ সামগ্রিকভাবে প্রশংসার যোগ্য এবং আমি তাই এই তিরিশ জন লেখককে এবং এই প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত সকলকে ও একাডেমী কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

তিরিশ জন স্বতন্ত্র লেখকের রচনা বলেই হয়ত গ্রন্থগুলোর মানের তারতম্য আছে। তবে গ্রন্থগুলোতে সাধারণভাবে তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়। এক: বেশ কয়েকজন লেখক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ গ্রহণ করে নিরাবেগ তথ্য সংকলনে অগ্রসর হয়েছেন। দুই: অনেকে আবার আলোচনার ভঙ্গিতে পূর্বাপর লিখে গেছেন। এবং তিন: কেউ কেউ এ দুয়ের সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন।

তবে যেহেতু একাডেমী কর্তৃপক্ষ দাবী করেছেন যে, "বাংলা সাহিত্যের গবেষক ও ইতিহাস রচয়িতাদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই" এই জীবনী গ্রন্থমালা'র পরিকল্পনা ('প্রসঙ্গ কথা' দ্রষ্টব্য) সেহেতু সব ক'টি গ্রন্থের জন্য একটা মোটামুটি নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ বাঞ্ছনীয় ছিল।

এই 'গ্রন্থমালা'র প্রথম গ্রন্থ 'গোবিন্দচন্দ্র দাস' (১৮৫৫-১৯১৮), লিখেছেন সৈয়দ আবুল মকসুদ। গ্রন্থকার তাঁর ৬৪ পৃষ্ঠার গ্রন্থের ৯-৫৩ পৃষ্ঠা কবি জীবন বর্ণনা করেছেন ছয়টি শিরোনামে: জীবন কথা (মুদ্রণ প্রমাদে হয়ে গেছে জীবত কথা), কর্মজীবন, নির্বাসিত কবি, সামাজিক অবিচারের শিকার, দারিদ্র্যে জর্জরিত ও অন্তিম দিনগুলি। সৈয়দ আবুল মকসুদের রচনা প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছন্দ। সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত না হলেও তাঁর রচনার মূল অবলম্বন হেমচন্দ্র চক্রবর্তীর গ্রন্থ 'স্বভাব কবি গোবিন্দ দাস'। ১৯২৩ সালে রংপুর থেকে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঐ একই গ্রন্থ অবলম্বনে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫৬ (১৯৪৯) সালে রচনা করেন, সাহিত্য সাধক চরিতমালার ৭৪তম খণ্ড; 'গোবিন্দচন্দ্র দাস'। গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ তথ্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তথ্যবিন্যাস নিম্নরূপ:

জন্ম শৈশব শিক্ষা; রাজসংসারের সংশ্রব বর্জন; অন্ন সংস্থানে প্রবাস যাত্রা; শোক ঝঞ্ঝা; 'বিভা' ও 'প্রেম ও ফুল' প্রকাশ; জন্মভূমি হইতে নির্বাসন; 'মগের মুল্লুক'; দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ; জন্মভূমির স্নেহক্রোড়ে; পল্লীবাস; জীবন সায়াহ্নে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব গ্রন্থে কবির দুর্ভাগ্যের জন্য 'বান্ধব' সম্পাদক এবং 'ভাওয়ালের সর্বপ্রধান রাজকর্মচারী কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। সৈয়দ আবুল মকসুদ সমগ্র প্রসঙ্গটি উপেক্ষা করেছেন। অথচ ঐ প্রসঙ্গ ব্যতীত কবির দুর্ভাগ্যের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দুরূহ। এমন কি কবির শেষ জীবনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'সাহিত্য সম্মেলনে' কেন কবিকে ডাকাই হয় নি তারও সূত্র সম্ভবতঃ ঐ তথ্যে নিহিত।

সৈয়দ আবুল মকসুদ তাঁর গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপধ্যায়ের গ্রন্থের উল্লেখই করেন নি। ৩৭ বৎসর পূর্ববর্তী রচনাই শুধু নয়, সাহিত্য-সাধক চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ হিসেবেও ঐ গ্রন্থের উল্লেখ সৈয়দ আবুল মকসুদের গ্রন্থে থাকা

স্বাভাবিক ছিল। উপরন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থের 'রচনাপঞ্জী' অনেক বেশি তথ্যসমৃদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য।

দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম 'মোহাম্মদ আকরম খাঁ' (১৮৬৮-১৯৬৮), লিখেছেন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর। ৪২ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের ৯-৪০ পৃষ্ঠায় অর্থাৎ ৩১টি পৃষ্ঠায় মোহাম্মদ আকরম খাঁর জন্ম ও বংশ পরিচয়, বাল্যকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা, সাংবাদিকতা পেশায় প্রবেশ, সাহিত্যকর্ম, বাংলা ভাষার উন্নয়নে এবং জীবনের শেষ দিনগুলো এই প্রসঙ্গসমূহ অতি সংক্ষেপে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর। শেষ দুই পৃষ্ঠায় আছে জীবনপঞ্জী।

আমাদের সমাজে সাংবাদিকতায় ও সাহিত্যে শতায়ু মোহাম্মদ আকরম খাঁর মত ব্যক্তিত্বের অবদানের গুরুত্ব অধিকতর অভিনিবেশ দাবী করে। বিশেষতঃ তাঁর রচনাপঞ্জী, রচনার নিদর্শন এবং তাঁর সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধাদির তালিকা এ ধরনের গ্রন্থের জন্য অপরিহার্য।

তৃতীয় গ্রন্থের নাম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩); লিখেছেন আহমদ শরীফ। নিঃসন্দেহে এ গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি সবচেয়ে যোগ্য। গ্রন্থটি তথ্যসমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গ এখানে আলোচিত হয়েছে। আলোচিত প্রসঙ্গসমূহের শিরোনাম : জন্মবংশ, শিক্ষা ; আবদুল করিমের স্বভাব ও জীবনাচার; আবদুল করিমের চোখে দেশ মানুষ সমাজ ও সাহিত্য; আবদুল করিমের সত্তার ও সাধনার স্বরূপ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের অবদানের মূল্যায়ন। গ্রন্থের শেষাংশে সংকলিত আবদুল করিমের গ্রন্থাবলীর তালিকা, সাহিত্যবিশারদ বিষয়ক গ্রন্থতালিকা এবং সমকালীনদের আলোচনায় সাহিত্যবিশারদ সম্পর্কিত অভিমত এ গ্রন্থের গুরুত্ব বাড়িয়েছে। তবে ৫৬-৫৮ পৃষ্ঠায় 'পুথি পরিচিতি' থেকে সংকলিত সাহিত্যবিশারদের প্রবন্ধ তালিকার ক্রমিক অপরিবর্তিত রয়ে গেছে; এটা অনায়াসে এড়ানো যেতে পারত। ১৩ পৃষ্ঠার বংশ পরিচয়ের কিছু তথ্য ৫৪ পৃষ্ঠায় পুনর্লিখিত হয়েছে।

চতুর্থ গ্রন্থ 'কেদারনাথ মজুমদার' (১৮৭০-১৯২৬), লিখেছেন যতীন সরকার। স্বল্প আলোচিত এই সাহিত্যসাধক সম্পর্কিত তথ্যসমূহ যতীন সরকার আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থে কেদারনাথ মজুমদারের ইতিহাস চর্চা, সাহিত্য চর্চা ও পত্রিকা সম্পাদনার প্রসঙ্গসমূহ বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে আলোচনার ভঙ্গিতে লেখার কারণে এ গ্রন্থের ব্যবহারযোগ্যতা সীমিত।

কোন কোন উদ্ধৃতির উৎস নির্দেশ নেই। তা ছাড়া কেদারনাথ মজুমদারের জীবনপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী, রচনাপঞ্জী, রচনা নিদর্শন ও কেদারনাথ বিষয়ক আলোচনার তালিকা থাকাও প্রয়োজনীয় ছিল।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদের 'রমেশ শীল' (১৮৭৭-১৯৬৭) সুলিখিত গ্রন্থ। লেখক এর আগে কবিয়াল রমেশ শীল বিষয়ে দু'টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এবং দীর্ঘদিন রমেশ শীল সম্পর্কে গবেষণারত আছেন। ফলে গ্রন্থে তথ্যাদি নির্ভরযোগ্য। তবে রচনা পরিচয় অংশে প্রকাশিত গ্রন্থ ও রচনসমূহের সুশৃঙ্খল তালিকা বাঞ্ছনীয় ছিল।

স্বরোচিষ সরকারের মুকুন্দদাস (১৮৭৮-১৯৩৪) অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত রচনা। মুকুন্দদাসের রচনা পরিচয় ও রচনানিদর্শন গ্রন্থটির ব্যবহার-যোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। জীবনী গ্রন্থমালায় এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার।

লায়লা জামানের 'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন' (১৮৮০-১৯৩২); তথ্য-সমৃদ্ধ সুশৃঙ্খল রচনা। বেগম রোকেয়া বহুল আলোচিত ব্যক্তিত্ব। সুতরাং লেখিকা পূর্বসূরী গবেষকদের উপর সঙ্গতভাবেই নির্ভর করেছেন এবং গ্রন্থে ঐসব রচনার যথাযথ উল্লেখ করেছেন বিশেষত: সাহিত্যকর্মের পরিচিতি প্রসঙ্গে (পৃঃ ২৬-২৭)। রোকেয়ার গ্রন্থ ও রচনার কালানুক্রমিক তালিকা স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায় শুরু করা উচিত ছিল এবং মুদ্রণকালে এই ত্রুটি এড়ানো যেতে পারত।

সৈয়দ আকরম হোসেনের এস. ওয়াজেদ আলী এই গ্রন্থমালার একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সৈয়দ আকরম হোসেন এস. ওয়াজেদ আলী রচনাবলী সংকলন ও সম্পাদনায় দীর্ঘদিন ধরে নিয়োজিত আছেন। বাংলা একাডেমী থেকে সাম্প্রতিককালে ঐ রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। ফলে এই জীবনী গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্যাদি নির্ভরযোগ্য। এ গ্রন্থ রচনায় সৈয়দ আকরম হোসেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ অনুসরণ করেছেন ফলে রচনাপঞ্জী ও রচনার নিদর্শন যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। তবে এ গ্রন্থে এস. ওয়াজেদ আলি বিষয়ক প্রবন্ধাদির তালিকা সংযোজন প্রয়োজন।

আবদুল মান্নান সৈয়দের 'শাহাদাৎ হোসেন' (১৮৯৩-১৯৫৩) গ্রন্থটিও ব্রজেন্দ্রনাথের আদর্শে রচিত। উল্লেখযোগ্য যে আবদুল মান্নান সৈয়দ ইতিপূর্বে

শাহাদাৎ হোসেন সম্পর্কে আলোচনা লিখেছেন এবং রচনাসংকলন সম্পাদনা করেছেন। ফলে এ গ্রন্থের জীবনপঞ্জী, রচনাপঞ্জী ও রচনা নিদর্শন অংশসমূহ সুশৃঙ্খল ও নির্ভরযোগ্য।

খোন্দকার সিরাজুল হকের 'কাজী আবদুল ওদুদ' (১৮৯৪-১৯৭০) গ্রন্থেরও বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিস্তৃত গ্রন্থ পরিচয়। এ গ্রন্থটি সুলিখিত ও সুবিন্যস্ত এবং এ ক্ষেত্রেও এর প্রধান কারণ: খোন্দকার সিরাজুল হক 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এবং 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা সূত্রে কাজী আবদুল ওদুদ সম্পর্কেও দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। বর্তমান গ্রন্থমালার এটি একটি নির্ভরযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

রশীদ আল ফারুকীর 'নূরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী' (১৮৯৪-১৯৭৫) বিশ্লেষণাত্মক রচনা এবং স্বভাবতই কোন কোন অভিমত প্রসঙ্গে দ্বিমতের অবকাশ আছে। তবে এ গ্রন্থে জীবনী গ্রন্থমালায় প্রার্থিত জীবনীপঞ্জী, রচনাপঞ্জী, রচনা পরিচিতি অনুপস্থিত।

মোহাম্মদ আবদুল মজিদের 'আকবরউদ্দীন' (১৮৯৫-১৯৭৮) তথ্যসমৃদ্ধ রচনা। এ গ্রন্থে জীবনপঞ্জী থাকলেও রচনা পরিচিতি ও রচনা নিদর্শন যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয় নি।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ রচিত 'গোলাম মোস্তাফা' (১৮৯৭-১৯৬৪) গ্রন্থের আলোচনা অংশ সুলিখিত। গ্রন্থে কবি গোলাম মোস্তফার রচনার তালিকা আছে (পৃঃ ৩৯-৪৬) কিন্তু গ্রন্থসমূহের পরিচিতি অথবা রচনার নিদর্শন নেই।

ভূঁইয়া ইকবালের 'আবুল কালাম শামসুদ্দীন' (১৮৯৭-১৯৭৮) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে রচিত সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত রচনা। গ্রন্থে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের জন্ম, বংশ পরিচয়, রাজনীতি, সাংবাদিকতা ও সাহিত্যসাধনা আলোচনার পর ভূঁইয়া ইকবাল যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে রচনাপঞ্জী ও জীবনপঞ্জী সংকলন করেছেন। তাছাড়া ইতোপূর্বে প্রকাশিত আবুল কালাম শামসুদ্দীন বিষয়ক প্রবন্ধাদি এবং স্মারকগ্রন্থ ও স্মরণিকার সূচী সংযোজন করে তিনি এ-গ্রন্থের ব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছেন।

নুরুল আমিনের আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। এ রচনারও বিশেষ বৈশিষ্ট্য-এর বিস্তৃত রচনা-পরিচিতি অংশ। তাঁর জীবনপঞ্জী এবং আবুল মনসুর আহমদ বিষয়কগ্রন্থ প্রবন্ধ ও রচনাদির তালিকা থাকা প্রয়োজনীয় ছিল।

গোলাম সাকলায়েন রচিত 'মোহম্মদ বরকতউল্লাহ' (১৮৯৮-১৯৭৪) আন্তরিকতাপূর্ণ রচনা। এই সঙ্গে জীবনপঞ্জী, রচনাপঞ্জী এবং বরকতউল্লাহ বিষয়ক প্রবন্ধাদির তালিকা প্রত্যাশিত ছিল।

তপন চক্রবর্তীর 'মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা' (১৯০০-১৯৭৭) তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। বাংলাদেশের এই পথিকৃৎ বিজ্ঞানীর জীবনী রচনা ও প্রকাশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সন্দেহ নেই। তবে সাহিত্যসাধকদের জীবনী গ্রন্থমালার অন্তর্গত না করে এ গ্রন্থ স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করাই সঙ্গত হত।

'মুহম্মদ এনামুল হক' (১৯০২-১৯৮২) শীর্ষক গ্রন্থটি লিখেছেন মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। এর আলোচনা অংশ সুলিখিত। এ গ্রন্থে জীবনপঞ্জী, রচনাপঞ্জী ও রচনা পরিচয় আছে তবে এ যাবৎ প্রকাশিত মুহাম্মদ এনামুল হক বিষয়ক গ্রন্থ স্মারক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির তালিকা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

সারোয়ার জাহানের 'আবুল ফজল' (১৯০৩-১৯৮৩) গ্রন্থে জীবনপঞ্জী ও রচনাপঞ্জীর সুশৃঙ্খল বিন্যাস প্রয়োজন। আবুল ফজল সম্পর্কে প্রথম গ্রন্থ লেখেন আনোয়ার পাশা, 'সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল' (১৯৬৬)' নামে। ঐ গ্রন্থই সারোয়ার জাহানের প্রথম অবলম্বন এবং ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত আবুল ফজলের রচনার তালিকার জন্য তিনি ঐ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য বলে উল্লেখও করেছেন (পৃঃ ৭২) এবং তথ্যনির্দেশে ঐ গ্রন্থের উল্লেখ বহুবার এসেছে। তবু, হয়ত অসাবধানতাবশত :, 'সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা' তালিকায় আনোয়ার পাশার গ্রন্থটির নাম নেই। আবুল ফজল সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ ও আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তার একটা তালিকাও এ গ্রন্থে থাকা দরকার।

আজহার ইসলামের 'মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ' (১৯০৭-১৯৭৮) তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। তবে মাত্র এক পৃষ্ঠা 'রচনা নিদর্শন' যে যথেষ্ট নয় তা বলা বাহুল্য। তাছাড়া জীবনপঞ্জী ও রচনা পরিচয় না থাকায় গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

নুরুর রহমান খানের 'সৈয়দ মুজতবা আলী' (১৯০৪-১৯৭৪) তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। এখানে নানা অভিমতের সংকলন আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মন্তব্যের উৎস নির্দেশ থাকার— যেমন ১৫ পৃষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী না হওয়া প্রসঙ্গ —প্রয়োজন ছিল। তথ্যনির্দেশে উল্লিখিত (পৃ: ৬২) বিভিন্ন পত্রের তারিখ ও উৎস নির্দেশ বাঞ্ছনীয়। অবশ্য তাঁর রচনা আন্তরিকতার স্পর্শযুক্ত। গ্রন্থে সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবনপঞ্জী, রচনাপরিচিতি এবং মুজতবা বিষয়ক প্রবন্ধ তালিকা থাকলে রচনাটি পূর্ণাঙ্গ হত।

আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'হবীবুল্লাহ বাহার' (১৯০৬-১৯৬৬) তথ্যসমৃদ্ধ সুলিখিত গ্রন্থ। এগ্রন্থের জীবনপঞ্জী সুসংকলিত। কিন্তু রচনাবলীর অধিকাংশই তারিখবিহীন; ফলে ঐ অংশের ব্যবহারযোগ্যতা সামান্য।

রফিকুল ইসলামের 'আবদুল কাদির' (১৯০৬-১৯৮৪) নিঃসন্দেহে আন্তরিক রচনা। আলোচনা অংশ সুলিখিত। তবে এ গ্রন্থেও রচনা পরিচিতি নেই এবং আলোচনায় ব্যবহৃত উদ্ধৃতির বাইরে কোন রচনার নিদর্শন নেই। আবদুল কাদির বিষয়ক প্রবন্ধের তালিকা থাকলে গ্রন্থটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হত।

বেগম আকতার কামালের 'মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা' (১৯০৬-১৯৭৭) গ্রন্থে আলোচনা অপেক্ষা তথ্য সংকলনে অধিক গুরুত্ব প্রদান প্রয়োজনীয় ছিল। জীবনপঞ্জী, রচনাপঞ্জী, রচনা নিদর্শন ও কাব্য বিষয়ক প্রবন্ধ তালিকা প্রণয়ন করলে গ্রন্থটি অধিকতর মূল্যবান হতে পারত। গ্রন্থভুক্ত ছবিগুলোর তারিখ ও দলগত ছবির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় থাকলে ভাল হত।

অজয় রায়ের 'সত্যেন সেন' (১৯০৭-১৯৮১) দ্রুত লেখার ছাপযুক্ত। এ গ্রন্থে জীবনপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী, গ্রন্থ পরিচয় এবং সত্যেন বিষয়ক প্রবন্ধাদির তালিকা থাকা প্রয়োজন। সত্যেন সেনের মত গুরুত্বপূর্ণ লেখকের মাত্র আড়াই পৃষ্ঠা রচনা নিদর্শন নিঃসন্দেহে অপ্রতুল।

আনোয়ারা বাহার চৌধুরী রচিত 'শামসুননাহার মাহমুদ' (১৯০৮-১৯৬৪) তথ্যসমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এটি মুখ্যত আলোচনামূলক রচনা। গ্রন্থ শেষে রচনাবলীর তালিকা আছে তবে সেই সঙ্গেই রচনা পরিচয় থাকা দরকার ছিল।

শান্তনু কায়সারের 'অদ্বৈত মল্লবর্মন' (১৯১৪-১৯৫১) মূলত 'তিতাস একটি নদীর নাম' কেন্দ্রিক আলোচনা। অদ্বৈত মল্লবর্মণ কলকাতার সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন তার উল্লেখ থাকলেও অদ্বৈতের কর্মজীবন বা অন্য কোন রচনার কোন পরিচয় এ গ্রন্থে নেই; এমনকি জীবনপঞ্জী ও রচনাপঞ্জীও নেই।

হায়াৎ মামুদের 'সোমেন চন্দ' (১৯২০-১৯৪২) বাংলাদেশে এ বিষয়ে দ্বিতীয় রচনা। সোমেন চন্দের বিস্তৃত জীবনী রচনার প্রথম কৃতিত্ব বিশ্বজিৎ

ঘোষের। অন্ততঃ এক বছর আগে প্রকাশিত হয় বিশ্বজিৎ ঘোষের 'সোমেন চন্দের জীবন ও প্রসঙ্গ কথা' (সাহিত্য পত্রিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৯২)। একটি পাদটীকায় 'ছাপার ভুল' নির্দেশ ব্যতীত হায়াৎ মামুদ বিশ্বজিৎ ঘোষের ঐ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখার কোন উল্লেখ করেন নি। হায়াৎ মামুদ ১৮-৪২ পৃষ্ঠা সমকালীন প্রেক্ষাপট সংকলন করেছেন কিন্তু গ্রন্থে সোমেন চন্দের রাজনৈতিক জীবনের বিস্তৃত বিশেষতঃ শ্রমিক সংগঠনে তার কর্মতৎপরতা যথেষ্ট গুরুত্ব পায় নি। সাহিত্য রাজনীতির পাশাপাশি সোমেন চন্দ যে ঢাকা বেতার থেকে বিজ্ঞান বিষয়ক কথিকা ও গ্রন্থ পরিচয় প্রচার করতেন এ তথ্যও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। এ গ্রন্থে সোমেন চন্দের জীবনপঞ্জী ও রচনা পরিচিতি থাকা দরকার। শেষ পৃষ্ঠায় যে পাঠপঞ্জী আছে তাতে কোন সন তারিখ না থাকায় এটা অর্থহীন হয়েছে।

কবীর চৌধুরীর 'মুনীর চৌধুরী' (১৯২৫-১৯৭১) তথ্যসমৃদ্ধ, সুশৃঙ্খল সুলিখিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে কবীর চৌধুরী যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তা অসামান্য। ইতিপূর্বে আনিসুজ্জামানের মুনীর চৌধুরী (১৯৭৫) এবং আনিসুজ্জামান সম্পাদিত মুনীর চৌধুরী রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও কবীর চৌধুরীর এই উৎকর্ষমণ্ডিত গ্রন্থ এই গ্রন্থমালায় এক উজ্জ্বল সংযোজন। এবং গ্রন্থ মধ্যেই মুনীর চৌধুরী বিষয়ক পূর্ববর্তী রচনার স্বীকৃতিও এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য।

সিদ্দিকা মাহমুদার 'মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী' (১৯২৬-১৯৭১) মূলতঃ বাংলা একাডেমী প্রকাশিত তিনখণ্ড মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচনাবলী ও তার ভূমিকায় সন্নিবেশিত তথ্যাদি অবলম্বনে রচিত। গ্রন্থশেষে তথ্যনির্দেশে উল্লেখ থাকলেও গ্রন্থমধ্যে এ-তথ্যের উপযুক্ত স্বীকৃতি নেই।

আমি আশা করি এই তিরিশটি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে এবং এই প্রকল্পাধীন প্রকাশিতব্য অন্যান্য গ্রন্থে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট তথ্য—যেমন জীবনপঞ্জী, রচনাপঞ্জী, রচনা পরিচয় এবং আলোচ্য লেখক সম্পর্কিত গ্রন্থ, স্মারকগ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা—সন্নিবেশিত হবে।

আমি বাংলা একাডেমীর এই প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের প্রত্যাশী।

১৫.২.৮৭ তারিখে মূল অনুষ্ঠানে পঠিত।

বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার

নীতিমালা

১৯৮৬ সালের বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখক-পরিচিতি

বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার
নীতিমালা

(৩০-৬-৮৬ ও ৬-৭-৮৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদের ১৯৮৬ সালের পঞ্চম সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত)

প্রথম অধ্যায়

ক. উদ্দেশ্য

বাংলা সাহিত্যে সমসাময়িক সাহিত্যসেবীদের উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ সনাক্ত করে তাঁদের সৃজনী প্রতিভা বিকাশে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করাই বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে।

খ. পুরস্কারের বিবরণ

১. এই পুরস্কার 'বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার' নামে অভিহিত হবে।

২. বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৩. এই পুরস্কারের মূল্যমান ২৫,০০০˙০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা হবে। পুরস্কৃত সাহিত্যিককে সম্মাননাপত্র এবং পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত অংকের অর্থ প্রদান করা হবে। সম্মাননাপত্রে বাংলা একাডেমীর পক্ষে মহাপরিচালকের স্বাক্ষর থাকবে।

৪. পুরস্কারের অর্থমূল্য প্রয়োজনবোধে, কার্যনির্বাহী পরিষদ পুনর্নির্ধারণ করতে পারবেন।

৫. কোন বছরেই দু'জনের অধিক সাহিত্যিককে এ পুরস্কার প্রদান করা হবে না।

৬. মরণোত্তর পুরস্কার: সাধারণত কাউকে মরণোত্তর পুরস্কার প্রদান করা হবে না। 'বিচারক সভা'য় বিবেচনাধীন থাকাকালে যদি কোনো সাহিত্যিকের মৃত্যু ঘটে, তা'হলে যোগ্য বিবেচিত হলে সেক্ষেত্রে মরণোত্তর পুরস্কার ঘোষিত হতে পারে।

৭. সাধারণত প্রতি বছর এ পুরস্কার দেয়া হবে। তবে কোনো বছর 'বিচারক-সভা' যদি কাউকেই পুরস্কৃত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা না করেন, তা'হলে সে বছর পুরস্কার প্রদান করা হবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা

১. ধর্ম, বর্ণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে-কোনো সাহিত্যিক এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পারবেন।

২. একমাত্র বাংলাদেশের নাগরিকগণই এই পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হবেন।

৩. এই পুরস্কার কেবল ব্যক্তিকে দেয়া হবে। কোনো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা দলকে এই পুরস্কার প্রদান করা যাবে না।

৪. পুরস্কারের জন্য মনোনীত সাহিত্যিকের প্রকাশিত গ্রন্থ থাকতে হবে।

৫. কোনো মনোনয়নকারী কর্তৃক কোনো সাহিত্যিকের নাম যথাবিধি মনোনীত না হলে, উক্ত সাহিত্যিক এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

৬. পুরস্কারের জন্য কোনো ব্যক্তিগত আবেদনপত্র গ্রাহ্য হবে না।

৭. কোনো ব্যক্তিকে সাধারণত একবারই পুরস্কার দেয়া যাবে।

৮. কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি বা সদস্য বা মনোনয়নকারী বা 'বিচারক সভা'র কোনো সদস্যকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা যাবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন

১. প্রতি বছর বাংলা একাডেমী পুরস্কারের জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ 'মনোনয়নকারী' হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

ক. বাংলা একাডেমীর সভাপতি।

খ. বাংলা একাডেমী কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রতি বছর মনোনীত ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তন্মধ্যে কমপক্ষে দু'জন হবেন মহিলা।

গ. এ ছাড়া : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিভাগ এবং বাংলা একাডেমী মনোনয়ন প্রদান করবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপাচার্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিভাগেব পক্ষে সচিব এবং বাংলা একাডেমীর সচিব নির্ধারিত ছকে মনোনয়ন পাঠাবেন।.

২. প্রত্যেক মনোনয়নকারী একটি 'মনোনয়ন ছক'-এ একজন সাহিত্যিকের নাম প্রস্তাব করতে পারবেন। মনোনয়নকারী যদি কাউকে মনোনয়ন দিতে না চান, তা'হলে তা না করার অধিকার তাঁর থাকবে। তিনি যাঁদের মনোনয়ন দেবেন, তাঁদের সম্পর্কে মনোনয়ন ছক অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান করতে হবে। কোনো মনোনীত ব্যক্তি সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্য প্রদত্ত না হলে, সে মনোনয়ন বিবেচিত না-ও হতে পারে।

৩. বাংলা একাডেমী কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রতি বছর ৩০ অক্টোবরের মধ্যে উপযুক্ত মনোনয়নকারীদের নাম চূড়ান্ত করবেন।

৪. প্রতি বছর নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বাংলা একাডেমীর সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে মনোনয়নকারীদের কাছে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সরবরাহ করা হবে:

ক. মনোনয়ন ছক;

খ. এ-যাবৎ বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত সাহিত্যিক-দের তালিকা;

এবং

গ. মনোনয়নকারীর প্রার্থিত তথ্যাদি।

৫. প্রতি বছর ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে 'মনোনয়ন ছক' পূরণ করে সীল-করা খামে 'বিচারক-সভা'র কাছে প্রেরণ করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিচারের প্রক্রিয়া

১. বাংলা একাডেমী কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রতি বছর ১৫ নভেম্বরের মধ্যে নিম্নোক্ত পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'বিচারক-সভা' গঠন করবেন:

ক. কার্যনির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য:

খ. তিনজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক; যাঁরা কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য বা মনোনয়নকারী নন; এবং

গ. একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

'বিচারক-সভা'র সদস্যবৃন্দ নিজেদের মধ্য থেকে 'বিচারক-সভা'র সভাপতি নির্বাচন করবেন।

২. 'বিচারক সভা'র সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশের নাগরিক হবেন।

৩. পুরস্কার প্রদানের সুপারিশের জন্য সুপারিশের পক্ষে তিনজনের সম্মতি প্রয়োজন হবে।

৪. 'বিচারক-সভা'র সকল ভোট গোপন ব্যালটে প্রদত্ত হবে।

৫. 'বিচারক-সভা'র সিদ্ধান্ত, সদস্যের মতামত ও সর্বপ্রকার আলোচনায় গোপনীয়তা অবশ্যই পালনীয়।

৬. 'বিচারক-সভা'র সদস্যবৃন্দ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক এক বছরের জন্য মনোনীত হবেন।

৭. 'বিচারক-সভা'র সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর কোনো সদস্য যদি হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন, কিংবা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে যদি কোনো সদস্যের পদ শূন্য হয়ে যায় তাহলে মহাপরিচালক শূন্য পদে অনতিবিলম্বে একজন সদস্য অভিযোজিত করে যথাসময়ে তা কার্য-নির্বাহী পরিষদকে অবহিত করবেন।

৮. প্রতি বছর ১ জানুয়ারির মধ্যে 'বিচারক-সভা' মনোনয়নকারীদের প্রদত্ত 'মনোনয়ন ছক'গুলি পরীক্ষা করে অনধিক দু'জন সাহিত্যিকের নাম পুরস্কার প্রদানের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের কাছে সুপারিশ করবেন। তবে 'বিচারক-সভা' সঙ্গত মনে করলে কোনো সাহিত্যিকের নাম পুরস্কার প্রদানের জন্য সুপারিশ না-ও করতে পারেন।

৯. 'বিচারক-সভা' কোনো সাহিত্যিকের নাম পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করার সময় ঐ সাহিত্যিকের মৌলিক অবদানের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করবেন।

১০. প্রতি বছর ১ ফেব্রুয়ারি তারিখের মধ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদ পুরস্কার-প্রাপ্তদের নাম চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের যে সভায় 'বিচারক-সভা'র উপর্যুক্ত সুপারিশ বিবেচিত হবে, সে সভায় 'বিচারক-সভা'র সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী পরিষদ সদস্য উপস্থিত থাকতে পারবেন, তবে পুরস্কার প্রদানের জন্য কার্যনির্বাহী

পরিষদের উক্ত সভায় ভোট গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিলে 'বিচারক-সভা'র সদস্য হিসেবে দায়িত্বপালনকারী পরিষদ সদস্য ভোট প্রদানে বিরত থাকবেন।

১১. 'বিচারক-সভা'র সুপারিশ বিবেচনা করে কার্যনির্বাহী পরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। 'বিচার-সভা'র সুপারিশ বিবেচনাকালে পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিষদ 'বিচারক-সভা' কর্তৃক সুপারিশকৃত নয় এমন কোন সাহিত্যিককে পুরস্কার প্রদানের জন্য বিবেচনা করতে পারবেন না কিংবা পুরস্কার প্রদান করতে পারবেন না। তবে 'বিচারক সভা'র সুপারিশ সম্পূর্ণত কিংবা অংশত গ্রহণ না করার অধিকার পরিষদেব থাকবে।

পঞ্চম অধ্যায়

পুরস্কার ঘোষণা

১. প্রতি বছর ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক বা সাহিত্যিকদের নাম ঘোষণা করা হবে।

২. বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক প্রাধিকৃত কোনো কর্মকর্তা পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের নাম ঘোষণা করবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পুরস্কার প্রদান

১. প্রতি বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে পুরস্কৃত সাহিত্যিক বা সাহিত্যিক-দের পুরস্কারের অর্থের চেক এবং সম্মাননাপত্র একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

২. বাংলা একাডেমীর সভাপতি, তাঁর অবর্তমানে সহ-সভাপতি, তাঁর অবর্তমানে মহাপরিচালক বা কার্যনির্বাহী পরিষদের কোনো মনোনীত সদস্য এই অর্থের চেক এবং সম্মাননাপত্র প্রদান করবেন।

৩. পুরস্কৃত সাহিত্যিক মৃত হলে তাঁর কোন আইনানুগ উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারীবৃন্দ পুরস্কারের অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন। আইনানুগ উত্তরাধিকারীর সংখ্যা একাধিক হলে পুরস্কারের অর্থ প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাঁদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে।

৪. পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের বাংলা একাডেমীর ফেলোশীপ প্রদান করা হবে।

৫. পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের সম্পর্কে একটি পরিচিতিমূলক পুস্তিকা প্রকাশ করার চেষ্টা করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়

সাধারণ

১. এই নীতিমালা সম্পূর্ণত বা অংশত সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন বা বাতিল করার অধিকার কার্যনির্বাহী পরিষদের থাকবে।

২. নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারবেন:

ক. মহাপরিচালক;
খ. কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য;
গ. 'বিচারক-সভা'র সদস্য, এবং
ঘ. একাডেমীর ফেলো।

৩. এই নীতিমালা সম্পর্কে উত্থাপিত যে-কোনো সংশোধনী প্রস্তাব লিখিত আকারে প্রস্তাবকের স্বাক্ষরযুক্ত হয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদে উপস্থাপিত হতে হবে এবং এ সম্পর্কে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৪. এই নীতিমালার কোনো ধারার ব্যাখ্যা দ্ব্যর্থবোধক মনে হলে, সে সম্পর্কে কার্যনির্বাহী পরিষদের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৫. এই নীতিমালায় অনুল্লেখিত কোনো বিষয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার
মনোনয়ন ছক

ক্রমিক সংখ্যা	মনোনীত সাহিত্যিকের নাম	মনোনীত সাহিত্যিকের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী	বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কারের জন্য তাঁকে মনোনয়ন প্রদানের কারণ। সংক্ষেপে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

১৯৮৬-র পুরস্কৃত সাহিত্যিক

মোহাম্মদ রফিক

জন্ম : ২৩ অক্টোবর ১৯৪৩, বৈটপুর বাগেরহাট।
বাবা : শামসুদ্দীন আহমদ, মা : বেগম রেশতুন্‌ নাহার।

শিক্ষা : এম.এ. (ইংরেজী) ১৯৬৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পেশা : অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার

প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : বৈশাখী পূর্ণিমা (১৯৬৯), ধুলোর সংসারে এই মাটি (১৯৭৫), কীর্তিনাশা (১৯৭৮), কপিলা (১৯৮৩), খোলা কবিতা : তৃতীয় সংস্করণ (১৯৮৭), গাওদিয়া (১৯৮৬)।

পুরস্কার : কীর্তিনাশা কাব্যগ্রন্থের জন্য আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৯)।

হুমায়ুন আজাদ

জন্ম : ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭, রাড়িখাল গ্রাম, বিক্রমপুর।
১৯৬২ সালে মেধা তালিকায় স্থানসহ রাড়িখাল স্যার জে.সি. বোস ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা। বাংলায় বি.এ. (অনার্স) ও এম.এ.-তে প্রথম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯৬৮। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষা বিজ্ঞানে পিএইচ.ডি.।

পেশা : প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশিত গ্রন্থ : গবেষণা গ্রন্থ : (১) রবীন্দ্র প্রবন্ধ / রাষ্ট্র ও সমাজ-চিন্তা, (২) শামসুর রাহমান/নিঃসঙ্গ শেরপা, (৩) বাক্যতত্ত্ব, (৪) Pronominalization in Bengali, (৫) বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র।

কাব্যগ্রন্থ : (১) অলৌকিক ইস্টিমার (২) জ্বলো চিতাবাঘ (৩) সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে (৪) যতোই গভীরে যাই মধু যতোই ওপরে যাই নীল।

কিশোর গ্রন্থ : (১) লাল নীল দীপাবলী (২) ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না (৩) কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী।

সম্পাদনা : বাঙলা ভাষা (২ খণ্ড)

অমর একুশে ’সাতাশিতে একাডেমীর
অনুষ্ঠানমালা

সূচনা-পর্ব ঃ এক

১৮.১০.১৩৯৩ / ১.২.১৯৮৭ রবিবার

শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

সকাল নয়টায় শিশু-কিশোরদের কণ্ঠে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো...' গানের মাধ্যমে অমর একুশে 'সাতাশি উপলক্ষে বাংলা একাডেমীর মাসব্যাপী অনুষ্ঠানমালার সূচনা হয়। এরপর মহাপরিচালকের স্বাগত ভাষণের পর শুরু হয় শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। বিষয় ছিলো 'আমার দেশ'। বয়স অনুসারে প্রতিযোগিদের তিনটি শাখায় বিভক্ত করা হয়। প্রথম শাখার বয়সসীমা ছিল সর্বোচ্চ সাত বছর, দ্বিতীয় শাখার দশ বছর এবং তৃতীয় শাখার পনের বছর। প্রথম শাখায় প্রথম স্থান অধিকার করে সানজিদ হাসান, দ্বিতীয় নাজিয়া আহমেদ ও তৃতীয় মোহাম্মদ আলী। দ্বিতীয় শাখায় প্রথম স্থান অধিকার করে মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান, দ্বিতীয় রুহুল করিম ও তৃতীয় নওসিন শারমিন এবং তৃতীয় শাখায় প্রথম হয়েছে মোহাম্মদ সাইদুজ্জামান, দ্বিতীয় মনির হোসেন ও তৃতীয় সারহানা ইয়াসমীন আহমেদ। বিচারক-মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন শিল্পী আবদুর রাজ্জাক, কাজী আবদুল বাসেত ও হাশেম খান। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপক পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন একাডেমীর পাঠ্য পুস্তক বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ ইবরাহিম। শিশু-কিশোর শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রে বাংলাদেশের জনজীবন, নিসর্গ, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি পরিস্ফুটিত হয়েছে। বিচারকমণ্ডলী কর্তৃক বাছাইকৃত ৮৭টি চিত্র একাডেমীর প্রধান ফটকের পশ্চিম পাশে একটি স্টলে প্রদর্শিত হয়।

১৯.১০.১৩৯৩/২.২.১৯৮৭ সোমবার

বাংলা মুদ্রাক্ষরযন্ত্রের উন্নতিসাধন ও বৈদ্যুতীকরণ সংক্রান্ত সেমিনার

বাংলা একাডেমী 'বাংলা মুদ্রাক্ষরযন্ত্রের উন্নতিসাধন ও বৈদ্যুতীকরণ' নামক একটি তিন-সালা (১৯৮৫-৮৮) প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের দুটি প্রধান দিক: প্রচলিত অপটিমা-মুনীর মুদ্রাক্ষরযন্ত্রের কী-বোর্ডের সংস্কার এবং ইলেকট্রনিক বাংলা মুদ্রাক্ষরযন্ত্র নির্মাণ। এ-বিষয়ে একাডেমী সরকারের

কাছে সামগ্রিক সুপারিশ পেশ করবে। এ-বিষয়টির ব্যাপক পর্যালোচনার জন্য ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ একাডেমীর সেমিনার কক্ষে সারা-দিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি অধিবেশনে বিভক্ত এই সেমিনার উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমীর সভাপতি ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন। বাংলা মুদ্রাক্ষরযন্ত্র উন্নয়ন কমিটির আহ্বায়ক জনাব বশীর আলহেলাল প্রতিবেদন পেশ করেন। মহাপরিচালক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। কর্ম-অধিবেশন দু'টিতে সভাপতিত্ব করেন ডঃ এ. এইচ. করিম ও প্রফেসর এ.এম. হারুন অর রশীদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডঃ মোঃ শামসুল হক মিয়া ও জনাব জামিল চৌধুরী। আলোচনা করেন ডঃ এম. আশরাফ আলী, অধ্যাপক দানীউল হক, জনাব মোঃ আবদুল মান্নান, ডঃ হাসান আমীন কাজী ও জনাব সাইফ শহীদ। সেমি-নারে ঢাকা ছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকগণ তাঁদের অভিমত প্রদান করেন।

২০ ১০. ১৩৯৩/৩. ২.১৯৮৭ মঙ্গলবার

দ্বিতীয় জাতীয় ফোকলোর কর্মশালা

সকাল দশটায় বাংলা একাডেমীর সেমিনার কক্ষে তিন সপ্তাহব্যাপী দ্বিতীয় জাতীয় ফোকলোর কর্মশালা শুরু হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন একা-ডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল। অনুষ্ঠানে প্রকল্প পরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান প্রতিবেদন পেশ করেন। শুভেচ্ছা ভাষণ প্রদান করেন প্রফেসর লরি হংকো, প্রফেসর হেনরি গ্লাসি ও ডক্টর জহরলাল হাণ্ডু। সভাপতির ভাষণ দেন অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। কর্মশালায় ২২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করেন।

২৩. ১০. ৯৩/৬. ২. ৮৭ শুক্রবার

'জীবনী গ্রন্থমালা'-র প্রকাশনা উৎসব

অমর একুশে 'সাতাশি উপলক্ষে বাংলা একাডেমীর নিবেদন 'জীবনী গ্রন্থমালা'র ত্রিশটি বইয়ের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বিকেল সাড়ে চারটায় বর্ধমান ভবনের প্রশিক্ষণ কক্ষে। অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন একাডেমীর মহাপরিচালক

প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও গবেষণা-সংকলন-ফোকলোর বিভাগের পরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান। এরপর মহাপরিচালক প্রত্যেক লেখককে তাঁদের বইয়ের পাঁচ কপি এবং সম্মানীর চেক প্রদান করেন।

২৪. ১০. ১৩৯৩/৭. ২. ১৯৮৭

গ্রন্থমেলা উদ্বোধন

বিকেল ৪-৩০মিঃ সূচনা সঙ্গীতের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু। ঘোষণা ৪-৩৫ মিনিটে, ৪-৩৭ সভাপতি আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি প্রফেসর সিরাজুল হক।

৪-৪০ মিনিটে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক স্বাগত ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন, বর্তমান গ্রন্থমেলায় ১৫৩টি স্টলে মোট ১০১টি প্রতিষ্ঠান তাঁদেব গ্রন্থসম্ভার সাজিয়েছেন। তিনি অমর একুশে গ্রন্থমেলা ১৯৮৭-এর সকল আয়োজনে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব সেরাজুল হক তাঁর ভাষণে বলেন, গ্রন্থ উন্নয়ন তথা প্রকাশনা শিল্প উন্নয়নের জন্যে গ্রন্থ নীতি প্রণয়ন আজকে জরুরী হয়ে পড়েছে। তিনি গ্রন্থমেলার সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

গ্রাম্থমেলা পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক জনাব হাবীব-উল-আলম সমবেত সুধীমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, এবারের গ্রন্থমেলায় গতবারের চেয়ে অনেক বেশী ও নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করেছে।

আলোচনায় অংশ নেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক জনাব ফজলে রাব্বী। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই গ্রন্থমেলা এখন আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই মেলা মানুষের মধ্যে একটি বন্ধনসূত্র স্থাপন করে এবং এটা বাংলা একাডেমীর একটি স্থায়ী প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গ্রন্থমেলার সাথে বাংলাদেশের গ্রন্থমোলার একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা করেন।

অতঃপর অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রফেসর সিরাজুল হক গ্রন্থমেলার উদ্বোধন ভাষণ দেন। তিনি উদ্বোধন বইয়ে স্বাক্ষর করেন এবং গ্রন্থমেলা পরিদর্শন করেন।

সূচনা-পর্ব দুই

২৫.১০ ১৩৯৩/৮ ২.১৯৮৭ রবিবার

বিকেল ৪-৩০ মিনিটে সূচনা সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু। ৪-৩৫ মিনিটে ভাষা-শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠান ঘোষণা করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠান দুই পর্বে বিভক্ত (ক) গ্রন্থ আলোচনা ও আবৃত্তি এবং (খ) সংগীতানুষ্ঠান।

প্রথমে শেখ আবদুল ওহাব রচিত "বিংশ শতাব্দীর নীতিদর্শন" গ্রন্থের আলোচনা করতে গিয়ে ড: আমিনুল ইসলাম বলেন, বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যেমন তেমনি দর্শনেও বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এই শতাব্দীতে দার্শনিক আন্দোলনে বড় রকমের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি উল্লেখ করেন যে, নীতিবিদ্যার কাজ হচ্ছে মানুষের রুচি নিয়ে পরিচালনা করা। এই গ্রন্থে বর্তমান শতাব্দীর দর্শন ও নীতিবিদ্যার যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা অপ্রতুল। তাছাড়া অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে এই গ্রন্থে কিছুই উল্লেখ নেই। আলোচ্য গ্রন্থের ভাষা সাবলীল বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ডাঃ শুভাগত চৌধুরী অনূদিত "ক্যানিংহামের প্র্যাকটিক্যাল এনাটমি ম্যানুয়েল" গ্রন্থের আলোচনা করেন ডাঃ আবদুস সালাম। তিনি মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, মাতৃভাষায় যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানের চর্চা করতে হয় তবে সবার আগে এনাটমির গ্রন্থ অপরিহার্য। বর্তমান গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, অনুবাদক পুস্তকটির আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন এবং অনেক লম্বা লম্বা বাক্য বাদ দিয়েছেন এবং তৎসম ও তদ্ভব শব্দ বেশী ব্যবহার করেছেন।

গ্রন্থ-আলোচনা শেষে আবৃত্তি অনুষ্ঠান শুরু হয়। আবৃত্তিতে অংশ নেন রামেন্দু মজুমদার এবং পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সংগীতের অনুষ্ঠান। সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন কলিম শরাফী এবং রেজোয়ানা চৌধুরী বন্যা।

২৬. ১০. ১৩৯৩/৯. ২. ১৯৮৭ সোমবার

প্রতিদিনের মতো এদিনও বিকেল ৪-৩০ মিনিটে সূচনা সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে ছিল গ্রন্থ আলোচনা, আবৃত্তি ও নজরুল গীতির আসর।

গ্রন্থ আলোচনা অনুষ্ঠানে ফিরোজ মাহমুদ এবং হাবিবুর রহমান রচিত 'দি মিউজিয়ামস ইন বাংলাদেশ' গ্রন্থের আলোচনায় অংশ নেন যথা-ক্রমে ডঃ মোখলেসুর রহমান, ডঃ শামসুল আলম এবং জনাব আ.কা. মো. যাকারিয়া।

ডক্টর মোখলেসুর রহমান গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, মিউজিয়াম আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে। বর্তমান গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশে মিউজিয়ামের উপর ইতিপূর্বে এই ধরনের বিশাল কাজ আর কেউ করেন নি। গ্রন্থটিতে ২০টি অধ্যায় রয়েছে এবং এতে ৭৮টি মিউজিয়ামকে সামনে রেখে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। তিনি বলেন বর্তমানে মিউজিয়ামের সকল কর্মকাণ্ডে বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই গ্রন্থটিতে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়েছে, তবে বইটি সুলিখিত এবং জ্ঞানগর্ভ বলে উল্লেখ করা হয়।

জনাব আ. ক. মো. যাকারিয়া বলেন যে, লেখকদ্বয় বর্তমান গ্রন্থে অনেক দুর্লভ তথ্য পরিবেশন করেছেন যা ইতোপূর্বে লিখিত এ ধরনের বইয়ে উল্লেখ ছিল না। তিনিও ডঃ মোখলেসুর রহমানের সাথে একমত পোষণ করেন এবং বলেন যে, এর আগে মিউজিয়াম নিয়ে এরূপ বিশাল কাজ আর কেউ করেন নি। এই ধরনের একটি সুন্দর সুলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বই রচনার জন্য তিনি লেখকদ্বয় এবং প্রকাশক বাংলা একাডেমীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সর্বশেষ আলোচক ডঃ শামসুল আলম গ্রন্থটির ২০টি অধ্যায়ের মধ্যে আলোচিত প্রায় সকল অংশে কিছু কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করেন। তিনি বইটির গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং ভুলত্রুটির কথাও উল্লেখ করেন। তথাপি প্রকাশনার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি একটি মূল্যবান অবদান বলে অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করেন। লেখকদ্বয় ঢাকার জাতীয় যাদুঘরসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি যাদুঘরের ব্যবস্থাপনার যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার সাথে তিনি একমত পোষণ করেন এবং এই ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। পরিশেষে তিনি উল্লেখ করেন যে, বইটি যেহেতু ইংরেজীতে লেখা এবং এটা বিদেশী পাঠকগণও পড়বেন সেহেতু এর মুদ্রণ আরও সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত

হওয়া উচিত ছিল। তিনি গ্রন্থের লেখকদ্বয় এবং বাংলা একাডেমীকে ধন্যবাদ জানান।

আলোচনা শেষে আবৃত্তি অনুষ্ঠান শুরু হয়। অংশ নেন লুৎফুননাহার লতা এবং ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সন্ধ্যায় নজরুল গীতির আসর বসে। অংশ নেন সোহরাব হোসেন এবং ফাতেমা-তুজ-জোহরা।

২৭.১০.১৩৯৩/১০.২.১৯৮৭ মঙ্গলবার

বিকেল ৪-৩০ মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ-দিনের অনুষ্ঠান গ্রন্থ আলোচনা ও আবৃত্তি এবং সংগীতানুষ্ঠান এ-দুই পর্বে বিভক্ত ছিল।

এ-দিন দুটি গ্রন্থের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে মণীন্দ্র সমাজদার রচিত "সংস্কৃত প্রাকৃত ও অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" গ্রন্থের আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস। গ্রন্থটি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এ ধরনের গ্রন্থ বাংলাদেশে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নি। এরূপ বিষয়বস্তুভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য তিনি বাংলা একাডেমীকে ধন্যবাদ জানান। তবে তিনি গ্রন্থটির দুর্বলতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে, এই গ্রন্থে যেসব বাক্য উপহার দেয়া হয়েছে সেগুলির সরলার্থ করা খুবই কঠিন। বইটিতে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

এরপর মোঃ ফরিদউদ্দিন রচিত "কাহিনী-কিংবদন্তী" গ্রন্থের আলোচনা করেন ডঃ ওয়াকিল আহমদ। তিনি বলেন যে, আলোচ্য গ্রন্থে মানুষ কিভাবে পশু-পাখীতে রূপান্তরিত হয় তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এ ধরনের বই লিখে লেখক জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। এই বইয়ের আলোচনা অংশ দুর্বল এবং এটি একটি সম্পাদিত গ্রন্থ বলে তিনি উল্লেখ করেন। গ্রন্থটির নামকরণের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি ফোকলোর গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

গ্রন্থ-আলোচনা শেষে আবৃত্তি অনুষ্ঠান শুরু হয়। অংশ নেন প্রজ্ঞা লাবনী এবং আশরাফুল আলম।

সন্ধ্যায় দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠানে অংশ নেন আবদুল লতিফ এবং সামিনা চৌধুরী।

২৮.১০.১৩৯৩/১১২.১৯৮৭ বুধবার

প্রতিদিনেব মতো এ-দিনও বিকেল ৪-৩০ মিনিটে সূচনা সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ-দিনের অনুষ্ঠান গ্রন্থ-আলোচনা, আবৃত্তি এবং দেশাত্মবোধক গানের আসর—এ দুই পর্বে বিভক্ত ছিল।

এ-দিনেও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত দু'টি গ্রন্থের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থ দু'টি হচ্ছে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান "রচিত রবীন্দ্র বাক্যে আর্ট, সংগীত ও সাহিত্য" এবং ডঃ সৈয়দ আকরাম হোসেন সম্পাদিত "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী ২য় খণ্ড"। প্রথমে "রবীন্দ্র বাক্যে আর্ট, সংগীত ও সাহিত্য" গ্রন্থের আলোচনা করেন ডঃ রফিকুল ইসলাম। গ্রন্থটি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, আর্ট, সংগীত, সাহিত্য তথা নন্দনতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল ভাবনার বিশদ বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা এতে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে বুঝবার জন্যে এই গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে বইটিতে নন্দনতত্ত্বের এই সব বিষয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাগুলি এলোমেলোভাবে গ্রন্থিত বলে তিনি জানান। তবুও আলোচ্য গ্রন্থটি একটি পাঠ্যপুস্তকরূপে বিবেচিত হবার যোগ্য বলে তিনি মনে করেন। তিনি লেখককে এ ধরনের বই লেখার জন্য এবং বাংলা একাডেমীকে বইটি প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদ জানান।

এরপর ডঃ সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, রচনাবলী ২য় খণ্ড" শীর্ষক গ্রন্থটি সম্পর্কে ডঃ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, ইদানিং সুধীজনের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে সেটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গ্রন্থকারের ৩২টি অগ্রন্থিত গল্প এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে এবং সাধারণ পাঠকও বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বইটি গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ খণ্ডে যে ৪টি নাটক স্থান পেয়েছে তা' সৈয়দ ওয়ালী-উল্লাহ্‌কে একজন সফল নাট্যকার হিসেবে উপস্থাপিত করেছে বলেও

তিনি উল্লেখ করেন। গ্রন্থটির সম্পাদক ডঃ সৈয়দ আকরম হোসেন এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে যে পরিশ্রম করেছেন ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা' সত্যিই প্রশংসনীয় বলে তিনি জানান। এ ধরনের উচ্চমানের কাজ বাংলাদেশে হয় নি বললেই চলে এবং সেজন্য এটি একটি মূল্যবান উপহার বলে তিনি উল্লেখ করেন।

গ্রন্থ আলোচনা শেষে আবৃত্তি অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে অংশ নেন আলেয়া ফেরদৌসী এবং আবদুল্লাহ্ আল-মামুন।

সন্ধ্যায় শুরু হয় সংগীতানুষ্ঠান। এ-দিন ছিল দেশাত্মবোধক গানের আসর। অংশ নেন নাদিরা বেগম এবং ইন্দ্রমোহন রাজবংশী।

২৯.১০. ১৩৯৩/১২.২. ১৯৮৭ বৃহস্পতিবার

বিকেল ৪-৩০ মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ-দিনের অনুষ্ঠান গ্রন্থ-আলোচনা ও আবৃত্তি এবং সংগীতানুষ্ঠান---দু'টি পর্বে বিভক্ত ছিল।

এ-দিন বাংলা একাডেমী প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের আলোচনায় অংশ নেন যথাক্রমে সেলিনা বাহার জামান এবং প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশীদ। গ্রন্থ দু'টি হচ্ছে আবদুল হক সম্পাদিত "কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী ২য় খণ্ড" এবং হাসান হাফিজুর রহমান অনূদিত "ওডেসী"। প্রথমে "কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী ২য় খণ্ড" গ্রন্থের আলোচনা করেন সেলিনা বাহার জামান। গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রাবন্ধিক। সম্পাদক আবদুল হক খুব নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন। এ গ্রন্থে প্রবন্ধগুচ্ছ ২য় ভাগ, ৩টা সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ ৫টা, সংগীত বিষয়ক ৩টা, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক ৩টা, ধর্ম বিষয়ক ৬টা এবং বিবিধ প্রবন্ধ ৭টা স্থান পেয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এই ধরনের একটি বই উপহার দেওয়ার জন্য তিনি বাংলা একাডেমীকে ধন্যবাদ জানান।

সেলিনা বাহার জামানের আলোচনা শেষ হওয়ার পর "ওডেসী" গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করেন প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন উর রশীদ।

গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে তিনি অনুবাদকর্মের জটিলতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশে হোমারের অনুবাদ এই প্রথম। বর্তমান অনুবাদটি মূল থেকে করা হয় নি এবং অনুবাদক ইংরেজী ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন। অনুবাদে মূল বইয়ের গাম্ভীর্য রক্ষা করা হয় নি এবং কোনো কোনো জায়গায় অনুবাদ অত্যন্ত দুর্বল ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূলকে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

গ্রন্থ আলোচনা শেষে আবৃত্তি অনুষ্ঠান শুরু হয়। আবৃত্তিতে অংশ নেন ক্যামেলিয়া মোস্তফা এবং জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়।

সন্ধ্যায় শুরু হয় সংগীতানুষ্ঠান। এ-দিনে ছিল অতুল প্রসাদ/রজনী-কান্তের গান। এতে অংশ নেন সালমা আহমেদ এবং ইফফাত আরা খান।

৩০.১০. ১৩৯৩/১৩.২. ১৯৮৭ শুক্রবার

অমর একুশে ১৯৮৭ উদযাপন উপলক্ষে এবার একটি নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। তা হলো শিশু কিশোরদের সংগীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। সংগীত অনুষ্ঠান প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলেব দেশাত্মবোধক ও প্রকৃতিবিষয়ক সংগীত অন্তর্ভুক্ত ছিল। সকাল ৯টায় বর্ধমান ভবনের তিন তলায় শিশু কিশোরদের ববীন্দ্র ও নজরুল সংগীতের প্রাথমিক নির্বাচন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যথাসময়ে তাদের নাম লিখিয়েছিলো।

বিকেল তিনটায় শিশু কিশোরদের আবৃত্তির প্রাথমিক নির্বাচনের প্রতি-যোগিতা শুরু হয়। এতে অনেক শিশু কিশোর অংশ গ্রহণ করে। তাদের নামও আগেই জমা নেয়া হয়েছিল।

সংগীত প্রতিযোগিতার বিচারকবৃন্দ ছিলেন: সর্বজনাব সুধীন দাস, অজিত রায় এবং ইফফাত আরা খান। আবৃত্তির বিচারকবৃন্দ ছিলেন: সর্বজনাব মুজিবুর রহমান খান, আশরাফুল আলম এবং আলেয়া ফেরদৌসী।

এ-দিনও বিকেল ৪-৩০ মিনিটে যথা নিয়মে গ্রন্থ আলোচনা ও আবৃত্তি পর্বের অনুষ্ঠান সূচনা সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। এদিনের আলোচ্য গ্রন্থ

ছিল ডঃ আবদুল করিম রচিত "বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল"। আলোচনায় অংশ নেন সর্বজনাব আসহাবুর রহমান এবং ডঃ সিরাজুল ইসলাম।

আসহাবুর রহমান গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, বাংলার ইতিহাস পুণর্গঠনে লেখক বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। লেখকের রচিত বইগুলোর মধ্যে এটি হচ্ছে সব চেয়ে বড় মৌলিক কাজ। বইটি তথ্যবহুল। এতে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে। সুলতানী আমলের উপর এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে লেখক তৎকালীন রাজনীতি, সামাজিক ব্যবস্থা, সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন এবং দুর্লভ তথ্য পরিবেশন করেছেন যা ইতোপূর্বে অনেকের অজানা ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি গ্রন্থের কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদের কথাও উল্লেখ করেন।

ডঃ সিরাজুল ইসলাম তাঁর আলোচনায় আসহাবুর রহমানের বক্তব্যর সাথে একমত পোষণ করেন। গ্রন্থকার সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তিনি একজন পণ্ডিত এবং সুলতানী আমলের রাজনৈতিক অবস্থার ব্যাপক আলোচনা এ গ্রন্থে করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই আমলের ইতিহাস লেখা একটি দুরূহ কাজ, কেননা ঐতিহাসিক তথ্য কম। তবে বইটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লেখা নয়, তাই এর আকার অনেক বড় এবং এতে কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদও রয়েছে।

আলোচনার পরে যথা নিয়মে আবৃত্তি পর্ব শুরু হয়। এদিনের আবৃত্তিতে অংশ নেন কাজী আরিফ এবং আসাদুজ্জামান নুর।

সন্ধ্যায় লালন গীতিব অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে অংশ নেন শিল্পী ফরিদা পারভীন এবং চন্দনা মজুমদার।

১.১১.১৩৯৩/১৪.২.১৯৮৭ শনিবার

বেলা ৪-৩০ মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এদিনের অনুষ্ঠান গ্রন্থ আলোচনা ও আবৃত্তি এবং সংগীতানুষ্ঠান দু'টি পর্বে বিভক্ত ছিল।

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড" গ্রন্থ সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করেন ডঃ নাজিমউদ্দিন আহমেদ। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় গবেষক ও

পণ্ডিতের উপর বইটির সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হওয়ায় বইটির বিষয়বস্তু ও মান অত্যন্ত উচচ পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচনা অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এ ধরনের মূল্যবান বই প্রকাশ করার জন্য তিনি বাংলা একাডেমীকে ধন্যবাদ জানান। অতঃপর আলোচনায় অংশ নেন ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করাব পূর্বে তিনি বলেন যে, ইতিহাস মানবজীবন ও প্রকৃতির চর্চার ক্ষেত্র। আলোচ্য গ্রন্থটি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, প্রাচীন বাংলা থেকে চতুর্দশ সাল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এতে বিশদভাবে বিধৃত হয়েছে। কলেবরে ও গভীর-তায় বর্তমান গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রফেসর আনিসুজ্জামান লিখিত গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে, বিন্দুর মধ্যে রয়েছে সিন্ধুর গভীরতা। এটি একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ হিসেবে কৃতিত্বের দাবীদার।

গ্রন্থ আলোচনা শেষ হওয়াব পর শুরু হয় আবৃত্তি অনুষ্ঠান। এদিনের আবৃত্তিতে অংশ নেন হাসান ইমাম এবং আফজাল হোসেন। সন্ধ্যায় শুরু হয় সংগীতানুষ্ঠান। এদিন ছিল জারীগান। এতে অংশ নেন আবদুর রহমান বয়াতী ও তাঁর দল।

মূল অনুষ্ঠান

২.১১.১৩৯৩/১৫.২.১৯৮৭ রবিবার

অমর একুশ উপলক্ষে বাংলা একাডেমী আয়োজিত একমাসব্যাপী অনু-ষ্ঠানমালার মূল অনুষ্ঠান এদিন বিকেল ৪-৩০ মিনিটে সূচনা সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয়। ৪-৩৫ মিনিটে সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হয় "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো . . ." গান। ৪-৪০ মিনিটে সভাপতি আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দীন। ৪-৪১ মিনিটে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

স্বাগত ভাষণে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, ভাষা আন্দোলনের পর দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তবু ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের

সমগ্র অস্তিত্বে চেতনায় একটি চিরায়ত সংগীতের মতোই স্পন্দিত, ভাষা আন্দোলন ও বাংলা একাডেমী এক অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তায় গ্রথিত। মাতৃভাষার সকল শক্তি ও সম্ভাবনার পরম বিকাশের লক্ষ্যে আমাদের যাবতীয় কার্যক্রম নিয়োজিত।

অতঃপর অমর একুশে বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম। তিনি তাঁর "বিবর্তিত একুশে : বন্দী একুশে" বক্তৃতায় বলেন, একদিনের বিদ্রোহী একুশে আজ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সমাজ তথা' এষ্টাবলিশ-মেন্টের সালাম, শ্রদ্ধা দর্শন-প্রদর্শন, সূক্ষ্ম অসূক্ষ্ম শৃংখলে আবদ্ধ।

তাছাড়া একাডেমী প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থমালা সিরিজের ৭টি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করেন যথাক্রমে ডঃ মুনতাসির মামুন এবং জনাব ফয়েজ আহমদ। তাঁরা বাংলা একাডেমীকে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাপতির ভাষণে ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন বলেন, ভাষার আন্দোলনের সাথে ক্রমান্বয়ে যুক্ত হয়েছে দেশের মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও বাসস্থানের অধিকারেব আন্দোলন। সমাজের উচচ শ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র অংশ বিদেশী ভাষার মুখাপেক্ষী। পাশাপাশি উচচ পর্যায়ে ভাষা কমিটি গঠন করা হয়, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় না। এই দোদুল্য-মানতা পরিহার করা প্রয়োজন।

সন্ধ্যায় দেশের গান, ভাষার গান পরিবেশন করেন অজিত রায়, বিপুল ভট্টাচার্য, মৃদুলা ভট্টাচার্য, সিরাজুস সালেকীন ও ফেরদৌস আরা।

এদিন থেকে একাডেমীর বটমূলের বেদীতে ভাষা-শহীদ ও প্রয়াত মনীষীদের প্রতিকৃতি প্রদর্শনী শুরু হয়। প্রদর্শনীতে ৪৭ টি প্রতিকৃতি স্থান পেয়েছে। বর্ধমান ভবনের তিন তলায় ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ও স্থপতি শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনীও ঐদিন থেকে শুরু হয়। আলোকচিত্রী ছিলেন মনোয়ার আহমেদ।

৩.১১. ১৩৯৩/১৬. ২. ১৯৮৭ সোমবার

প্রতিদিনের মতো এদিন বিকেল ৪-৩০ মিনিটে সূচনা সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এদিনে অনুষ্ঠান আলোচনা এবং সংগীতানুষ্ঠান দু'টি পর্বে বিভক্ত ছিল।

"বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন" সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ মোফাখ্খার হুসেইন খান। তিনি উল্লেখ করেন, গ্রন্থাগার আন্দোলন বাংলা-দেশে অতি প্রাচীন। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম যুগে বিদ্যাচর্চা তথা গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ব্যবহার ছিল। আধুনিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন পশ্চাত্য সভ্যতার প্রত্যক্ষ ফল। ১৮৫০ সালে বিলেতে গ্রন্থাগাব আইনের বদৌলতে প্রবল গণ গ্রন্থাগার আন্দোলন শুরু হয়। এব প্রভাব বাংলাদেশেও পড়ে। ফলে ১৮৫১ সালে এদেশেও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। বালাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন শুরু হলেও তাতে গতি সঞ্চারিত হয় নি। এর জন্য একটি গ্রন্থাগার আইন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ, সবকারী উদ্যোগ এবং শক্তিশালী নেতৃত্বের অভাবই প্রধান কারণ। আলোচনায় অংশ নেন আফিফা রহমান, শরীফ হোসেন এবং জনাব এম. ফজলুল মজিদ। আলোচকগণ প্রবন্ধকারের বক্তব্যের সংগে একমত পোষণ করে বলেন, বাংলাদেশে গ্রন্থাগার অন্দোলনে কোনো গতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়না। তাঁরা বাংলাদেশে গ্রন্থাগার উন্নয়নের ব্যাপারে কিছু সুপারিশের কথা উল্লেখ করেন।

সভাপতির ভাষণে প্রফেসর আবদুল মোমিন চৌধুরী বলেন, গ্রন্থাগার আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বই পড়ার প্রতি যদি আমাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় তবেই এই আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করবে। তিনি গ্রন্থাগার উন্নয়নে সমাজের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সংগীতের অনুষ্ঠান শুরু হয়। অংশ নেন ইফফাত আরা খান, তপন মাহমুদ, রেজোয়ানা চৌধুরী বন্যা, কাদেরী কিবরিয়া ও কলিম শরাফী।

৪.১১.১৩৯৩/১৭.২.১৯৮৭ মঙ্গলবার

এদিন বিকেল ৪-৩০ মিনিটে অনুষ্ঠান যথারীতি শুরু হয়। এদিনের আলোচনার বিষয় "সম্পাদনা"। এ সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। আলোচনায় অংশ নেন যথাক্রমে শামসুল কবীর, বশীর আলহেলাল এবং শাহজাহান মিয়া।

প্রবন্ধকার ডঃ কাইউম তাঁর প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। সম্পাদনার ইতিহাসে ডঃ আহমদ শরীফের অবদান অপরিসীম বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আলোচক শামসুল কবীর কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক সম্পাদনার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বক্তব্যকে দীপ্তিময় করে তোলাই সম্পাদকের প্রধান কাজ। আমাদের দেশে সম্পাদনার ক্ষেত্রে কোনো অনুসরণযোগ্য নীতিমালা নেই বলে তিনি জানান।

বশীর আলহেলাল বলেন, বাংলা একাডেমীর মতো প্রতিষ্ঠানগুলিতে পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থ সম্পাদনার জন্য নিজস্ব সম্পাদক দল নিয়োগ করা দরকার, তাঁদের প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সম্পাদকদের নতুন নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার বাবস্থা না থাকায় আজ বাংলা একাডেমী ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলিতে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে।

শাহজাহান মিয়া তাঁর আলোচনায় বলেন, প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করার জন্য প্রত্ন-লিপি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই জ্ঞান না থাকলে সম্পাদনা করা যায় না।

সভাপতির ভাষণে প্রফেসর মমতাজুর রহমান তরফদার বলেন, মূল প্রবন্ধটি আলোচকদের হাতে যথা সময়ে না পৌঁছার দরুণ আলোচকদের বক্তব্য প্রবন্ধের বক্তব্যের সংগে সংগতিপূর্ণ নয় এবং এটি আলোচনার পরিপন্থী। সন্ধ্যায় আরণ্যক পরিবেশিত "নানকার পালা" নাট্যানুষ্ঠান হয়।

৫.১১.১৩৯৩/১৮.২.১৯৮৭ বুধবার

প্রতিদিনের মতো এদিন বিকেল ৪-৩০ মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এদিনের অনুষ্ঠান আলোচনা এবং সংগীতানুষ্ঠান এই দুই পর্বে বিভক্ত। আলোচনার বিষয় "শিশু সাহিত্যের বিষয় ও ভাষা।" এ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন হায়াৎ মামুদ। আলোচনায় অংশ নেন হেলেনা খান, আলী ইমাম এবং শাহরিয়ার কবীর। সভাপতিত্ব করেন রোকনুজ্জামান খান।

হায়াৎ মামুদ তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, শিশু সাহিত্যিককে এক জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। বিষয় ও ভাষা নির্বাচন করবেন লেখক, কিন্তু অলক্ষ্যে থেকে শিশু সাহিত্যিককে যারা নিয়ন্ত্রণ

করে সে হচ্ছে তার দেখা ও অ-দেখা শিশু: তাদের নানান স্বভাব, নানান বুদ্ধি, নানান হৃদয়বৃত্তি এবং নানান মনন স্তর।

হেলেনা খান তাঁর আলোচনায় বলেন, ৭ থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য সাহিত্য লেখা উচিৎ। শিশু সাহিত্যের ভাষা হবে বিভিন্ন রকমের, অর্থাৎ শিশুর বয়স, রুচি, বোধশক্তি, গ্রহণযোগ্যতা অনুযায়ী। রূপকথা, ছড়া, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী প্রভৃতি শিশুসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বিষয়। তিনি আরও বলেন, উনিশ শতকে অবিভক্ত বাংলায় প্রথম শিশু সাহিত্যের জন্ম হয়।

আলী ইমাম শিশু সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাদের দেশের শিশুসাহিত্যে কোনো সারবস্তু নেই। শিশু সাহিত্য লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের চিন্তার ও দৃষ্টিভংগির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা।

শাহরিয়ার কবীর তাঁর আলোচনায় বলেন, আমাদের সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিশুদের উপযোগী করে শিশু সাহিত্য রচনা করা উচিৎ।

সভাপতির ভাষণে রোকনুজ্জামান খান বলেন, শিশুদের বয়স ও বোধশক্তি অনুযায়ী শিশুসাহিত্য রচনা করা উচিত। শিশুদের জন্য সহজ করে লেখা সব চেয়ে কঠিন কাজ। তিনি আরও বলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উপর এ পর্যন্ত কোনো ভালো শিশুসাহিত্য রচিত হয় নি। শিশু পাঠাগার গড়ে তোলার উপরও তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সন্ধ্যায় নজরুল গীতি অনুষ্ঠান শুরু হয়। অংশ নেন সোহরাব হোসেন, রফিকুল ইসলাম, নিলুফার ইয়াসমিন, আবদুল হান্নান, ডালিয়া নওশিন এবং জোসেফ কমল রড্রিক্স।

৬.১১.১৩৯৩/১৯.২.১৯৮৭ বৃহস্পতিবার

এদিনও নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এদিনের আলোচনার বিষয় "বিজ্ঞান ও সাহিত্য।" এ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন ডা: আহমদ রফিক। সভাপতিত্ব করেন ড: জহুরুল হক।

ডাঃ রফিক তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের পটভূমিতে সংস্কৃতির ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক বেশ গভীর এবং জটিল। বিজ্ঞান বরাবরই সংস্কৃতি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পুষ্টি সরবরাহ করে এসেছে। সংস্কৃতির সাথে, বিশেষভাবে শিল্পসাহিত্যের সাথে বিজ্ঞানের নানামুখী ও পারস্পারিক সম্পর্ক লক্ষণীয়। আবার শিল্পী চেতনা যেখানে অনুভূতিপ্রবণ ও আবেগ প্রধান, বিজ্ঞানীর চেতনা সেখানে বিশ্লেষণধর্মী, যুক্তি ও বুদ্ধি প্রধান।

পঠিত প্রবন্ধের উপর রবিউল হুসাইনের লিখিত আলোচনা পাঠ করেন জনাব রশীদ হায়দার। জনাব হুসাইন তাঁর লিখিত আলোচনায় উল্লেখ করেন, সংস্কৃতির পরিমণ্ডল বিজ্ঞানের বিকাশকে সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান সংস্কৃতির ফসল এবং তা একে অপরের পরিপূরক। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার যেমন সংস্কৃতিকে করেছে ঋদ্ধ, ধনবান ও আনন্দদায়ক তেমনি সংস্কৃতির যৌথমণ্ডল বিজ্ঞানের বিকাশকে করেছে অবাধ, সাবলীল এবং ক্রমোন্নতিশীল, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের সুষ্ঠু বিকাশ কখনও সাবলীল হতে পারে না, যতদিন না পর্যন্ত মুক্ত-স্বাভাবিক আবহাওয়া এদেশে তৈরী হয়। ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম প্রবন্ধকারের বক্তব্যের সংগে একমত পোষণ করেন এবং তাঁর "আমাদের সংস্কৃতিতে বিজ্ঞান কেন থাকবে" শীর্ষক আলোচনায় বলেন, বাঁচার মত বাঁচার তাগিদেই আমাদের সংস্কৃতিতে বিজ্ঞান অপরিহার্য।

সভাপতির ভাষণে প্রফেসর জহুরুল হক বলেন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা আবশ্যক, কেননা এতে সার্বিক কল্যাণ নিহিত। সন্ধ্যায় পল্লীগীতি ও মরমী গানের অনুষ্ঠান শুরু হয়। অংশ নেন সর্বজনাব মোস্তফা জামান আব্বাসী, ফরিদা পারভীন, কিরণচন্দ্র রায়, হাফিজুর রহমান ও মলয়কুমার গাঙ্গুলী।

৭, ১১. ১৩৯৩/২০.২.১৯৮৭ শুক্রবার

এদিন সকাল ৯টায় শিশু কিশোরদের আবৃত্তি ও সংগীতের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১২টায় পুরস্কার প্রাপ্ত শিশু কিশোরদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন বেগম জাহানারা আবেদিন।

উল্লেখ্য যে, ১লা ফেব্রুয়ারী '৮৭ তারিখে অনুষ্ঠিত শিশু কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যেও তিনি এ সময় পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা সচিব এম. এ সাঈদ।

বিকেল ৪—৩৫ মিনিটে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার ১৯৮৬ ঘোষণা করেন। বাংলা সাহিত্যে অবদান রাখার জন্য পুরস্কার লাভ করেন কবি মোহাম্মদ রফিক এবং ডক্টর হুমায়ুন আজাদ।

পরে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। এদিনের আলোচনার বিষয় "বাংলাদেশের লোক সংগীত"। এ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন মুহম্মদ হাবীবুর রহমান। আলোচনায় অংশ নেন ডঃ শাহজালাল, শামসুজ্জামান খান এবং আবুল আহসান চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর মযহারুল ইসলাম।

হাবীবুর রহমান তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, লোক সংগীতকে ব্যাখ্যা করতে গেলে দেখা যায় এর পেছনে নিশ্চয়ই একটি নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগলিক যোগসূত্র রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লোকসংগীত সংস্কৃতিগতভাবে সীমিত নয়। আবার ভৌগোলিক দিক থেকে সীমাবদ্ধও নয়। বাংলাদেশে লোকসংগীতের সাহিত্য নির্ভর গবেষণা হয়েছে। এসব গবেষণার পদ্ধতি ছিল মূলতঃ বর্ণনামূলক এবং এসব গবেষণা পূর্ণাঙ্গ নয়। সে কারণে লোকসংগীতের নৃ-ভৌগোলিক দৃষ্টিভংগি অনুসারে বিশ্লেষণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এর বিশ্লেষণে একটি সমন্বিত প্রয়াস দরকার, এক বা একাধিক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এর গবেষণা খুবই কষ্টসাধ্য। সেজন্য প্রয়োজন একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি—যেখানে লোকসাহিত্য তথা লোকসংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটবে।

ডঃ শাহজালাল তাঁর আলোচনায় বলেন, লোকসংগীত আমাদের সুমহান অতীত ও ঐতিহ্য এবং বর্তমানের ভিত্তি। এর কোন সুনির্দিষ্ট ঘরানা নেই। আঞ্চলিকতাই এর প্রাণ।

শামসুজ্জামান খান তাঁর আলোচনায় বলেন, লোকসংগীতের কোনো ঘরানা নেই—আছে প্রকৃতি পরিবেশ আচার-অনুষ্ঠান সংস্কার যাদুবিদ্যা নিয়ে এক আঞ্চলিকরূপ। এই আঞ্চলিকতাই লোকসংগীতের প্রাণ।

আবুল আহসান চৌধুরী বলেন, বাংলার অবহেলিত, বঞ্চিত, শোষিত ও নির্যাতিত মানুষের মর্মবেদনা লোক সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আমাদের দেশের কৃষক, জেলে, শ্রমিক তথা শ্রমজীবী মানুষই এর জনক ও পৃষ্ঠপোষক।

সভাপতির ভাষণে প্রফেসর মযহারুল ইসলাম বলেন, আমাদের লোক সংগীত আমাদের জাতীয় পরিচয় বহন করে। নৃ-ভৌগোলিক দৃষ্টি-ভংগির মাধ্যমে এর বিচার-বিশ্লেষণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সন্ধ্যায় শুরু হয় শিশু-কিশোর পরিবেশিত সংগীতানুষ্ঠান। এতে প্রায় পঁচিশ জন শিশু-কিশোর অংশ নেন।

অমর একুশে ১৯৮৭

ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

সকাল ৭টায় শুরু হয় কবিতা পাঠের আসর। সভাপতিত্ব করেন কবি আতাউর রহমান। দুই শতাধিক কবি তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

বিকেল ৪-১৫ মিনিটে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। এদিনের আলোচনার বিষয় "একুশে ফেব্রুয়ারী ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ"। এ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন সন্তোষ গুপ্ত। আলোচনায় অংশ নেন সর্বজনাব হোসনে আরা শাহেদ, সন্‌জীদা খাতুন, রাগিব খান, কামাল লোহানী ও গাজীউল হক। সভাপতিত্ব করেন ডক্টর মফিজ চৌধুরী।

সন্তোষ গুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, একুশে ফেব্রুয়ারী থেকে মুক্তিযুদ্ধ এই কালমধ্যবর্তী ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষ দেখেছে জাতীয় চেতনা এবং অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম পরস্পরের সম্পূরক। একটির সাথে অন্যটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আলোচকগণ প্রবন্ধকারের বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান উদ্দীপক শক্তি ছিল একুশে ফেব্রুয়ারী। ভাষা-আন্দোলনই আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের অংকুর। একুশের চেতনা থেকেই পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালী জাতিসত্তার যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা পূর্ণতা লাভ করে মুক্তিযুদ্ধে।
সভাপতির ভাষণে জনাব মফিজ চৌধুরী বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের দেশে এসেছিল ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে; তাই একুশে জাতীয় জীবনে এক বিশাল স্বর্গীয় তোরণ, যা অতিক্রম করে স্বাধীনতার লাল সূর্য আমাদের জীবনে উদিত হয়েছিল।
সন্ধ্যায় গণসংগীত পরিবেশন করেন আবদুল লতিফ, ফকির আলমগীর, রথীন্দ্রনাথ রায় ও আরও কয়েকজন।
এদিন সকাল ৭টায় বুক স্টলগুলি খোলা হয়। সকাল থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দর্শক ও ক্রেতাদের প্রচণ্ড ভীড় দেখা যায়। সংগীতানুষ্ঠানসহ শিশু-কিশোর চিত্র প্রদর্শনী, প্রতিকৃতি প্রদর্শনী, আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও মুরাদুজ্জামানের একক চিত্র প্রদর্শনীতে প্রচুর লোকের সমাগম ঘটে। এদিন সন্ধ্যার পর বাংলা একাডেমীর বইয়ের স্টলে সর্বাধিক ভীড় দেখা যায়।

একুশোত্তর অনুষ্ঠান

১১.১১ ১৩৯৩/২৪ ২.৮৭ মঙ্গলবার

অমর একুশে '৮৭ উপলক্ষে বাংলা একাডেমীর একুশোত্তর অনুষ্ঠান 'আমার লেখা'। 'নিজের লেখা সম্পর্কে লেখক' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বিকেল চারটায় সূচনা সংগীত দিয়ে শুরু করা হয়। এদিনের লেখক আবু জাফর শামসুদ্দীন। নিজের লেখা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমার গল্প উপন্যাসে সমাজের অতি নিম্নস্তরের দুঃখী, অবহেলিত নিপীড়িত মানুষের ছবি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি, তবে সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়েছি বলে মনে হয় না। আমার সীমাবদ্ধতা আছে, এরই মধ্যে যতটুকু দেখেছি, বুঝতে পেরেছি ততোটুকুই আমি আমার লেখায় তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।'

১২.১১.১৩৯৩/২৫.২.৮৭ বুধবার

সূচনা সংগীতের মধ্য দিয়ে বিকেল চারটায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। নিজের লেখা সম্পর্কে আজকে বলেন কবি শামসুর রাহমান। তিনি বলেন,

"সাধারণতঃ যে বয়সে লেখকরা লিখতে শুরু করেন আমি সে বয়সে লিখতে শুরু করি নি, বেশ পরে, ১৯৪৮ সালে যখন বি. এ. ক্লাশে ভর্তি হই তখন লিখতে শুরু করি। জীবনানন্দ দাশের "ধূসর পাণ্ডুলিপি" কাব্যগ্রন্থটি পড়ে আমি দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হই। . . . . . . এক পর্যায়ে আমি জেদ করে জীবনানন্দ দাশের প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে আসি। . . . . আমি সাধারণতঃ অন্তর্গত জগতের কবিতা লিখে থাকি। . . . . আরো পরে '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ দ্বারা আমি বিশেষভাবে প্রভাবিত হই। . . . . . নিজেকে ব্যক্ত করতে চাই, তাই কবিতা লিখি। আমি বিশ্বাস করি প্রেমে সৌন্দর্যে ও বহুমাত্রিক বিশ্বমানবিকতায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে আমার কণ্ঠ সোচ্চার। আমার লেখায় এসব বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে করি।"

১৫.১১.১৩৯৩/২৮.২.৮৭ শনিবার

সূচনা সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে বিকেল সাড়ে চারটায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল। সভাপতিত্ব করেন ডক্টর আবদুল্লাহ্ আলমুতী শরফুদ্দীন।
সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দল 'সাংস্কৃতিক' কর্তৃক পরিবেশিত হয় সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি।

প্রতিকৃতি প্রদর্শনী

অমর একুশের ভাষা শহীদসহ প্রয়াত ৪৭ জন মনীষীর প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হয় বাংলা একাডেমীর বটমূলে। এঁরা হলেন শহীদ বরকত, শহীদ রফিক, শহীদ শফিউর রহমান, লালন শাহ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হাছন রাজা, কায়কোবাদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, ইসমাইল হোসেন শিরাজী, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, জসীমউদ্‌দীন, মীর মশাররফ হোসেন, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আবুল ফজল, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, জীবনানন্দ দাশ, মুনীর চৌধুরী, কাজী আবদুল ওদুদ, ফররুখ আহমদ,

মোতাহের হোসেন চৌধুরী, বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, সৈয়দ ওয়ালী-উল্লাহ, এস. ওয়াজেদ আলি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, আনোয়ার পাশা, জহির রায়হান, হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুল কাদির, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, সিকান্দার আবু জাফর, সৈয়দ মুজতবা আলী, মাহবুব-উল-আলম, সুকান্ত ভট্টাচার্য, আহসান হাবীব, ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব, ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মেহেরুন্নেসা, শহীদুল্লা কায়সার, আলতাফ মাহমুদ, ডাঃ মোহাম্মদ মোর্তজা।

ইতিহাস, সাহিত্য, জীবনী গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা থেকে মনীষীদের সংগৃহীত ছবির প্রতিকৃতি অংকন করেছেন হাশেম খান।

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ও স্থপতি শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি, স্মরণীয় স্থান, আন্দোলনের বিশেষ দৃশ্য প্রভৃতির আলোকচিত্রের একটি প্রদর্শনী এবারের বাংলা একাডেমীর অমর একুশের অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীটির আয়োজন করেছিলেন আলোকচিত্র সাংবাদিক মনোয়ার আহমদ। প্রদর্শনী বর্ধমান ভবনের তিনতলায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীতে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মওলানা ভাসানী, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, আবুল হাশিম, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, শেখ মুজিবর রহমান, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, কাজী গোলাম মাহবুব, আবদুল মতিন, রফিকউদ্দীন ভূইয়া, গাজীউল হক, ডঃ হালিমা খাতুন, ডাঃ এম. এ. আযমল হোসেন, ডাঃ মোহাম্মদ আলী আসগর, এ. জামান খান (বেবী), আহমদ রফিক, বাহাউদ্দিন চৌধুরী, কে. জি. মুস্তফা, সাদেক খান, হাসান হাফিজুর রহমান, সুফিয়া করিম, মিসেস উষা বেপারী, মোশারফ হোসেন চৌধুরী, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, সাফিয়া খাতুন, জহির রায়হান, এম. আর. আখতার মুকুল, ডাঃ গোলাম মাওলা, এস. এম. নুরুল আলম, হাবিবুর রহমান, জিল্লুর রহমান, জুলমত আলী খান, ফজলে লোহানী, রফিকুল ইসলাম, আবদুস সামাদ আজাদ, আমিনুল ইসলাম, মুর্তজা বশীর, নিজামুল হক, গোলাম মুর্তজা, মীর ফজলুল হক, আবদুল লতিফ, আলতাফ মাহমুদ, মোহাম্মদ সুলতান, আবদুল মোমিন, আনোয়ারুল হক খান, কমরুদ্দীন হোসেইন, মীর

হোসেন আহমদ, এস.এ. বারী এ.টি ও আবদুল গাফফার চৌধুরীর ছবি প্রদর্শন করা হয়। নেতৃবৃন্দের প্রতিটি ছবির পাশে তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেয়া হয়েছে। এছাড়া এ প্রদর্শনীতে ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে প্রচারিত কমিউনিস্ট পার্টির দু'টি দুর্লভ ইস্তেহার, ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে দু'টি সরকারী গেজেট, পত্র-পত্রিকা থেকে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত কিছু প্রামাণিক সংবাদ, বিজন ভট্টাচার্য ও মর্তুজা বশীরের ভাষা আন্দোলনের উপর অঙ্কিত দু'টি ফেস্টুনের কার্টুন স্থান পেয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফটোগ্রাফিক সোসাইটি ও ফটোগ্রাফি একাডেমীর প্রদর্শনী

একাডেমীর বর্ধমান ভবনের সামনের প্রাঙ্গণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফটোগ্রাফিক সোসাইটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফটোগ্রাফি একাডেমীর যৌথ উদ্যোগে আলোক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ২৫০টি আলোক চিত্র প্রদর্শিত হয়। আলোক চিত্রগুলোতে বাংলাদেশের জনজীবন, নদ-নদী, প্রাকৃতিক দৃশ্য, শস্য ক্ষেত, শহরের বস্তি, আন্দোলন, অনশন ধর্মঘট, হরতাল, পুলিশী জুলুম, শহরের ভাসমান মানুষ, শিক্ষা ও কাজের দাবী, সর্বহারা মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য ও আশ্রয়হীন জীবন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, ভিক্ষাবৃত্তি, জীবন সংগ্রাম, টোকাই, নবান্ন, শিক্ষিত বেকার যুবক. কর্মজীবী মানুষ, দেয়ালের লিখন, বাৎসল্য, বন্ধুত্ব ইত্যাদি বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে। এছাড়া এ প্রদর্শনীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ জন শহীদ অধ্যাপক এবং জগন্নাথ হলের মিলনায়তনের ছাদ ধ্বসে পড়ে নিহত ৩৮ জন ছাত্রের ছবি স্থান পেয়েছে। আলোক চিত্রগুলো তুলেছেন আহসানুল হক, খোন্দকার আনিসুর রহমান, এয়ার আহমেদ পিয়ারু, সাবিহা খালেক, সাথি ইসমাত জাহান, সিরাজুল মুনিরা মুন্নী, হামিদা খাতুন, তামান্না নিগার, কান্তার, টিউলিপ, লাইজু, নাহিদ ইয়াসমিন দীপা, হেলেন, মুক্তারী, শাহীন, দীবা, শহীদুল ইসলাম বুলবুল, অনামিকা, রকিবুল হাসান, সেলিনা আক্তার, মনজুরুল আলম রানা প্রমুখ আলোকচিত্র শিল্পী।

মোরাদুজ্জামান মুরাদের একক চিত্র প্রদর্শনী

বাংলা একাডেমীর অমর একুশে ১৯৮৭-তে মাসব্যাপী অনুষ্ঠানমালার বিশেষ আকর্ষণ ছিল একাডেমীর বর্ধমান হাউসের নীচের তলার বারান্দায় চিত্রশিল্পী মোরাদুজ্জামান মুরাদের "আমার দেশ" শীর্ষক একক চিত্র প্রদর্শনী। এরমধ্যে তেল রঙের ১৬টি, জল রঙের ৩টি, কাঠকয়লা বা মিশ্রমাধ্যমের ৪টি, ছাপচিত্র ৮টি ও টাইলস ২টি। চিত্রগুলো বাংলাদেশের প্রবীণ ও তরুণ কবিদের কবিতা থেকে ভাবগ্রহণ করে অঙ্কিত হয়েছে। প্রত্যেকটি চিত্রের পাশে একটি করে কবিতার স্তবক উদ্ধৃত করা হয়েছে। চিত্রগুলোতে বাংলাদেশের নগর ও গ্রামীণ জীবন, ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধ বিমূর্ত হয়েছে। গ্রাম বাংলার কৃষক, মাঝি-মাল্লা, কুমোর বাড়ী, শিশু ও কিশোর, জেলের মাছ ধরা, পল্লীর বাসগৃহ; নাগরিক জীবনের ভগ্নবিধ্বস্ত পুরোনো দালান, ঠেলাগাড়ী ও ঠেলাগাড়ীর চালক, ইটভাঙ্গারত মহিলা শ্রমিক, শিল্পাঞ্চলের পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত শ্রমিক, রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে আন্দোলনরত বিক্ষুব্ধ জনতা ও আন্দোলনকারীদের প্রতিহত করার জন্য পুলিশী তৎপরতা, পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বর্বরতা ও মুক্তিবাহিনীর গেরিলাযুদ্ধ ইত্যাদি চিত্রগুলোর বিষয়বস্তু। শিল্পী একটি পোস্টার দেখে ঘাতকের গুলীতে নিহত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রক্তাক্ত দেহের চিত্রাঙ্কন করেছেন। চিত্রটির বক্তব্য হলো "জাতি বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চায়।" প্রদর্শনীতে প্রচুর ভীড় লক্ষ্য করা যায়।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা, ১৯৮৭-তে অংশগ্রহণকারী শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ

অমর একুশে গ্রন্থমেলা, ১৯৮৭-তে মোট ১০৩ টি প্রতিষ্ঠান যোগদান করে। ১৪ ফাল্গুন ১৩৯৩/২৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের এক চা-চক্রে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই চা-চক্র অনুষ্ঠানে যেসব প্রতিষ্ঠানের স্টল অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও অভ্যন্তরীণ অলংকরণের উৎকর্ষে ১ম ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করে তাদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। এছাড়া, ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী প্রতিষ্ঠানকে যথাক্রমে ৫,০০০.০০, ৩,০০০.০০ ও ২,০০০.০০ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়। তিন সদস্য

বিশিষ্ট বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন শিল্পী আবদুর রাজ্জাক, শিল্পী কাজী আবদুল বাসেত ও স্থপতি শামসুল ওয়ারেস। বিচারকমণ্ডলীর বিবেচনায় যে সব স্টল ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করে সেসব স্টল নিম্নরূপ :

১ম—জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
২য়—টোনাটুনি
৩য়—সব্যসাচী
৪র্থ—ডানা প্রকাশনী
৫ম—মুক্তধারা

স্মরণে

বাংলা একাডেমী দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত, গবেষকের মৃত্যুতে শোকসভার আয়োজন করে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শোকবাণী পাঠায়।

শোকবাণী

মফিজুল্লাহ কবীর

মৃত্যু : ১৮.৮.৮৬

বাংলা একাডেমীর জীবন সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক, বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, পণ্ডিত ও গবেষক প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের মৃত্যুতে বাংলা একাডেমী গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

বাংলা একাডেমী আরো মনে করে, এই পন্ডিত গবেষকের আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলাদেশে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো তা সহজে পূরণ হবার নয়।

[২৩.৪.৯৩/৫.৮.৮৬]

আ.ন.ম. বজলুর রশীদ

মৃত্যু : ৮.১২.৮৬

বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি ও নাট্যকার বাংলা একাডেমীর ফেলো আ.ন.ম. বজলুর রশীদের মৃত্যুতে বাংলা একাডেমী গভীর শোক

প্রকাশ করছে এবং বাংলাদেশের সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে।

বাংলা একাডেমী তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

[২২.৮.৯৩/৯.১২.৮৬]

সরদার জয়েনউদ্দীন

মৃত্যু: ২১.১২.৮৬

প্রয়াত সাহিত্যিক সরদার জয়েনউদ্দীনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ৭-৯-৯৩/২৩-১২-৮৬ তারিখে মহাপরিচালক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে এক শোক সভার আয়োজন করে। সভার শুরুতে ১ মিনিট নীরবতা পালন করে মরহুমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এই শোকসভায় মরহুমের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করেন সর্বজনাব বশীর আল হেলাল, মুহম্মদ নুরুল হুদা ও রশীদ হায়দার।

সভাপতির ভাষণে প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল মরহুমের অবদানের উল্লেখ করে বলেন যে আজকের কবি সাহিত্যিকরা যে রাজপথ দিয়ে বিচরণ করছেন সরদার জয়েনউদ্দীন ছিলেন তার অন্যতম নির্মাতা। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য মরহুমের অবদান দেশবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক ও কুশলী সংগঠক।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বরেণ্য সাহিত্যিক ও বাংলা একাডেমীর ফেলো সরদার জয়েন উদ্দীনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

আহমদ হোসেন

এই সভা দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন সচিব জনাব আহমেদ হোসেনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে।

জনাব আহমদ হোসেনের মৃত্যুতে বাংলা একাডেমীর সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ বাংলা একাডেমীর প্রতি তাঁর অবদানের কথা

কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

[১৫.৯.১৩৯৩ / ৩১.১২.৮৬]

আলী আহমদ

মৃত্যু : ৮.১.৮৭

এই সভা দেশের বিশিষ্ট গবেষক, লেখক, সংগ্রাহক, পাণ্ডুলিপি সম্পাদক ও শিক্ষাবিদ বাংলা একাডেমীর ফেলো অধ্যাপক আলী আহমদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে। জনাব আলী আহমদের মৃত্যুতে বাংলা একাডেমীর সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বাংলা একাডেমীর প্রতি তাঁর অবদানের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

[২৫.৯.১৩৯৩ / ১০.১.৮৭]

আবুল হাশেম খান

মৃত্যু : ২২.১.৮৭

বাংলা একাডেমীর পুরস্কারপ্রাপ্ত ঔপন্যাসিক ও বাংলা একাডেমীর ফেলো জনাব আবুল হাশেম খানের মৃত্যুতে বাংলা একাডেমী গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং বাংলাদেশের সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। বাংলা একাডেমী তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

[১০.১০.১৩৯৩ / ২৪ ১.৮৭]

মনিরউদ্দীন ইউসুফ

মৃত্যু : ১১.২.৮৭

বাংলা একাডেমীর পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক ও ফেলো জনাব মনিরউদ্দীন ইউসুফের মৃত্যুতে বাংলা একাডেমী গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং বাংলা-দেশের সাহিত্যে তাঁর অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। বাংলা একাডেমী তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

[২৮.১০.৯৩/১১.২.৮৭]

নতুন বই

বাংলা একাডেমীর 'নতুন বই' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রকাশনা অনুষ্ঠানের প্রথম অনুষ্ঠান ২৮-৭-৮৬ তারিখ বিকেলে একাডেমীর সেমিনার কক্ষে আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল। স্বাগত ভাষণে তিনি বাংলা একাডেমীর 'নতুন বই' নামের এই ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, কেবল বাংলা একাডেমীর বইয়ের প্রচার সৃষ্টির জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন নয়, বাংলা একাডেমীর বইয়ের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং বইয়ের অন্তর্বস্তু সম্পর্কে সবার মনোযোগ যাতে আকৃষ্ট হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা।

অনুষ্ঠানে যে বইগুলি আলোচিত হয় সেগুলো হলো—'রবীন্দ্ররচনার রবীন্দ্র ব্যাখ্যা', 'সীমার মাঝে অসীম,' 'গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফ', A Choice of Contemporary Verse from Bangladesh এবং An Anthology of Contemporary Short Stories of Bangladesh। বই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন প্রফেসর কবীর চৌধুরী, প্রফেসর মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এবং ডঃ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম।

বাংলা একাডেমীর 'নতুন বই' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রকাশনা অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান ৩১ আগস্ট ১৯৮৬ বিকেলে একাডেমীর সেমিনার কক্ষে আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল। স্বাগত ভাষণে তিনি বাংলা একাডেমীর 'নতুন বই' নামের এই ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা প্রসংগে বলেন, কেবল বাংলা একাডেমীর বইয়ের প্রচার সৃষ্টির জন্য এই অনুষ্ঠান নয়, বাংলা একাডেমীর কার্যক্রম ও প্রকাশনা সম্পর্কে সবার মনোযোগ গড়ে তোলা এবং বইগুলোর দোষ, গুণ সম্পর্কে সমালোচনা ও সঠিক মূল্যায়ন হওয়া। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বাংলা একাডেমীর

সকল কর্মকাণ্ড সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা।

অনুষ্ঠানে যে বইগুলি আলোচিত হয় সেগুলো হলো—মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক সংকলিত 'বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা : রচনাপঞ্জি', বাংলা একাডেমী সংকলিত 'রবীন্দ্রনাথ', আবদুল কাদির রচিত 'যুগ-কবি নজরুল' এবং ডঃ সারোয়ার জাহান রচিত 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : মূল্যায়নের পালাবদল' বই-এর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব সন্তোষ গুপ্ত, প্রফেসর রফিকুল ইসলাম এবং অধ্যাপক আহমদ কবির।

১৩ আশ্বিন ১৩৯৩/৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ তারিখ বিকেলে বাংলা একাডেমীর সেমিনার কক্ষে বাংলা একাডেমীর 'নতুন বই' শীর্ষক প্রকাশনা অনুষ্ঠান হয়।

অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণে মহাপরিচালক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, যে সমস্ত বই প্রকাশিত হয় তার চমৎকারিত্বই শুধু আমাদের কাম্য নয়। এই বই যাতে মানের দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট হয় তার জন্য আমরা পাঠক সমাজের সহযোগিতা কামনা করি। নৈর্ব্যক্তিক ও দ্বিধাহীন সমালোচনার দ্বারা তাঁরা আমাদেরকে এই সহযোগিতা দান করতে পারেন।

অনুষ্ঠানে 'বানান ও উচ্চারণ' 'প্রসঙ্গ বাঙলা ভাষা', 'রবীন্দ্র বাক্যে আর্ট, সংগীত ও সাহিত্য' এবং 'সংগীতবিদ্যা' এই চারটি বই-এর উপর আলোচনা করেন অধ্যাপক মনসুর মুসা, অধ্যাপক মুহাম্মদ ফারুক ও অধ্যাপক করুণাময় গোস্বামী।

১২ কার্তিক ১৩৯৩/৩০ অক্টোবর ১৯৮৬ বৃহস্পতিবার বিকেলে সেমিনার কক্ষে বাংলা একাডেমীর 'নতুন বই' শীর্ষক প্রকাশনা অনুষ্ঠান হয়।

অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ দেন মহাপরিচালক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

অনুষ্ঠানে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা কৃত ফ্লেমিং ফ্লাওয়ারস, কাজী আবদল মান্নান সম্পাদিত মশাররফ রচনা সম্ভার (৫ম খণ্ড) এবং কাজী দীন মুহাম্মদ রচিত, "দি ভারবাল স্ট্রাকচার ইন কল্যাকাল বেঙ্গলি"-এই তিনটি বই-এর উপর আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ও অধ্যাপক খন্দকার আশরাফ হোসেন।

রোববার ১৩-৮-১৩৯৩/৩০-১১-৮৬ তারিখ সন্ধ্যায় বাংলা একাডেমীর 'নতুন বই'—শীর্ষক প্রকাশনা অনুষ্ঠান একাডেমীর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাগণ দেন ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগের পরিচালক জনাব বশীর আল হেলাল।

অনুষ্ঠানে মুহম্মদ আবদুল জলিল রচিত "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী", আফজালুল বাশার অনূদিত "প্লেখানভের শিল্প ও সমাজ" ও সাইয়েদ আবদুল হাই রচিত "দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ (২য় খণ্ড)" এই তিনটি নতুন প্রকাশিত গ্রন্থের উপর আলোচনা করেন যথাক্রমে সর্বজনাব প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ, বুলবন ওসমান ও সরদার ফজলুল করিম।

চট্টগ্রামে 'নতুন বই' অনুষ্ঠান

"প্রকাশিত বই-এর আলোচনা সাহিত্য, সংস্কৃতি ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে এবং বইয়ের সাথে পাঠকদের নৈকট্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।" শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমীর 'নতুন বই' শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সভাপতি ডঃ রশীদ আল ফারুকী উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমীর গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগের পরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান বক্তৃতা করেন। প্রকাশিত বিভিন্ন বই-এর উপর আলোচনা করেন অধ্যাপক কাজী মোস্তায়িন বিল্লাহ, ডঃ অনুপম সেন এবং ডঃ রফিউদ্দিন আহমদ।

ডঃ ফারুকী বলেন একই অনুষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বই-এর উপর আলোচনা করলে বই সম্পর্কে জনগণ যথেষ্ট জানতে পারেন না। পৃথক পথক অনুষ্ঠান প্রতিটি প্রকাশিত বইয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। তিনি বলেন, আলোচনা সমালোচনা সব সময়ই সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এর ফলে বই মানুষের মনের খুব কাছে চলে আসে।

জনাব শামসুজ্জামান খান বলেন, বাংলা একাডেমী শুধুমাত্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয়। বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনই এর প্রধান উদ্দেশ্য। বইকে

মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একাডেমী সব সময় সচেষ্ট। এ প্রসঙ্গে একাডেমী প্রকাশিত অতি অল্প মূল্যে ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালার বইগুলো জনগণের কাছে খুবই সমাদৃত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

একুশে ফেব্রুয়ারী 'সাতাশিতে বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের জীবনী গ্রন্থমালা প্রকাশ করা হবে বলে জনাব খান তথ্য প্রকাশ করেন।

শ্রী জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা স্মারকগ্রন্থের উপর আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক কাজী মোস্তায়িন বিল্লাহ গ্রন্থটিতে প্রামাণ্যের অভাব রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি মুহম্মদ নূরুল হুদার ইংরেজী বই ফ্লেমিং ফ্লাওয়ার্স-এর উপরও আলোচনা করেন।

ডঃ অনুপম সেন আলোচনা করেন মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সংকলিত 'রবীন্দ্রবাক্যে আর্ট সঙ্গীত ও সাহিত্য' বইটির উপর এবং বশীর আল হেলাল রচিত 'বাংলা একাডেমীর ইতিহাসে'র উপর আলোচনা করেন ডঃ রফিউদ্দিন আহমদ।

অন্যান্য অনুষ্ঠান

বাংলাভাষার প্রচলন সংক্রান্ত নমুনা সমীক্ষা

জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলার প্রচলনে প্রকৃত বাধা কোথায়, এ বিষয়ে বাংলা একাডেমী নভেম্বর (১৯৮৬) মাসে একটি নমুনা সমীক্ষা পরিচালনা করেন। লেখক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ্, সরকারি-বেসরকারি চাকুরিজীবী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, আইনজীবী, ডাক্তার, ব্যবসায়ী ছাত্র, গৃহিনী ও অন্যান্যের মধ্যে ৬০০ প্রশ্নমালা বিতরণ করা হয়, ৩৮১টি উত্তব পাওয়া যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পরিসংখ্যানবিদগণ প্রাপ্ত উত্তরের তালিকাবন্ধন (ট্যাবুলেশন) করে দেন। প্রাপ্তফল বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ একাডেমীতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে পেশ করেন এবং তা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য ফল এইরূপ :

১. বাংলার প্রচলন হয়েছে: সরকারি কাজে ৩২˙৪১%, আদালতে ৩১˙৪৬%, বেসরকারি অফিসে ২৪˙৬৮%, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষায় ৪৬˙২৫%।

২. সরকারি কাজে বাংলার সম্যক প্রচলন না হওয়ার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করেছেন: ৩১৭ জন কর্মকর্তাদের আগ্রহের অভাব, ২৮৯ জন সরকারি উদ্যোগের অভাব, ২৩৫ জন ইংরেজির মোহ।

৩. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষায় বাংলার সম্যক প্রচলন না হওয়ার কারণ: ৩৩৬ জন বলেছেন বাংলায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব, ২৮৮ জন বলেছেন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের অভাব, ১৬৮ জন বলেছেন শিক্ষকদের অনাগ্রহ।

৪. ইংরেজির উপস্থিতি বাংলার প্রচলনে কতদূর ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে: এই প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতাদের ১৩˙৯১% বলেছেন, খুব বেশি; ৪৯˙৮৭% বলেছেন, কিছুটা; ৩৫˙৭০% বলেছেন, মোটেই না।

৫. ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলি কি বাংলা প্রচলনে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে? এই প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতাদের ৪৬˙৭২% বলেছেন, হ্যাঁ, ৫২˙৪৯% বলেছেন, না।

৬. জনশিক্ষার হার অত্যন্ত কম বলে কি মাতৃভাষা বাংলার যথাযথ প্রচলন হচেছ্ না? এই প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতাদের ৪১·৪৭% বলেছেন, হ্যাঁ, ৫৬·৮৬% বলেছেন, না

৭. জাতীয় উন্নয়ন-কর্মকাণ্ডে অতিরিক্ত বৈদেশিক নির্ভরতা, বিদেশী চাকরি ও বিদেশে লেখাপড়া করতে যাওয়ার হিড়িক বাংলা প্রচলনের পথে অন্যতম বাধা কিনা: এই প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতাদের ৫৫·৩৮% বলেন, হ্যাঁ, ৪৪·৩৬% বলেন, না।

৮. মধ্যশ্রেণীর সাধারণ মনোবৃত্তিকে বাংলা প্রচলনের পক্ষে কতখানি অন্তরায় বলে মনে করেন, এই প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতাদের ১৫·৭০% বলেন, খুব বেশি; ৫৬·১৭% বলেন, কিছুটা, ২৬·২৫% বলেন মোটেই না।

৯. অফিস-আদালতের কাজের পক্ষে বাংলাকে অনুপযুক্ত ভাষা বলে মনে হয় কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতাদের ১·৫৭% বলেছেন, হ্যাঁ, ৯৮·৪৩% বলেছেন, না।

১০. উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলাকে অনুপযুক্ত ভাষা বলে মনে হয় কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতাদের ৮·৬৬% বলেন, হ্যাঁ; ৯০·০৩% বলেন, না।

বাংলা একাডেমীতে: ফোকলোর কর্মশালা 'এথনোমিউজিকোলজি'

১৬.৯.৮৭ তারিখে বাংলা একাডেমী সেমিনার কক্ষে প্রথমবারের মত দুইদিনব্যাপী 'এথনোমিউজিকোলজি' বিষয়ে কর্মশালা শুরু হয়। একাডেমী ও জার্মান সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বক্তব্য রাখেন পশ্চিম জার্মানির পণ্ডিত ও লোকসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডঃ রবার্ট গুন্‌থার।

মঙ্গলবার বিকেলে একাডেমী সেমিনার কক্ষে 'লোকসঙ্গীতের দেশভ্রমণ' বিষয়ে বিশেষ বক্তৃতাদানকালে প্রফেসর গুন্‌থার বলেন, সঙ্গীতের সাথে জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান কিভাবে জড়িয়ে থাকে, এথনোমিউজি-কোলজি তা-ই অনুসন্ধান করে। তিনি জানান, বাংলাদেশের সঙ্গীতের বিভিন্ন ঢং এবং অন্তর্গত ভাবসম্পদ তাঁকে অভিভূত করেছে। প্রফেসর

গ্যনথার ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, মাদাগাস্কার, উগান্ডা প্রভৃতি দেশের লোক-সঙ্গীতের উল্লেখ করে বিভিন্ন দেশের লোকবাদ্যযন্ত্র কিভাবে অন্য দেশে গিয়ে অপেক্ষাকৃত ভিন্নভাবে সঙ্গীত ঐকতানেব সৃষ্টি কবে তা ঐ সকল দেশের রেকর্ডকৃত যন্ত্রসঙ্গীত শুনিয়ে ব্যাখ্যা করেন।

অনুষ্ঠানে একাডেমীব মহাপরিচালক প্রফেসর ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, এদেশে লোকসঙ্গীতের বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ এথনোমিউজিকোলজির ভিত্তিতে তার পঠন-পাঠন হয় নি। তিনি আরও বলেন, শীঘ্রই ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় বাংলা একাডেমীতে একটি অডিওভিজুয়াল ইউনিট চালু করা হবে। এব মধ্যে একটি ফোক আর্কাইভও অন্তর্ভুক্ত। এটা প্রতিষ্ঠিত হলে লোকসাহিত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক পঠন-পাঠন সহজ হবে। অন্যান্যের মধ্যে একাডেমীর গবেষণা-সংকলন ও ফোকলোব বিভাগের পরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান ও জার্মান সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের ডঃ পিটাব ডেভিডও সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন।

সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ

১৬.১.৮৭ তারিখ থেকে বাংলা একাডেমীর কারিগরি ও প্রশিক্ষণ উপ-বিভাগে বাংলা সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ শুরু হয়। একাডেমীর মহাপরিচালক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

কর্মরত কারুশিল্পী প্রদর্শনী

বাংলা একাডেমী আয়োজিত দ্বিতীয় জাতীয় ফোকলোব কর্মশালা উপলক্ষে ৮-২-৮৭ তারিখে কর্মরত কারুশিল্পীদের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে বাঁশের ফুল তোলা দরমা বা ঝাঁপ-শিল্পী (সিরাজ মিয়া, হোসেন-পুর), নকশী পিঠা-শিল্পী (শামসুননাহার, কিশোরগঞ্জ), কাগজের ঝালর-শিল্পী (সুবোধ চন্দ্র সরকার, নেত্রকোণা), শাঁখা-শিল্পী (প্রকাশ কমল সুর শাঁখারী বাজার, ঢাকা) সাজীর পট-শিল্পী (কুনাই মিয়া, নরসিংদী), শোলা-শিল্পী (বাবুল সরকার, কেরানীগঞ্জ), জামদানী-শিল্পী (শুকুর আলী, রূপসী, নারায়ণগঞ্জ) প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। প্রদর্শনীটি বিদেশী প্রশিক্ষকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে।